বাবা বাগেশ্বরের ঘোড়া

সুশীল সিংহ

শরৎ পাবলিশিং হাউস
১।৪, টেমার লেন,
কলকাতা-৭০০ ০০৯

শ্রী প্রণব সরকার
শ্রীমতী সুমিত্রা সরকার

নেনু ও প্রণবকে
দাদা ॥

"মাঝে মাঝে দেখা যায়

টিয়াপাখি বসে আছে

হরপ্পার পুরোন কামানে

এ সবের মানে আছে, সুগভীর মানে।"

বাবা বাগেশ্বরের ঘোড়া

১

॥ সন্ন্যাসী ও বাদল ॥

সে জেগে আছে।

রাতের রেলগাড়ি। প্যাসেঞ্জার ট্রেন। সব শাটার নামানো। পরন্তু শিবরাত্রি। শেষরাতের শীতের ফলা শরীরে এখানে ওখানে পাকা মাছের কাঁটার মত বিঁধছে। জড়ানো কম্বল শরীরে ঠিক এক জায়গায় থাকে না। আলগা হয়। আবার জড়াতে গোছাতে হয়। হচ্ছেও তাই। ঘুমোলে শীত কমে। ঘুমোবে যে, মানুষটার সে উপায় নেই।

সে জেগে আছে।

এইভাবে জেগে থাকতে বড়ই কষ্ট হচ্ছে তার। কেননা এখন আর সে নেশা করে না।

একটা বিড়ি ধরাতে পারলে ভাল লাগত। কয়েকটা টান। খানিকটা উম। নেশা। কিন্তু প্রায় দু'বছর হল, বিড়ির পুরনো নেশাও ছেড়েছে সে। যদিও বয়সের হিসেবে সে একজন পরিপূর্ণ যুবক।

একটা বিড়ি ধরানোর ইচ্ছা থেকে সরে আসার পরের মুহূর্তেই তার সারা শরীর ও মন, তার নিজস্ব নারীর জন্য মনে মনে ভিখিরী হয়ে উঠল। আজ প্রায় দু'বছর সে তাকে ছোঁয়নি। কিন্তু সেই মেয়ের শরীরে বাসি পান্তা ভাতের মত একটা মদো গন্ধ, তিন কলসি খেজুর রসের মত তার নিজেরই ভেতর থেকে ফেনিয়ে, গেঁজিয়ে, উথলে ওঠে। এখনও উঠল। সাপের গায়ের হিমের মত ছ্যাঁকছেঁকে, পাক দেওয়া, জ্যান্ত শীত। লেপতোশকের ভিতর সোহাগী পায়রা। খোলা চুল। চুলের গন্ধ। বুক। বুকের বোঁটা। নাভি। তলপেট। নখ।

এ সবই তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা। সে আর স্মৃতি। মাংসের মন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বড় মারাত্মক।

স্মৃতি। স্মৃতি। স্মৃতি।

এই মুহূর্তে তার শরীরে আর বুকের ভেতর এক অসহায়তা দপদপ করছে। এই অসহায়তাকে ক্রোধও বলা যায়।

অথচ মানুষটা সন্ন্যাসী। অন্তত আপাতদৃষ্টিতে তাই। সন্ন্যাসীর ডেরা আর রুটি রোজগার যেখানে, সেই শুধামডি স্টেশনের লাগোয়া রেল বসতির সবাই বলে, মাস্টারবাবু মারা যাওয়ার পর তার ভাগ্নে বাওরা হয়নি, সাধু হয়ে গেছে।

মাস্টারবাবু, মানে শুধামডি স্টেশনের স্টেশনমাস্টার। মৃত। সন্ন্যাসী তার ভাগ্নে। নাম বাদল। শুধামডিতেই সে পয়েন্টসম্যানের কাজ করে। রেলের কাজে তাকে মামাই ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। অনেকেরই যেমন দুটো আলাদা নাম—একটা পোশাকী আর একটা ডাক নাম—থাকে, বাদলের তেমন নেই। সে শুধু বাদল। গেরুয়া ধরলেও রেলে পয়েন্টসম্যানের চাকরি ঠিক বজায় রেখেছে বাদল সাধুবাবা।

শীত লাগা বুড়ো ঘোড়ার মত ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলেছে রাতের মোঘলসরাই প্যাসেঞ্জার। সব স্টেশনে থামছে। মাঝে মাঝে দুপাশের উটকো ডাঙার মাঝখানেও থেমে যাচ্ছে। এ বড় কঠিন ভ্রমণ।

গাড়িটা আবার থামল। বোঝা যায় স্টেশন। সন্ন্যাসীর কামরা থেকে তিনজন যাত্রী এখানে নেমে যাচ্ছে।

—এটা কোন স্টেশন হে, জানতে চাইল সন্ন্যাসী।

—গলসী গো, নেমে যাওয়া যাত্রীদের শেষজন নামতে নামতেই উত্তর দিল। প্ল্যাটফর্ম অনেক নিচুতে। নেমে দরজাটা বন্ধ করল না ওরা। সন্ন্যাসী উঠে গেল দরজার কাছে। দরজা পুরো টানার আগে ট্রেন ছেড়ে দিল। ঠাণ্ডা হাওয়া লাগছে সন্ন্যাসীর চোখেমুখে। শীতল লাগছে। এক ধরনের আরাম। বুকের মধ্যে ওইসব চিলচিৎকার, অসহায়তা, ক্রোধ, এই সব কিছুই নেই আর। একটা বিড়ি ধরানোর ইচ্ছার মত যেমন এসেছে, চলে গেছে।

গলসী ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। এর পরের স্টেশন খানা জংশন। খানার

পরের স্টেশনেই তাকে নামতে হবে। শুধারে গ্রামে যেতে হলে ওই স্টেশনে নামতে হয়। শুধারের কোন নিজস্ব স্টেশন নেই। রাত্রির অন্ধকারে সেই স্টেশনে নেমে, রাতের অন্ধকারে হেঁটে হেঁটে তাকে যেতে হবে শুধারে গ্রাম। ভোর হবার আগেই সন্ন্যাসীকে বসতে হবে নেপ পুকুরের কাছাকাছি কোন গাছতলায়। স্মৃতি তাকে এই রকমই বলে দিয়েছে। স্মৃতি। তার ঈশ্বরী। শুধারে গ্রামে স্মৃতি থাকে তার দাদা মাধবমাস্টারের বাড়িতে। স্বামী মারা যাবার পর শুধামডি থেকে আবার এখানেই চলে এসেছে সে। আর তো তার কোথাও যাবার জায়গা নেই।

নেই? কোথাও যাবার নেই স্মৃতির?

যেন নিজের অজান্তেই সন্ন্যাসীর হাত মুষ্টিবদ্ধ হল। ঘুষি মারতে হলে কিন্তু হাওয়ার গায়ে মারতে হয়।

শুধারে গ্রামে মাধবমাস্টারের বাড়িতে স্মৃতি আর ছ'বছরের ছেলে বাকু ছাড়া থাকে স্মৃতির মা, মাধবমাস্টারের দু বৌ, দু বৌর ছেলেমেয়ে, একপাল পোষা হাঁস আর পরাণ ঠাকুর। এদের মধ্যে স্মৃতির ছেলে বাকু আর স্মৃতির মাকে ছাড়া সন্ন্যাসী আর কাউকে চেনে না। কোনদিন দেখেনি। মাধবমাস্টারের মাকে সে অবশ্য খুব ভালো করেই জানে। কেননা স্মৃতির কাছে, তার মানে জামাই বাড়িতে, টানা প্রায় তিন বছর ছিল মাধবমাস্টারের মা। মাধব মাস্টারের মা, অর্থাৎ মামার শাশুড়ী। সম্পর্ক ধরলে মামীর মাকে দিদিমা গোছের কিছু বলতে হয়। কিন্তু বাদল তাকে কোনদিন সেসব কিছু বলে নি। মাঝে মাঝে পিসীমা বলে ডাকত। না হলে উল্লেখ করত মামীর মা বলে।

তার মামা যখন শুধামডি থেকে স্মৃতিকে বিয়ে করতে আসে, তখন সে বরযাত্রী আসেনি। বাঁকুড়া শহরে একটা মেলায় গিয়েছিল অজস্র সাপ নিয়ে একটা ঘরে সাতদিন থাকবে বলে। এই খেলাটা সে আগে খুব দেখাত। তাই মামার বিয়েতে তার শুধারেতে আসা হয়নি। পরেও কোন উপলক্ষ্যে না।

বাদলের জীবনে অনেক দিক আছে। অনেক ওলটপালট হিসেব। কিন্তু তার জীবনে পরাণঠাকুর বলে কেউ কোনদিন ছিল না। তার মামার মৃত্যুর পর প্রায় দু'বছর আগে শুধামডি স্টেশনে একটা ভিখিরী দেখে একদিন হঠাৎ কি যে হল স্মৃতির, সে বদলে অন্যরকম হয়ে গেল। আর উঠে এল এই পরাণদা।

—পারাণঠাকুর তোমার কে ?
—আমাদের বাড়িতে ছেলেবেলা থেকে আছে।
—এখন তাকে নিয়ে তোমার কি ?
—আমি আগে বুঝিনি পরাণদার এত কষ্ট
—হঠাৎ বুঝলে ?
—পরাণদা নিজের কথা কোনদিন কাউকে বলে না।
—যে মানুষ নিজে চুপ করে সব সয়, তুমি তার কথা ভাববে কেন ? পরাণ ঠাকুর কি তোমায় কিছু বলেছে ?
—সে কিছু বলার মানুষ না। আমার মন বলছে।
—আমি তোমায় বুঝতে পারছি না বৌ, বাদল বলেছিল, হল কি তোমার ?
—আমি আগে কোনদিন বুঝতে পারিনি যে আমার নিজের ভেতরেও এত কষ্ট আছে, স্মৃতি বলেছিল।
—কিসের কষ্ট তোমার ? আমার বৌ হলে লোকলজ্জা ? চারদিকে ছি ছি হবে, সেই ভয় ?
—না।
—তবে কি ?
—আমি আর এভাবে বাঁচতে চাই না।
—কেন ?
—আমি অন্যরকম ভাবে বাঁচবো।
—আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই। তুমি আমার ঘরে এসো।
—আসতে পারবো না ঘরে।
—কেন পারবে না ?
—আমার বুক কাঁপবে। আমার কেবলই মনে হবে আমি পাপ করছি। মনে হবে আমার সারা গায়ে পাঁক আর ময়লা লেগে আছে। আমি শুদ্ধি চাই।
—আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না বৌ।
—মানুষের জন্যে মানুষকে কিছু করতে হয়।
—এসব কথা তুমি কোথায় শিখলে ?
—আমার ভগবান বলেছে।
গাড়ির বন্ধ দরজার ওপর পিঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সন্ন্যাসী।

শরীরের ওপরের দিকটা সামান্য বাঁকাতেই হয়েছে। তবু দণ্ডায়মান। ঘুমোবার উপায় নেই। ঘোড়া নাকি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোতে পারে। ঘুমোয়। বাদলের মধ্যে কত অশ্বশক্তি আছে তা মাপজোপ করে বোঝার মত। কেননা এত প্রাণ, এত প্রেম, সব মানুষের থাকে না। কিন্তু ঘুমোবার ব্যাপারে সে ঘোড়া নয়।

প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল সন্ন্যাসী। ঝুপ করে লাফ দিতে হল নামার সময়। না হলে পায়ের নিচে কাঁকড় মেশানো সাবেকি মাটি পাওয়া যায় না। লাফিয়ে নামার আগেই তুলে উঠল তার কাঁধের গেরুয়া ঝোলা। দু হাতে ঝোলার ভেতরের ঝাঁপিটা ধরল সে। ঝাঁপিতে জীবন্ত জিনিস আছে। তার কোন অসুবিধা না হয়। তাই তৎপর।

নামতে নামতেই ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা দিল কেউ। লোহার ঘণ্টার ধাতব শব্দ নীরব নিথর রাত্রির জমাট ঘন অন্ধকারে শীতের হিম কনকনে জড়তায় খানিকটা ভেঙে ভেঙে, তারপর মিহি দলার মত ছড়িয়ে যেতে লাগল।

ট্রেন ছেড়ে দিল। এই স্টেশনে নামা যাত্রী বলতে সন্ন্যাসী একা। আর কেউ কোথাও নেই। একটা কুকুরও না। কাছেপিঠে কোথাও কোন শেয়ালের ডাকও শোনা যায় না। এত অন্ধকার, অন্ধকার অন্ধকারকেই গিলে ফেলেছে। কোথাও কোন জোনাকি জ্বলছে কিনা, তাও বুঝতে পারছে না সে। গভীর রাত। গভীরতর কুয়াশা। ভিজে ঘুঁটের ধোঁয়ার মত ঘন, ভারী কালচে ছাই ছাই কুয়াশা তাকে ঘিরে। চোখের খুব কাছে উঠিয়ে না আনলে নিজের হাতও আবছা দেখা যায় না। সন্ন্যাসী সেই অন্ধকার জনপ্রাণীহীন শূন্য প্ল্যাটফর্মে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। মাথা আর কান থেকে সরিয়ে দিল কম্বলটা। এতক্ষণে সে দেখতে পেল লাইনের ওপারে একটা ঘরে দুটো আলো জ্বলছে। অর্থাৎ ওটা স্টেশনের অফিসঘর। যেমন ছিল শুধামডিতে তার মামার অফিস। মামা নেই। অফিসঘরটি অবশ্য অবিকল তেমনি আছে। মামাকে মনে পড়ল তার। ঘণ্টা বেজেছে ওখান থেকেই। সন্ন্যাসী লাইন পার হয়ে সেদিকে চলল। ঝুম অন্ধকার আর কুয়াশা অনেকটাই চোখে সয়ে গেছে তার। এখন সে সবটা না হলেও, অনেকটাই দেখতে পাচ্ছে।

২

"যাসনে ওরে, মাথার কিরে, বাবা বাগেশ্বর
ও বাপ যাসনে ফিরে, থাক আমাদের ঘর।"

হারা বাগদি থাকে নেপ পুকুরের কাছে তেঁতুলেপাড়ায়। গ্রামের ভাষায় যাদের ছোট লোক বা নমশূদ্র বলা হয়, তাদের এরকম কটা পাড়া আছে। তেঁতুলেপাড়া, দাসপাড়া, নামোপাড়া, নেয়ারপাড়া, এই সব। সংসদীয় গণতন্ত্রে হালফিল ভোটের ভাষায় এগুলোকে সিডিউল পাড়াও বলে।

শুধারে গ্রামের নিজস্ব থানা নেই। ডাকঘরও না। বর্ধমান সিউরি রোডের যে পিচরাস্তা, সেখানে একটা মুখে শুধারে ক্যানাল। পীরের দরগা। ঝিমুটির শ্মশান। এই সব পার হয়ে মাঠে মাঠে, মাঝে মাঝে ডাঙায় ডাঙায় পথ। বাঁয়ে হিজলগোড়া। হিজলগোড়ার গায়ে বদরমুনশী। বিশাল বদরমুনশীর চারদিকে মস্ত উঁচু পাড়। পাড়ের একদিকের ঢালে একতলা বাড়ির ছাদ ছাড়ানো মাথা উঁচু ফণীমনসা গাছ। সেই গাছের সর্বাঙ্গে ছোট ছোট পুঁটলি। মানত করে গেছে পাশাপাশি পাঁচটা গ্রামের হিন্দু মুসলমান সবাই। মনোবাঞ্ছা পূরণ হলেই এখানে শিরনি মানে।

হিজলগোড়া, আলকাফ, এসব পার হয়ে আরও চলো। আরও চলো। চারদিকে চাষবাস। ক্যানালের জল। দিনের বেলায় ঘড়ঘড় শ্যালোর আওয়াজ কাছে দূরে। এখন শুনশান রাত্রে আচমকা প্যাঁচার তীক্ষ্ণ চিৎকার, শেয়ালের হুক্কাহুয়া, আর দূরে দূরে মাঝে মাঝে শূন্যে ভাসতে ভাসতে ছুটে যাওয়া আগুনের গোল বল। এসবের মধ্য দিয়ে সন্ন্যাসী হাঁটছে। ধান কাটা হয়ে গেছে বলে এই ফাল্গুনে অনেক জমিতে তিলের চাষ। মুসলমানদের কবর। রাধাচূড়া। ডাঙায় বনমোরগ, আকন্দ, ভেরেণ্ডা, আসশ্যাওড়ার ঝোপ। হুই আশুতোষপুর। ওখানে ডাকঘর।

শুধারে আর কতদূর গো? ধাব্‌ধারা গোবিন্দপুর। একেবারে হদ্দ অজ পাড়াগাঁ।

অবিরাম শিশির পড়ছে। ঘন কুয়াশা। দলা দলা কুয়াশা তাকে ঘিরে। এই নিশুতি রাত, শিশির, কুয়াশা, আলেয়া জ্বলা মাঠের পর মাঠ পার হয়ে সন্ন্যাসী চলেছে শুধারে গ্রামে, নেপ পুকুরের পাড়ে।
হাজা মজা পানা আর কলমি জাতীয় দলে ভরতি নেপ পুকুরের পাড় ঘেঁষে শিবরাত্রির সময় হাঁটুজল। হাঁটুর ওপর পর্যন্ত কাপড় তুলে পায়ের চেটোয় পানা সরিয়ে এই জলে ঘরগেরস্থালির বাসনকোসন ধোয়া ছাড়াও, নানা প্রাকৃতিক সাফসুতরো হওয়ার কাজ সারে তেঁতুলে পাড়ার মেয়েরা। ভরা বর্ষায় অবশ্য টইটই করে নেপ পুকুরও।
নেপ পুকুর কিন্তু বড় মান্যির পুকুর। দেবতার পুকুরও বটে।
প্রতি বছর চৈত্রসংক্রান্তির আগের দিন, বাবা বাগেশ্বর, মন্দির থেকে যাত্রা করে আসে নেপ পুকুরে। অনেকটা পুরীতে জগন্নাথদেবের বছরে একবার মাসীর বাড়ি যাওয়ার মত। পুরীর ঠাকুর অবশ্য মাসীর বাড়িতে থাকেন। বাবা বাগেশ্বর এখানে থাকে না। চড়কের আগের দিন, গাজনের সন্ন্যাসীদের কাঁধে চেপে বাবা আসে এখানে। এটি নৈশ অনুষ্ঠান। রাত্রে নেপ পুকুরে দেবতার স্নান হয়। এসব কবে থেকে হয়ে আসছে কেউ জানে না। স্নানান্তে নেপ পুকুর পাড়ে বাবার পুজো হয়। হ্যাজাক জ্বলে। ঢাক বাজে। কাঁসি বাজে। ছোটলোকেরা মদ খেয়ে নাচে। আর বাবুঘরের ছেলেরা, যারা বারোমাস গ্রামেই থাকে, তারাও অনেকে মদ খেয়ে নাচে। কে যে বাবুদের ছেলে, আর কে যে বাবুদের ছেলে নয়, বোঝা যায় না। সব একাকার। আজকাল তিথিনক্ষত্র ধরে এমন অনেক শ্রেণীবিলোপ হয়ে যায়।
বাবা আসে সন্ন্যাসীদের মাথায় চেপে। স্নান ও পুজোর শেষে ফেরে পুরোহিত বা সেবাইতদের কোলে চেপে। বছরে এই একটিমাত্র দিন সেবাইতদের বাবাকে ছোঁবার, কোলে নেবার, কোলে বা মাথায় করে মন্দির পর্যন্ত নিয়ে যাবার অধিকার আছে।
পুরোহিত বলতে মাধবমাস্টার। আর সেবাইত হল ফটিক মিত্তির। সেবাইত বংশের অন্যেরা কেউ গ্রামে থাকে না। ছ আনি অংশের পাঁচ পয়সার

শরিক ফটিক বাবু। গাঁয়ের সবাই বলে ফোটো বাবু। কিংবা শুধু ফোটো।

ফোটো আবার এইদিন পট্টবস্ত্র পড়ে। বাবাকে ছোঁবে, বাগেশ্বরকে কোলে মাথায় করে নিয়ে যাবে, তাই পট্টবস্ত্র। পট্টবস্ত্র আর সংস্কৃত মন্ত্র মানেই যেন পবিত্র ব্যাপার। একেবারে সব শুদ্ধি।

মাধবমাস্টার আর ফোটো মিত্তির দুজনে খুব বন্ধু। গ্রামের পঞ্চায়েত থেকে আরও নানা ব্যাপারে দুজনের আড়কাঠি অনেক। যদিও মাধব অনেক ধুরন্ধর। সে যায় পাতায় পাতায়।

স্নান ও পুজো শেষে বাবা বাগেশ্বর যখন আবার তার মন্দিরের পথে যাত্রা করে, তখন আবার ঢাক বাজে। কাঁসি বাজে। চলমান হ্যাজাকের আলো মাঝে মাঝে চমকে চমকে ওঠে অন্ধকারে। গাজনের সন্ন্যাসীরা দণ্ডী কাটতে কাটতে যায় বাবার আগে আগে। মাতালেরা কেবলই তাদের পথ আটকায়। আর নেপ পুকুরের পাডে জডো হওয়া মহিলারা—তেঁতুলেপাড়া, নামো পাড়া, নোয়ারপাড়া, দাসপাডা থেকে আসা মেয়েবৌরা—তখন এক সঙ্গে গেয়ে ওঠে :

"—যাসনে ওরে মাথার কিরে বাবা বাগেশ্বর
ও বাপ যাসনে ফিরে, থাক আমাদের ঘর।"

সে এক বিচিত্র কোরাস। বর্ষশেষের আগের দিনটিতে চৈত্রনিশীথের নক্ষত্রখচিত আকাশে, যেন বদরমুনশীর ঢালে, আলকাফ গাঁয়ে মনসাতলায় ভাসানের সময় দেওয়া ধুনোর ধোঁয়ার মত, এই কোরাস, উপরে ওঠে যায়। বলে · থাক আমাদের ঘর। •

একদিন, কতই না জাঁক ছিল নেপ পুকুর পাড়ের এই অনুষ্ঠানের। এখন আর আগের মত তেমন ভীড় হয় না মেয়েবৌদের। তিরিশ বছর আগে যারা গিন্নী ছিল, তারা আজ অনেকেই নেই। সেসব দিন, এই তো, মাত্র সেদিন। মাধবের মার চোখে দেখা। তখন গাজনের সময় শহর থেকে সবাই আসত গাঁয়ের টানে। আর আজ? কতজন যে গ্রামের বাড়ি ভুলেছে! আসেই না। এমনিই হয়। একদিনের জাঁক আর জমক তার জেল্লা হারিয়ে ফেলে। সময়ের সঙ্গে কত কিছুই যে সরে আর বদলে যায়।

তিরিশ বছর আগেও ভরা বোশেখ মাসে, আশায় আশায় থেকেও যেবার আসত না কালবোশেখির ঝড়বৃষ্টি, তামার টাটের মত খাঁ খাঁ আকাশ

যখন ধূ ধূ করত, কুমড়োক্ষেতে কিংবা লাউমাচায় ফুটে থাকত গরমের ঘাম—তখন শ্যালো কি তা শুধারের মানুষ জানত না। ক্যানালও খটখট করত বোশেখ মাসে। বর্ধমানের বাঁকার জল ক্যানালের একমাত্র ভরসা ছিল তখন—তখন নেপ পুকুরের পাড়ে মাধবমাস্টারের বাবা হৃদয় পুরুত হোমযজ্ঞ করত। বৃষ্টির জন্য করা হত সে যজ্ঞ। দেবতা তুমি প্রসন্ন হও। জল দাও, অন্ন দাও, বাবা বাগেশ্বর। সারা গ্রাম অরন্ধন করত সেদিন। যজ্ঞ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবাই উপবাসী থাকত। অঞ্জলি শেষ হওয়ার আগে অন্ন নিত না কেউ। হোমযজ্ঞ চলাকালীন মাঝে মাঝে নেপ পুকুরের পাড়ে অনেক গলা সুর তুলে বলত বা—বা—আ—আ বাগে—এ—এ—শ-র-এ-এ-র দোয়া লাগে—এঃ জয়-ও-শিবো—ও ম-হে-শ্ব-র-অঃ। এখনও চৈত্রসংক্রান্তিতে গাজনের সময় দিনে রাতে মন্দির প্রদক্ষিণ করার সময় প্রতিপ্রহরে অন্তত পাঁচবার গাজনের সন্ন্যাসীরা এই রকম বলে।

হৃদয়পুরুতের পুজো শেষে সারা গ্রাম উপবাস ভঙ্গ করলেও হৃদয়পুরুত আর তার ব্রাহ্মণী— মাধবের মা—কি একটা নক্ষত্র না দেখা পর্যন্ত জলস্পর্শ করত না। লিভার পচে যে হৃদয়পুরুত মারা গেল, সেই লোকটা হোমযজ্ঞ করার পর যতদিন না বৃষ্টি হত, ততদিন মদও ছুঁত না। আর বাবা বাগেশ্বরের কি অপার মহিমা, হোমযজ্ঞ করার কদিনের মধ্যে বৃষ্টি হতই।

পচা লিভার নিয়ে কবে ভূত হয়ে গেছে মাধবমাস্টারের বাবা হৃদয়পুরুত। সেসব দিনের অনেক কিছুই নেই আর। কিন্তু শুধারে আছে। বাবা বাগেশ্বর আছে। বাগেশ্বরের চাতাল আর মন্দির আছে। মন্দিরের মধ্যে বাবা বাগেশ্বরের ঘোড়া আছে। কালো ঘোড়া। এই কালো ঘোড়া, বাবার নিজের ঘোড়া। আর আছে মানত করে রেখে যাওয়া আরও ঘোড়া। সেগুলো সাদা আর ছোট। সবই মাটির।

নেপ পুকুর আছে। বাবার গাজন আছে। চৈত্রসংক্রান্তির আগের দিন রাত্রে নেপ পুকুরে বাবা বাগেশ্বরের বাৎসরিক স্নান আছে। ফুল পড়া আছে। নেপ পুকুর পাড়ে পাকুড় গাছ, আর সেই গাছতলায় আকন্দ গাছের ঝোপ আছে।

নেপ পুকুরের পাড়ে যখন পৌঁছল সন্ন্যাসী, তখন তার কম্বল শিশিরে ভিজে গেছে, আর ভিতরে ভিতরে যেন ঘেমে উঠেছে সে। টানা এতদূর হেঁটে তার নিশ্বাস দ্রুত, গলা শুকনো। তার শরীর জল চাইছে। পুকুরের জলে হাত

মুখ ধুয়ে, আঁজলা ভরে জল পান করার জন্য ক'পা এগিয়ে থেমে গেল সন্ন্যাসী। দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে সে বাবা বাগেশ্বরকে প্রণাম করল, যার মন্দিরও সে কোনদিন দেখেনি। শুধারেকে অনেকে বাবা বাগেশ্বরের গাঁ বলে। বাদল তা জানে। জলে নামল বাদল। প্রায় হাতের নাগালের মধ্যে একটা দলছুট কচুরিপানার ওপর একটা আগুনে পোকা। হালকা সবুজ আলো আসছে তার গা থেকে। ঠিক যেন স্মৃতির কানের সেই ছোট্ট পান পাতার মত দেখতে শ্যামাপোকা রঙের ঝুটো পাথর। ভিজে। জ্বলজ্বল।

ভোরের আলো ফোটার মুখে খেজুর গাছে হাঁড়ি বাঁধতে যাবার পথে, হারা বাগদীই প্রথম দেখতে পেল যে নেপ পুকুরের কাছে পাকুড় গাছতলায়, আকন্দ ঝোপের কোল ঘেঁষে এক সন্ন্যাসী ধ্যানে বসেছে। হারা দাঁড়িয়ে গেল। সন্ন্যাসীর বয়স কম। ত্রিশ বত্রিশ। মাথায় জটা বলতে যা বোঝায় তা' নয়। দেড়-দু বছর চুলে ক্ষুর, কাঁচি আর তেল না ছোঁয়ালে যেমন হয় তেমনি রুখো, লতানো আর ঝুমরি চুল। কুচকুচে কালো দাড়ি। উর্ধ্বাঙ্গ বোধ হয় কম্বল জড়ানো ছিল। ধ্যানস্থ অবস্থায় কম্বল পিঠ থেকে খসে ভুঁয়ে লোটাচ্ছে। পরনে গেরুয়া লুঙ্গি। কোমরের কষির ফাঁক দিয়ে ভিতরের কালো ল্যাঙোটের একটু দেখা যায়। একটা গেরুয়া ঝোলা পাশে নামানো। সন্ন্যাসীর পেটা শরীর।

হারা বাগদী মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করল।

সন্ন্যাসী চোখ মেলে হারাকে বলল, যা, ধূপধুনো নিয়ে আয়।

হারা বাগদীর ঘরে ধূপধুনো নেই। তাদের তেঁতুলেপাড়ায় কারও ঘরেই নেই। পুজোপাঠে ধূপধুনো তাদের কাছে বিলাস। যেমন বৌঝিদের গায়ে দেবার পাউডার। কোথায় পাবে?

সন্ন্যাসী বলল, আর নারকোল আনবি একটা।

—কি আনবো?

—নারকোল।

—আমাদের ঘরে এসব নেই বাবা।

—গাঁয়ে ঘরেঘরে গিয়ে বল। চেয়ে আন। বাবা বাগেশ্বরের জিনিস, বাবাই তোকে দেবে।

—কি হবে বাবা? হারা বাগদী কোনমতে জানতে চাইল।

—পুজো হবে।

—কার পুজো বাবা?

—বাবা বাগেশ্বরের পুজো করব আমি।

—এই গাছতলায়?

—হ্যাঁ।

—এখানে কেন বাবা?

—এই গাছেই তো বাবা বাগেশ্বর থাকে। তোদের পাড়ায়, তোদের কাছে থাকে দেবতা।

সন্ন্যাসীর কথা শুনে হারা বাগদীর এক ধরনের ভয় বোধ হল। ঠাকুরদেবতা চিরকাল বাবুদের। দূর থেকে দেখবে, মানত করবে, হত্যে দেবে, আর তারস্বরে কখনোসখনো ডাকবে—এই তাদের দেবতা। খুব দূরের। ঘরের নয়।

হারা হঠাৎ দুই হাতে সন্ন্যাসীর পা ধরে বলল, আমাদের কোন বিপদ হবে না তো বাবা! আমরা গরিব মানুষ—

সন্ন্যাসী শান্ত কণ্ঠে বলল, কোন ভয় নেই তোদের। পুজো হবে। তোকে যা বললাম, তাই কর। ওঠ—

সেখান থেকে চলে যাবার সময় হতচকিত হারা বাগদী মনের ভ্রমে খেজুর গাছে টাঙানোর জন্য হাঁড়িটা ভুলে ফেলে যাচ্ছিল।

সন্ন্যাসী বলল, হাঁড়িটা নিবি না?

—দোষ নেবেন না বাবা। আগে আপনার কাজ করছি।

—দূর বোকা। কাজ হল ভগবান। আগে হাঁড়ি বেঁধে আয়। তারপর যা বললাম, তাই কর।

হারা হাঁড়ি তুলে নিল।

৩

॥ হে ভগবান

দেখতে দেখতে গাছের গোড়ায় কোদালে কোদালে সাফ হয়ে গেল জায়গাটা। ঘাস চেঁছে গোবরজলে তকতকে করে নিকনো হয়ে গেল চার পাশ। আর এ সবের পাশাপাশি শুধারে গ্রামে রটনা হয়ে গেল যে একজন সন্ন্যাসী এসেছে নেপ পুকুরের পাড়ে। হারা বাগদী খেজুর গাছে রসের হাঁড়ি বাঁধতে যাবার সময় তাকে প্রথম দেখেছে। সন্ন্যাসী হারাকে বলেছে, সে পুজো করবে। সন্ন্যাসী হারাকে আরও বলেছে, নেপ পুকুর পাড়ে, পাকুড় গাছে বাবা বাগেশ্বর থাকে।

—বাবার তো মন্দির আছে।

—তাতে কি? দেবতা কি মন হলে গাছে থাকতে পারে না?

—তা বলে পাকুড় গাছে? অ্যাঁ? হেই বাবা—

—জায়গাটার থান মাহাত্ম্যির কথা একবার ভাব,

—থান মাহাত্ম্যি কি দেখলি আবার!

—নেপ পুকুর বাবার পুকুর নয়? বাবা ওখানে নাইতে যায় না?

—ওতো পুজো

—পুজোই তো দেবতার সব। ওটা দেবতার থান। হাঁ কি না?

সন্ন্যাসী বিষয়ক সংবাদ যখন মাধবমাস্টারের অন্দর মহলে পৌঁছল তখন সকলের প্রথম চায়ের পাট সেখানে সদ্য শেষ হয়েছে। সকালের চা স্মৃতি করে। তারপর কুটনো কুটে দেয়। এ ছাড়া সংসারের আরও নানা বাঁধা ও নিত্য কাজে সে বিশেষ নেই। হেঁসেল সামলানো, ক্ষার কাচা, বাসন মাজা এসব সে করে না। স্মৃতি প্রতিমাসে তার দাদা মাধবের সংসারে নগদ কিছু

টাকা দেয়। তার আয়ের সূত্র, মৃত স্বামীর পেনশন। সে শুধু তার নিজের ও তার ছ'বছরের ছেলে বাকুর জন্য রাহা খরচ দেয়, তাই নয়। তার মার জন্যেও প্রতি মাসে দাদার হাতে কিছু দেয়। যদিও দাদা মাধবের মা, ও বোন স্মৃতির মা, একই মানুষ। একজন মা এখন দুইজন ভাইবোনের দু'ভাগের মা। স্মৃতির বিয়ের আগে পর্যন্ত, মা, শুধু মাধবের মা ছিল। স্মৃতির বিয়ের কিছুদিন পর মা, ছেলের কাছ থেকে চলে গিয়েছিল মেয়ে-জামাইয়ের কাছে। ছেলের মা থেকে, মা হয়েছিল, মেয়ের মা। জামাই মারা যাবার পর আবার শুধারেতে ফিরেছে সে। এখন সে দু'ভাগের মা। মাধবের সংসারে এখন মাকে হেঁসেল সামলাতে হয়, ক্ষার কাচতে হয়, ঝাঁটপাটের কাজ করতে হয়। আগে মাধবের মা দেমাক করে বলত, আমার বেটার ঘরে আমি হলাম রাজার মা।

আর এখন ?

সে কথা কাউকে বলে না মাধবের মা। বলতে পারে না। কেবল কোন কোন সন্ধ্যায় সারা দিনের ধকলের শেষে যখন তার দু'চোখ বুজে আসে, সেদিন রাত্রের সামান্য আহার মুখে না দিয়েই এই বিধবা এক ঘটি জল খেয়ে শুয়ে পড়ে। সে যদি একা কাঁদে, তবে শব্দ হয় না। তার বুকের ভেতর পাথর তিল তিল করে ঘন হচ্ছে।

মাধবের সংসারে খবরটা যখন পৌঁছল, তখন মাধবমাস্টারের মা বাড়ির ভিতর দিকে দাওয়ার সামনে উঠোন ঝাঁট দিচ্ছিল। উঠোনের শেষে রান্নাঘর। রান্নাঘরের কোলে দাওয়া। আর ডান হাতি লম্বালম্বি দুটো ছোট ছোট ঘর। একটা ভাঁড়ার। অন্যটা ঠাকুরঘর। ওই ঠাকুরঘরে, রাত্রে স্মৃতি আর তার মা শোয়। আগে বাকুও ওখানে শুত। কিন্তু ছোট মেঝেয় তিনজনকে আর কুলোয় না। তাই গত চার মাসের কিছু বেশি, শীত পড়ার শুরু থেকে বাকু শুচ্ছে পরাণের কাছে।

উঠোনের কোনে তারের জালি লাগানো, বাঁশের বাখারির ওপর খড় ছাওয়া হাঁসের ঘর। হাঁসের ডিম। হাঁসের মাংস। হাঁসের লোভে রাত্রে শেয়াল আসে মাঝে মাঝে। আর মাধবমাস্টারের মার এমনি কান যে ঘুমোতে ঘুমোতেও, শেয়াল এলে ঠিক বুঝতে পারে। উঠে বসে। উঠোনে শেয়ালের ছায়া দেখতে না পেলে খিড়কি দরজা খুলে বাইরে দেখে আসে। ওরা বলে নাছ দুয়োর। ছেলের জন্য যে কোন কাজে আজও তার কোন ভয়ডর নেই।

লজ্জাও না। মাধবের সংসারে একটা কুটোও যদি পাখিতে নিয়ে যায়, মাধবের মা ঠিক টের পায়। সইতে পারে না। এমনি তার অভ্যাস।
রান্নাঘরের দাওয়ায় মাধবের মার চা জুড়োচ্ছিল। এমনি রোজ জুড়োয়। হাতের ঝাঁটা নামিয়ে মাধবের মা নিজেই তা আবার ফুটিয়ে নেবে।
উঠোন ঝাঁট দিতে মাধবের মা দ্বিতীয়বার বলল স্মৃতিকে, দু'বালতি জল ঢেলে দিবি? হাঁসের ঘরটা ধোব। কথা যে তোর কানেই যাচ্ছে না—
স্মৃতি কোন উত্তর দিল না এবারও। আসলে সে কোন কিছুই ঠিক ঠিক শুনতে পাচ্ছিল না। চারপাশের যে কোন শব্দ, মার ঝাঁট দেওয়ার শব্দ, মার গলাও তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। সে নিজের মনে একমন ও উৎকর্ণ ছিল। এখনো কি নেপ পুকুরের পাড়ে কেউ সন্ন্যাসীকে দেখেনি? রাত ভেঙে চকোসা হয়েছে সেই কখন, এত আলো, তবু তাকে দেখতে পেল না কেউ? তবে কি আসেনি সে?
আসেনি?
ঠিক এই সময় খবর পৌঁছে গেল সেখানে। কথাটা কানে যাওয়া মাত্রই উত্তেজনায় আর কিছুটা হিংস্র আনন্দে স্মৃতির চোখেমুখে আগুনেআলো দপ করে চলকে উঠেছিল। সে টানটান হয়ে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল। নিজেকে সামলাল সে। কেউ তাকে লক্ষ করার আগেই সে তার মুখ থেকে আগুন-লাগা আলো সরিয়ে দিল। নিজেকে গুছিয়ে ধরল ভিতর থেকে। শান্ত। কিছুটা উদাসীন।
কথাটা কানে যেতে ও সবিস্তারে শুনতে শুনতে মাধবের মা হতবুদ্ধি ও বাক্যহারা হয়েছিল। যথার্থই থ হয়ে গিয়েছিল সে।
এখন মাধবমাস্টারের মা রাগে একেবারে ফেটে পড়েছে। বলল, বাবা বাগেশ্বরকে নিয়ে এত বড় কথা? আমি ও সন্নেসীর মুখে এখুনি নুড়ো জ্বেলে দিয়ে আসব—
—কি হয়েছে মা? খুব আলগোছে বলল স্মৃতি।
—কি সব্‌ বোনেশে কথা বললে শুনতে পাসনি তুই?
—বলুক গে।
—বললেই হল! দেবতা নিয়ে খেলা?
—কাগে কান নিয়ে গেল বললে, ছুটতে হবে নাকি!
—তাই বলে ভগবান থাকবে গাছে!

—থাকলে থাকে, না থাকলে না থাকে, অত কি।

—আর আমার মাধবের সুনাম দুর্নাম? এত নাম, এত দয়া যে দেবতার, পাঁচটা গাঁয়ের আপদেবিপদে যে দেবতা……কথাটা শেষ করার মত কথা পেল না মাধবের মা। হে ঠাকুর, তুমি দেখো, এই বলে বেশ গলা ছেড়ে কাঁদল।

স্মৃতি কিছু বলল না। দাঁড়িয়ে দেখল শুধু। তার মার নানা ব্যবহার সে বেশ জানে। এবং স্মৃতি যেমন জানে, মার কান্না যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল, তেমনি আচমকা থামল। মাধবমাস্টারের দুই বৌ, তাদের ছেলেমেয়েরা অনেকে ও বাকু, তখন সে জায়গায় জটলা করছে। হাঁসগুলো প্যাঁকপ্যাঁক করছে ঘন ঘন।

মার কান্না থামলে স্মৃতি বলল, তুমি এমন করছ, যেন বাবা বাগেশ্বর গোটা গাঁয়ের নয়, শুধু দাদার আর তোমার।

—আমাদেরই তো। বাবাকে সেবা করে কে? পুজো করে কে? দেবতা কি ছোটলোকদের, যে তেঁতুলেপাড়ায় গাছে থাকবে?

—ছোটলোক বলো না মা। ভোটের সময় দাদা ওদের কাছে ভোট চায়, ওদের সঙ্গে কাজ করে, তা দেখনি?

—হ্যাঁ দেবতা ওখানে ভোট চাইতে গেচে, এই বলে কথাটা একেবারে ঘুরিয়ে দিয়ে মাধবমাস্টারের মা বলল, আমি এখুনি যাব নেপ পুকুর।

—আমিও যাব, স্মৃতি বলল।

মাধবমাস্টার কোন জিনিসেই সহসা উত্তেজিত হয় না। সন্ন্যাসী প্রসঙ্গ কানে যাওয়ার পর সে গিয়েছিল ফোটো মিস্তিরের কাছে। ফোটোর সঙ্গে তার কিছু পরামর্শের দরকার ছিল। বাগেশ্বর গাছে থাকে কিনা, তা নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা হয়নি। হঠাৎ রাতারাতি কোথা থেকে এক সন্ন্যাসী এসে সিডিউলদের পাড়ায় বসে এসব বলছে কেন, এটাই তাকে ভাবিয়েছিল। ফোটোর সঙ্গে এটাই ছিল তার পরামর্শের বিষয়।

মাধবমাস্টার আর ফোটো একসঙ্গে যাচ্ছিল নেপ পুকুরের দিকে।

যতটা গলা তোলা দরকার, তার চেয়ে অনেক বেশি জোরে নিজের মনে বক বক করছিল মা। এতটা গলা তোলার উদ্দেশ্য একটাই। পাঁচজনে শুনুক। দেখুক পাঁচজনে। শুধু পাঁচজন? না। ওই যে তার ছেলে যাচ্ছে, মাধব, সে যেন নিজের কানে শুনতে পায় মার গলা। বিশেষভাবে সে জানুক কতটা লেগেছে, কেমন ছটফট করছে তার মা। আজকাল তাকে দেখাতে

হয়। ছেলেকেও নতুন করে বোঝাতে হয়, ছেলের প্রতি মায়ের টান কত। হারে কপাল। জামাইবাড়ি থেকে আবার ছেলের কাছে ফিরে আসার পর এই বিধবা বড়ই অসহায় বোধ করে। এমন কপাল তার আগে ছিল না। এখন হয়েছে।

একসময় মার গলা কানে গেল মাধবের। মাধব পিছন ফিরল। ফোটোও।

মাকে আসতে দেখে মাধবমাস্টার বিরক্ত হল। হয়তো রাগও।

মার গায়ে শেমিজ নেই। গায়ে আঁচল জড়িয়ে নিয়েছে। আজকাল মাধবের মান, কাজের পরিধি অনেক কিছুই বেড়েছে। সে বর্ধমান যায় হামেশা। কলকাতা যায় মাঝে মাঝে। জেলা থেকে কালেভদ্রে কোন নেতা শুধারে এলে, মাধবের বাড়িতে ওঠে। সেই মাধবমাস্টারের কাছে মার শেমিজ না পরাই হয়তো বিরক্তি ও ক্রোধের কারণ হল।

মাধবমাস্টার দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ফোটোও। কাছাকাছি হতেই মাধব মাকে বলল, তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

—সেই মুকপোড়া সন্নেসীকে দেখতে।

—আমরা তো যাচ্ছি।

—সে তোর বাপপিতেমোর অপমান করেছে।

—বাবার কথা তো কিছু বলেনি।

—আমরা বংশ বংশ ধরে বাবা বাগেশ্বরের পা ধরা। আর বলে কিনা, সেই দেবতা মন্দিরে নয়, গাছে থাকে! তাও নমশূদ্র পাড়ায় ?

এই বলে মাধবমাস্টারের মা বেশ জোরে কেঁদে উঠল আবার। মাকে থামাতে হলে ধমকাতে হয়। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে কাজ করলে মাধবের মানে টান পড়ে।

—তুই কোথায় যাচ্ছিস স্মৃতি ?

—দেখতে।

—কি দেখবি ?

—সন্নেসী ?

—ওতো সঙ

—তাই দেখব।

—কতোবার তোকে বলেছি, এমন হুটহাট সব জায়গায় যাস না।

—মা দেখবে, তুমি দেখবে, আর আমি দেখব না ? এই বলে স্মৃতি রাস্তার দাঁড়িয়ে হিহি করে হাসতে লাগল।

স্মৃতি হাসলে তাকে না দেখে উপায় থাকে না। এমনিতে তার শরীরে, শরীরের বাঁধুনিতে, মাজা কালো রঙে, একটা টান আছে। হাসলে পরে সেই টান চমকায়। ফোটো মিত্তির স্মৃতিকে দেখছিল। দৃষ্টিখিদের মতই এক ধরনের লালসা আছে, যা নখদন্তহীন। চোখ দিয়ে চাটার মত। ফোটোর স্মৃতির দিকে তাকানো দেখে মাধবমাস্টারের মনে হল, সাধে কি আর স্মৃতির কুলটা বলে দুর্নাম হয়েছিল শ্বশুরবাড়িতে!

নিজের ছেলের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে স্মৃতি বলল, আসবে তো এসো মা।

মাধবমাস্টার গিয়ে পৌঁছতে নেপ পুকুর পাড়ে জড়ো হওয়া মানুষগুলোর মধ্যে একটু নড়াচড়া হল। ভিড় আপনি পথ করে দিল মাধবমাস্টার ও ফোটো বাবুকে। মাধবের মা, স্মৃতি ও তার ছেলেও পৌঁছে গেল সামনে। মাধব মাস্টার বলল সন্ন্যাসীকে, কোথায় থাকা হয় ?

সন্ন্যাসী যেন শুনতেই পেল না।

—এই যে, এই যে তোমায় বলা হচ্ছে। মতলবটা কি ?

সন্ন্যাসী ঘাড় ফেরাল।

—বাবা বাগেশ্বর এখানে পাকুড় গাছে থাকে ?

সন্ন্যাসী মাধবের দিকে স্থির চেয়ে থাকল। তারপর ইঙ্গিতে জানাল, হ্যাঁ।

—কথাটা তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।

অগ্রাহ্য করার চাহনিতে সন্ন্যাসী মাধবের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

—কি হল, একেবারে বোবা মেরে গেলে যে। মন্দিরে কে থাকে তাহলে ?

—কেউ না।

—কেউ না মানে ?

—পাপ আসে ওখানে মাঝে মাঝে। তাই বাবা ওখানে থাকে না।

—কিসের পাপ ? কেমন পাপ ?

—মানুষের পাপ। পাপী মানুষ। আবার কি!

—এসব কথার মতলব!

সন্ন্যাসী নিরুত্তর। অনেকটা যেন পাথরের মত নিরপেক্ষ।
—বলো। তোমায় বলতে হবে। এখানে এসে এসব বলায় বুজরুকি বার করে দেব তোমার।
—পাপী কি নিজের পাপ চেনে? এই বলে সন্ন্যাসী হাসল।
—মানে?
—চিনলেও, নিজের পাপকে পাপ বলে মানে?
—তার মানে?
—যদি মানত তাহলে পাপী পাপ ছাড়ত, সে আর সেই পাপ করত না—
—এত পাপ পাপ করছ কিসের হে, মাধব খানিকটা ফুঁসে উঠল।
—পাপী চিনি, তাই বলছি।
অপলক চেয়েছিল স্মৃতি সন্ন্যাসীর দিকে। একদৃষ্টে। বাদলের চোখ দুটো কি আশ্চর্য সুন্দর। এত যে সুন্দর, তা যেন আগে এমন করে কোনদিন বোঝেনি স্মৃতি। সরল। গভীর। নিষ্পাপ। কোন দিঘীর মত টলটলে চেয়ে আছে। সেই চোখের দিকে চেয়ে স্মৃতির মনে হল, জীবনে এই প্রথম তার বিয়ে হচ্ছে। চারদিকে শাঁখ বাজছে। জন্মজন্মান্তর ও যেন আমার হয়। আমি প্রতিদিন রাতে ঘুমিয়ে পড়ার আগে ওর চোখে আমার জিব হালকা করে ছুঁইয়ে ওকে চুমু খাব, যা ও পছন্দ করে। দিদিমা ঠাকুমারা যেমন বলে, আমি তেমনি প্রতিটি জন্মে সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে চলে যাব। আমি বসে থাকব, আর ও চলে যাবে, তা হবে না। আমি চলে যাব। ও থাকবে। বুঝবে মজা।
স্মৃতি হঠাৎ মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসে, গলায় আঁচল দিয়ে, মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে, সন্ন্যাসীর দুই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। স্মৃতির দুই হাতের দশ আঙুল, চেপে বসে গেল সন্ন্যাসীর দুই পায়ের পাতায়। সন্ন্যাসী আশী-র্বাদের ভাষায় এক হাত ওপরে তুলে চোখ বুজল।
—মা, তুমি এখনো চুপ করে থাকবে? দাঁতে দাঁত টিপে বলল মাধব। তবু মাধবমাস্টারের মা, হৃদয়পুকুরের বিধবা, একটা কথাও বলল না। এই সন্ন্যাসীকে সে নির্ভুল চিনে ফেলেছে।
হে ভগবান।

৪

॥ লাগ্ ভেলকি লাগ্ ॥

ফটিকবাবু বলল, তুমি যে সত্যিই বুজরুকি দিচ্ছ না, তা বুঝব কি করে ? একটু আগেই বুজরুকি শব্দটা বলেছিল মাধব। সন্ন্যাসীকে তুমি সম্বোধন ও বুজরুকি শব্দের ব্যবহার সবই মাধবমাস্টারের মত। কিন্তু এভাবে সন্ন্যাসীকে তুমি আর বুজরুকি বলে, ফটিকবাবু টের পেল যে সন্ন্যাসীকে এভাবে বলাটা তার ঠিক হল না। ছোটবেলা থেকে জাতহ্যাংলা ফোটো। ফলত সে কামুক ও ভীতু। সে ভাবল, সন্ন্যাসী নিয়ে খেলা নয়। তাই সামাল দেবার জন্য বলল, কি করে বুঝব বাবা। 'বাবা' যোগ করল ফোটো।

সন্ন্যাসী কোন উত্তর না দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। বিশেষ কারো দিকে নয়। গাছপালা এমনকি আকাশের দিকেও না। তারপর বলল, ওই দিকটায় শ্মশান, না ?

—হ্যাঁ বাবা, কে যেন উত্তর দিল।

—তাকে দেখতে পাচ্ছি।

—কাকে দেখতে পাচ্ছেন বাবা ? কাকে ?

—এ গ্রামের এক গৃহী। নিঃসন্তান। শ্মশানে তন্ত্রসাধনা করতে গিয়ে পক্ষাঘাত হয়। মারা যায়। ঠিক ?

উপস্থিত এ ও সে পরস্পরের মুখ চাইতে লাগল। শুধু মাধবের মা কারো মুখের দিকে তাকাল না। সে তো জানে, মেয়ের বাড়িতে, অর্থাৎ জামায়ের কাছে থাকার সময় শুধারে গাঁয়ের কত গল্পই সে করেছে। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে তন্ত্র নিয়ে মেতে পক্ষাঘাতে মরল যে কনেকর্তা, সে গল্প তো সে-ই করেছে। মাধবের মার সদ্য বিয়ে হয়েছে তখন। ইতিমধ্যে বয়স্ক কে একজন বলে উঠল, উনি কনেকর্তার কথা বলছেন। আর একজন বয়স্ক বলল, আমরা তখন এইটুন—

ফোটোবাবু ড়ুম করে বলে বসল, আগে থেকে গাঁয়ের খবর নিয়ে আসা হয়েছে? ভেকধারী, তোমার মতলব কি বাবা?
জিব থেকে সব শাসানি তুলে নিয়ে আবার 'বাবা' যোগ করল ফোটো।
সন্ন্যাসী গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না ফোটোবাবুকে। এবার সে স্মৃতির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। তারপর হঠাৎ স্মৃতির দিকে সোজা আঙুল তুলে বলল, এই মেয়েটির বিয়ে হয়েছে সাত বছর আগে। চার বছর স্বামীর ঘর করেছে। বিধবা হয়েছে তিন বছর। ঠিক?
বিড়বিড় করে স্মৃতি বলল, ঠিক।
এই 'ঠিক' শব্দটা শুনতে পেল কাছাকাছি অনেকেই।
—এর স্বামী এর থেকে বয়সে ২৪ বছরের বড় ছিল, ঠিক?
স্মৃতি আবার বিড়বিড় করে বলল, ঠিক। এবং কাছাকাছি বেশ কজন তা শুনতে পেল।
এরপর সন্ন্যাসী একদৃষ্টে চেয়ে থাকল মাধবমাস্টারের মার দিকে। তারপর স্মৃতির বেলা যেমন, তেমনিভাবেই তাঁর দিকে আঙুল তুলে বলল, এনার স্বামী—
বাক্য সমাপ্ত হল না। সন্ন্যাসীর চোখ দুটি আধবোজা হল। কপালে ঈষৎ কুঞ্চনও। তারপর চোখ খুলে বলল, হ্যাঁ, ৩১ বছর আগে বৈশাখী পূর্ণিমায় তিনি গত হন। ঠিক?
মাধবমাস্টারের বাবা হৃদয়পুরুতের মৃত্যু একটা পারিবারিক ব্যাপার। ঠিক কত বছর আগে, কোন তিথিতে তিনি দেহ রেখেছেন, কারই বা তা মনে আছে? একমাত্র নির্ভুল মনে আছে শুধু মাধবমাস্টারের মার। অন্য কারও এসব কিছুই মনে নেই। মাধবকেও হিসেব করতে হবে।
অনেকের মতই ফোটোবাবুও মোটামুটি হাঁ হয়ে গেছে। এক এক জন সাধু সন্ন্যাসীর এক এক রকম ক্ষমতা হয়। এই সাধু হয়তো তার ক্ষমতার একটু দেখিয়েছেন।
কে একজন বলল, কাগজে পড়ছিলুম, চণ্ডীগড়ে একজন সাধু এসেছিল। সে নাকি পায়ের তলা দেখে সব বলে দেয়।
—একটা ট্যাবলেট নাকি হাতে বাঁধলেই কিস্তি, কাগজে পড়েছি—, আর একজন বলল।
—দুর। ওটা বিজ্ঞাপন। হাঁদা কোথাকার।

ফটিকবাবুর কানে সেসব কথা গেল না। জাতহ্যাংলা ফোটো যেমন যুবতী দর্শনে নির্বিষ কামনাকাতর হয়, তেমনি সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে ভূত ভবিষ্যৎ জানার সুযোগ ঘটলে, তা না জানতে পারা পর্যন্ত শুধু অস্থির নয়, ভীত বোধ করে।

ইতিমধ্যে ফোটো সন্ন্যাসীর সামনে উবু হয়ে বসে পড়েছে।

—আমার কপালে কি দেখছেন বলুন বাবা।

কথাটা যেন শুনতেই পেল না সন্ন্যাসী।

—কি হল বাবা!

—পারলে তো বলবে, মাধবমাস্টার বলল, এ সাধু কে কবে বিধবা হয়েছে কেবল সেইটে বলার ঝাড়ফোঁক জানে।

সন্ন্যাসী অন্ধ স্পর্ধায় তাকাল মাধবমাস্টারের দিকে। তারপর আবার ফোটো মিত্তিরের চোখে চোখ রেখে বলল, আপনাদের গাঁয়ে একটা মস্ত ঝিল আছে। তার মাঝখানে ডাঙা, চারদিকে জল।

—এ তো একটা বাচ্চাও জানে বাবা, ফটিকবাবু তোষামোদের মত বলল।

—ওই ডাঙায় কি?

—কি আবার।

—কবর।

—কবর?

—দেড়শো বছরের পুরনো কবর, এই বলে সন্ন্যাসী মাধবের মার দিকে তাকাল। সন্ন্যাসীর চাহনি ও হাসি অপার রহস্যময়। মাধবমাস্টারের মা ভিতরে ভিতরে কাঁপছে।

—মুসলমানদের পরব, সবে-বরাতের দিন ওই ডাঙার ঢিবির ওপর চেরাগ জ্বলে। জ্বলে না?

—চেরাগ কি? একজন জানতে চাইল।

—বাতি, আর একজন জানাল।

—কোনদিন খেয়াল করিনি তো।

—এইবার ঠাওর করতে হবে।

—এসব যদি সত্যি না হয়? আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল মাধব।

সন্ন্যাসী যেন শুনতেই পেল না। অবহেলা। তারপর ছেড়ে ছেড়ে বলল, বাগেশ্বরের মন্দিরের দক্ষিণে......বাগেশ্বর নয়গো বাবারা, আসল নাম হল

ব্যাঘ্রেশ্বর, তাই তো মা? এই বলে সন্ন্যাসী আবার মাধবমাস্টারের মার দিকে তাকাল। মাধবের মার মাথার ভিতরটা এই মুহূর্তে ফাঁকা।

—মাধব, বাবা বাগেশ্বরের নাম সত্যিই ব্যাঘ্রেশ্বর নাকি?

ফোটো মিত্তির স্পষ্টতই কৌতূহল প্রকাশ করল, এ বলে কি হে! মানে, ইনি এসব কি বলছেন! এ তো কোনদিন শুনিনি বাবা—

মাধব স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সন্ন্যাসীর দিকে। এই প্রথম তার মনে হল, কে এই লোকটা? কোথাকার মানুষ? এখানে কেন? কি চায়?

—কি হে কিছু বলবে তো. ফোটো তাড়া দিল।

—কি বলব?

—বাবা বাগেশ্বরের আসল নাম ব্যাঘ্রেশ্বর?

—হ্যাঁ

—তাহলে বাগেশ্বর হল কি করে?

—লোকের মুখে মুখে।

—কোনদিন বলনি তো! তুমি জানলে কোথায়?

—বাবার কাছে শুনেছিলাম। কিন্তু তুমি জানলে কোথায়?

তুমি, জানলে, কোথায়, এই তিনটি শব্দ ছেড়ে ছেড়ে, কেটে কেটে ও প্রতিটির ওপর অস্বাভাবিক নিচু গলায় জোর দিয়ে সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্যে বলল মাধব।

—খুব গুহ্য কথা বুঝি? এই বলে আবার আগের কথার জের ধরে সন্ন্যাসী আবার ছেড়ে ছেড়ে বলতে লাগল, বাগেশ্বরের মন্দিরের দক্ষিণে…আটশো পা তফাতে…মস্ত ভাঙা বাড়ি…খুব ছোট ছোট ইঁট…

—সে তো সবাই জানে বাবা। বোসবাড়ি। একবার গাঁ দিয়ে হেঁটে গেলেই জানা যায়—।

পাঁচ পুরুষ আগে ওই বোসবাড়িতে ডাকাতির গল্প শোনাল সাধুবাবা। ডাকাত এসেছিল চিঠি দিয়ে। সব যেন সন্ন্যাসীর নিজে দেখা। আঃ। জামাইবাড়িতে থাকার সময় এই গল্পও তো করেছে মাধবমাস্টারের মা।

সন্ন্যাসী গল্প শেষ করল এইভাবে…'ডাকাতির রাতে নিচেতলায় আঁতুরঘরে খোকা কোলে বাড়ির সেজোবৌ। সেই আঁতুড়ঘরের দরজায় একটা জ্বলন্ত মশাল পুঁতে দিল ডাকাতসর্দার। বলল, এই খোকা জজম্যাজিস্টেট হবে। সেই খোকা তাই হয়েছিল…

—হয়েছিল? সন্ন্যাসী জানতে চাইল, যেন মাধব আর তার মার কাছেই।

ফটিকবাবু বলল, ও বাড়ির সবাই থাকে কলকাতায় আর বিদেশে। দু'ঘরে শুধু দুই বুড়ি থাকে।

—সত্য মিথ্যা ওঁরাও জানেন, সন্ন্যাসী বলল, ওঁদের শ্বশুরকুলের ব্যাপার।

—যদি সত্যি না হয় ?

মাধবের ভেতরে দাপাদাপি হচ্ছিল। সিডিউল পাড়ায় সন্ন্যাসী আগমন কেন সেটাই বুদ্ধি করে বোঝার কথা ছিল। অথচ ব্যাপার অন্য রকম হচ্ছে। ফোটো ঘুরিয়েফিরিয়ে নিজের ভূতভবিষ্যৎ জানতে চাইছে। অন্য কোন মাথাব্যাথা নেই।

—যদি সত্যি না হয় ? আবার বলল মাধব।

—হবেই।

মাধবের আবার মনে হল তার সঙ্গে সন্ন্যাসীর কথা বলার ভঙ্গী অন্য রকম উদ্ধত। মাধবের মেজাজ ও রক্ত দুই চড়ছিল। কেন, তা সে বুঝতে পারছিল না। এখনো দুটোকেই সে ধরে আছে।

মাধব আর কথা না বাড়িয়ে বোস বাড়িতে পাঠাবার জন্যে বিশেষ কাউকে খুঁজতে লাগল। স্মৃতি জানে, যদিও দাদার দু'পক্ষের ছেলেরা ভিড়ের মধ্যে কাছাকাছি আছে, তবু দাদা তাদের ডাকবে না। দাদা আর কাউকে খুঁজছে না। খুঁজছে পরাণদাকে। স্মৃতি যা ভেবেছিল, ঠিক তাই। মাধবমাস্টার গলা তুলে হাঁক দিল, পরাণ—

'পরাণ' ডাক শুনেই উৎকর্ণ হল সন্ন্যাসী। তার দুই চোখ জ্বলজ্বলে। এইবার সে স্মৃতির পরাণদাকে দেখতে পাবে। শুধারে গাঁয়ের পরাণঠাকুর। একটা জ্যান্ত দলিল।

৫

॥ ঢাকের বাদ্যি ॥

রটনাই পরাণকে টেনে এনেছিল। ভিড়ের একেবারে পিছনে দাঁড়িয়েছিল পরাণ। মাধবমাস্টার তাকে হাঁক দেওয়া মাত্রই, আচমকা তার চোখের নিচে মাংসপেশী কেঁপে উঠল। আজকাল মাঝেমাঝেই তার এ রকম হয়। কখনো চোখের কোল, ঠোঁট, বুক বা যে কোন একটা হাত কাঁপে। নিয়ন্ত্রণহীন। তিরতির।

পরাণের বয়স ৪৪। দেখায় ৬০। ডান চোয়ালের দিকে একটি দাঁত নেই। হলদেটে দাঁত। মাথায় আসলে যতটা, তার চেয়েও অনেক ছোট আর খাটো দেখায় তাকে। কেননা সে কেমন গুটিয়ে থাকে। ছেলেবেলা থেকেই তার এক চোখ সামান্য ট্যারা। সেই চোখে ছানি। এতটা ছানি অবিশ্বাস্য। কিন্তু সত্য। সারাজীবনে ও প্রোটিন আর ভিটামিন পায়নি বললেই হয়।

পরাণের গাল তোবড়ানো। গায়ের রং পুকুরের জলের মত তেলতেলে, কালো। সব সময় টোকো গন্ধ গায়ে। মাঝে মাঝে কথা জড়িয়ে যায় ওর। জ্ঞানত ও কোন অপরাধ করেনি। অথচ সব সময়, প্রায় সর্ব অবস্থায় কাঁটা হয়ে থাকে ও। কোন একদিন নিশ্চয়ই ওর মধ্যে প্রতিরোধ ছিল। কিন্তু এখন ও শুধু বেঁচে থাকে। ঈশ্বর ওকে এমন জীবন দিয়েছেন—নিজের মনে ও তা-ই মনে করে। যে কেউ জোরে কথা বললে ও চমকে ওঠে। আর মাধবমাস্টার ও তার দুই স্ত্রী—যাদের ও বড় ও ছোট বৌদি বলে—তাদের সামনে ও প্রায় কথাই বলতে পারে না! মাধবমাস্টারের বাড়ীতে দু'বেলা খাওয়ার পর ওর নিজের বাসন ও নিজেই মাজে। বাসন বলতে একটা কলাই করা থালা আর কলাই করা গেলাস। এঁটো থালার ওপর গেলাস রেখে যখন দাঁড়ায়, তখন যদি সামনে দুই বৌদির একজন থাকে, তাহলে থালার

ওপর গেলাসের ঠকঠক শব্দ হয়। ভিড় ঠেলে গুটিগুটি এগিয়ে এসে পরাণ বলল, কি বলছেন মাধবদা ?

হাঁটু পর্যন্ত পানসে ফ্যাকাসে ধুতি। ময়লা নামাবলী গায়ে। শির ওঠা, রোগা পা। থ্যাবড়া। ধুলো মাখা।

সন্ন্যাসী পরাণকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

—তোমার পুজো শেষ হয়েছে ?

পরাণ যে ঠিক কি বলল, তা বোধহয় মাধব ছাড়া অন্য কেউ বুঝল না।

—হয়নি ? আর তুমি এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ ? যাও, যাও। আর শোন, যাবার পথে একবার বোসবাড়িতে যাও—

সন্ন্যাসী হঠাৎ বলল, না। উনি যাবেন না।

—তার মানে ?

—ওনার এখানে কাজ আছে।

—কি কাজ ?

—পুজোর কাজ। আপনি অন্য কাউকে পাঠান।

—তোমার হুকুম ?

সন্ন্যাসী হাত জোড় করল। তারপর জোড়হস্ত পরাণের দিকে তুলে বলল, ওনার অনেক পুণ্যি।

—তুমি পাপ পুণ্যির এজমালি নিয়েছ। না ? —পরাণ তুমি গেলে ?

—আপনি যাবেন না পরাণঠাকুর

—ও যাবেই। এখুনি যাবে।

—না।

—তুমি জানো ও আমার কে ?

—জানি।

—কে ও আমার ?

—বললে আপনার মান থাকবে ?

—মান যাওয়ার কি আছে ?

—উনি আপনার মুনিষ।

—মুনিষ মানে ?

—জমি জোত দেওয়ার জন্যে জন-মুনিষ থাকে না ? উনি আপনার পুজো করার মুনিষ।

মাধব দিশে হারিয়ে ফেলছিল। তার ভিতর বিছে কামড়াচ্ছিল। তার সারা জীবনে তাকে এই কথাটা কেউ কোনদিন, এমন করে মুখের ওপর বলেনি। মাধব তার মার দিকে তাকাল। মা বোবা। আঁচলের খুঁট দাঁতের ফাঁকে ধরে আছে স্মৃতি। হাসছে। ছিঃ। মাধব ফোটোর দিকে তাকাল। যে কোন কারও কাছ থেকে সমর্থন আসুক। এই মুহূর্তে মাধব সমর্থন খুঁজছে। অথচ ফোটো মিত্তিরও কেমন মজা মারা মুখ করে স্মৃতিকে নয়, সন্ন্যাসী আর মাধব মাস্টারকে আলাদা করে দেখছে। চারপাশে মেলা লোক। সকলের সামনে সন্ন্যাসীর সঙ্গে মাধবের রেষারেষি নিতান্তই ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে গেছে।

—পরাণ, তুমি গেলে? মাধব চিৎকার করে বলল।

ফটিক মিত্তিরের মনে হল সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের জন্য বোসবাড়িতে অন্য কাউকে পাঠালেই সমস্যা মিটে যায়। গয়লাপাড়ার বাসব বলে একটি ছেলের সাইকেল হেলান দিয়ে দাঁড় করানো ছিল কাছেই এক মাটির দাওয়ার বাঁশের খুঁটিতে। ফটিকবাবুর কথায় বাসব চলল সাইকেলে বোসবাড়ির দুই বুড়ীর কাছে। যাবে আর আসবে। ওর সদাই প্যাডেলে পা।

বাসব চলে যেতে, খুব স্বাভাবিক আর নিরুত্তাপ গলায় মাধব পরাণকে বলল, তুমি সোজা গিয়ে পুজো সেরে ফেল।

—না, মাধবের কথার মাঝখানে আবার বাধা দিল সন্ন্যাসী।

—তোমার হুকুম। আবার সেই এক কথা বলল মাধব। তবে এবার প্রায় ফুঁসছে।

—আমি হুকুম করবার কে। উনি পুজো করবেন বলেই তো এসেছি।

—উনি কেন?

—ওনার কত পুণ্যি। ব্রাহ্মণ।

—আর আমি কি বেজাতের সন্ন্যাসী?

—তুমি বাছা ঠিক ব্রাহ্মণ নও।

—কি? তুই আমার জাত তুললি?

—জাতের কথা নয় বাবা। সত্য মিথ্যার কথা।

চড়ে যাওয়া মেজাজ আর রক্ত আর ধরে রাখতে পারল না মাধব। ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে সে সন্ন্যাসীর চুলের মুঠি ধরতে যাচ্ছিল। সন্ন্যাসী মাথা সরিয়ে নেওয়ায় মাধবের হাত পড়ল সন্ন্যাসীর কাঁধে। কাঁধ থেকে ঘাড়ে। ফোটো মিত্তির 'কি কর', 'কি কর' করে সামলাবার জন্য এগিয়ে

আসছিল। এক হাত তুলে তাকে নিরস্ত করল সন্ন্যাসী। মাধব তার ঘাড় ধরেই থাকল। সন্ন্যাসী বাঁ হাত দিয়ে টেনে, কোলের ওপর নিল তার গেরুয়া ঝোলা। ঝোলা থেকে বার করল একটা ছোট ঝাঁপি। বেদেদের মত। মুখ খুলতেই বার হয়ে এল ফণাতোলা সাপ। 'বাপরে' বলে ছিটকে সরে এল মাধব।

সবাই বড় বড় চোখে দেখছিল। কারা যেন হ্যাঃ হ্যাঃ করে হেসে উঠল একবার। ঝোলাতে আবার হাত ঢুকিয়ে সন্ন্যাসী সাপের কাছে ধরল। হাতে ধরা অবস্থাতেই গুটিয়ে নিস্তেজ হয়ে গেল সাপটা। সন্ন্যাসী উঠে পাঁচ পা হেঁটে; একেবারে পাকুড় গাছের গোড়ায় ঝুপ করে ফেলে দিল সাপটাকে। সাপটার মাথার কাছে থাকল, লাল ন্যাকড়ায় মোড়া কিছু। সাপটা নড়ল না। সন্ন্যাসী পরাণের দিকে তাকিয়ে বলল, আসুন।

ঠিক তখন ফিরু মুচি এসে গেল ওর ঢাক নিয়ে। বাবা বাগেশ্বরের চোত গাজনে আর অন্যান্য পালাপার্বণে যে বাঁধা তিনজন ঢাকি বছরে দেবত্র থেকে এক মণ করে চাল পায়, ফিরু মুচি তাদের একজন। একটা কাঁসিও বাজতে থাকল—ট্যান্--ট্যানান্—ট্যান্-ট্যানান্—ন্—ন্--। ধূপধুনো আগে থেকেই জ্বলছিল। এখন কেউ আরও খানিকটা ধুনো আর নারকেল ছোবড়া দিয়ে হাওয়া করতে লাগল। গলগল করে ধোঁয়া উঠছে। হাতে একটা নারকেল নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সন্ন্যাসী। এক পা এক পা করে পরাণের দিকে এগিয়ে আসছে।

পরাণ মাধবের দিকে তাকাল। সে বুঝতে পারছে সে জড়িয়ে যাচ্ছে। মাধবকে তার বড় ভয়। অথচ সন্ন্যাসীর কথা শুনবে না ভাবতে তার আরও ভয় করছে। তার গলার ভিতর দলা পাকিয়ে যাচ্ছে।

ততক্ষণে সন্ন্যাসী পরাণের হাত ধরে ফেলেছে। হাত ধরে নিয়ে গেছে, মাধবের থেকে অনেক তফাতে, পাকুড় গাছের তলায়। পরাণের হাতে নারকেল দিল সন্ন্যাসী। পরাণের হাতে নারকেল কাঁপছে। সন্ন্যাসী বলল, এই পাথরে নারকেলটা ঠুকে ফাটিয়ে দিন।

একটা ঢাক বাজছে। একটা কাঁসি বাজছে। হঠাৎ কাঁপতে কাঁপতে গোঁ গোঁ আওয়াজ করতে করতে পরাণ……। ওর নাকি মৃগী আছে। কেউ বলল, সেই অসুখটা হল। কেউ বলল, অসুখ নয় গো, ভর হয়েছে বাবার।

পরাণ যখন টাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, তখন তাকে সামলে শুইয়ে দেবার আগেই,

পরাণের হাত থেকে নারকেল নিয়ে নিয়েছে সন্ন্যাসী। এখন নিজেই নারকেলটা একধারে ফাটিয়ে, পরাণের মুখে ফোঁটা ফোঁটা জল দিতে লাগল। সবাই দেখল, পরাণঠাকুর—গাঁয়ের সবাই ওকে ওই নামে ডাকে—জিব দিয়ে চুকচুক করে নারকেলের জল খাচ্ছে। চোখ পিটপিট করে তাকাচ্ছে। খুব জোরে ঢাক বাজাতে লাগল ফিরু মুচি। সঙ্গে কাঁসি। চারদিকে এমন শব্দ হতে লাগল, যেন মনে হয় দশটা ঢাক বাজছে। কেননা কেউ তখন কোন কথা বলছিল না।

॥ মা ও মেয়ে ॥

মাধবমাস্টারের দুই স্ত্রী। গাঁ-ঘরে এখনো বলে দু'পক্ষ। প্রথম স্ত্রীর পর পর দুটি মেয়ে হওয়ার পর, চার বছর কোন সন্তান হয়নি। তারপর দুটি ছেলে। একজন সৌরভ। অন্যজন গৌরব। দ্বিতীয় পক্ষেও প্রথম সন্তান কন্যা। তারপর দুই ছেলে। জয়দীপ আর চিরদীপ। তারপর দ্বিতীয় পক্ষের ক'বছর বিরতি দিয়ে আর একটি মেয়ে। এই মেয়েই সর্বকনিষ্ঠ। বয়স আট। স্কুলে পড়তে যায়। অন্য তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। দু'পক্ষের পুত্রসন্তানদের মধ্যে জয়দীপ জ্যেষ্ঠ। চিরদীপ মধ্যম। সৌরভ ও গৌরব যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্র। বড় ছেলে জয়দীপ চাকরি করে ঝরিয়া কাতরাসের কাছে এক কোলিয়ারির অফিসে। তার এই চাকরি তার হয়ে খুঁজে দিয়েছে তার ঠামা। চিরদীপ গাঁয়েই কয়লার দোকান চালায়।

বাড়িতে লোহার পাতের গেট, জয়দীপের চাকরি, চিরদীপের কয়লার দোকান, মাধবের তিন মেয়ের বিয়ে, এ সবই মাধবমাস্টারের উদ্যোগ আয়োজনের নমুনা। পিছনে অবশ্য মা। মার হাত। মার হাত, পা, মুখ ও সর্বস্ব। ছেলেদের বেশ মানানসই নাম রেখেছিল মাধব, যা গাঁ-ঘরে অনেকটাই অন্য-রকম। ওই নাম রাখাই সার। কিছুই হল না। চাকুরে বড় ছেলে তো

ইতিমধ্যেই প্রায় হাতের বার। শহরে গেলে যা হয় আর কি। অন্যদেরও কিছু হবে না বোধ হয়।
মাধবমাস্টারের বাড়িটিকে তিন মহলা বলা যায়। যদিও ঠিক পাকা বাড়ি বলতে যা বোঝায়, তা নয়। গাড়ার গাঁথনির ঘর। এঁটেল মাটির সঙ্গে কিছু সিমেন্টের মিশেল আছে। আর মাটির পাঁচিল ঘেরা বাড়ি। সামনের দিকে কালো রঙ করা লোহার গেট। গেট দিয়ে ঢুকলে বাঁ হাতি পাঁচিলের পাশে পাশে কটি বারোমেসে জবা আর কলকে ফুলের গাছ। পুজোয় লাগে। তার থেকে তফাতে ডাঁই করা কয়লা আর ওজনদাঁড়ি। কালো রঙ করা লোহার ফটকের ওপর চুন দিয়ে লেখা 'এখানে কয়লা পাওয়া যায়।'
এই কালো গেট পুরো খোলা হয় কয়লার ট্রাক এলে।
সারা বছরে ট্রাক আসে, খুব জোর দু'বার। জ্যৈষ্ঠের শেষ থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত কোন ট্রাক শুধারেমুখো হয় না। গোটা শুধারেতে ভসভস করে কাদা। তখন মোষের গাড়িই কেবল ভরসা। কাদায় চাকা বসলে জোড়া বলদও হামলে যায়।
কয়লার ডাঁইয়ের থেকে তফাতে ধানের মড়াই। ধানের মড়ায়ের সামান্য ওপাশে বাইরের ঘর। ওটা মাধবমাস্টারের বৈঠকখানা আর শয়নকক্ষ। দুই-ই।
ডাঁই করা কয়লার সামান্য পিছনে একটা চোদ্দ বাই দশ হাত মাটির কুঠি। সে ঘরের বাঁশের বাতায়, খড়ের চাল। ঘরের লাগোয়া হাত তিনেক চওড়া দাওয়া। দিনমানে মাঝেমাঝে এইখানে বসে তার ব্যবসার তদারকি করে চিরদীপ। অর্থাৎ দোকান চালায়। ভাত খাওয়ার আগে এক-দেড় ঘন্টার জন্যে খুললেই হল। রোজ একটি-দুটির বেশি খদ্দের নেই। সিমডিল, জামবোনা, বাগাড়, মিলিক, এসব থেকেও মাঝে মাঝে খদ্দের আসে, তাই। শুধারের গরিব মানুষরা তো আর কয়লা কেনে না। তাদের মাটির উনুন। কাঠ আর খড়কুটোর জ্বাল বারোমাস। যদি কালেভদ্রে দু-তিন টাকার কয়লা কেনে, তবে তারা তা হাতেহাতে বা খুঁটে বেঁধে নিয়ে যায়। এই তো কারবার। তবু কিছু মজুত রাখতে হয়। কেননা খদ্দের লক্ষ্মী।
এই ঘরটাই, এই কুঠিই, পরাণের ঘর। চৌকি নেই। মাটির মেঝে। এক কোণে একটি টিনের বাক্স। কোন একদিন এই টিনের বাক্সটার ওপর দুটো লাল টিয়া আঁকা ছিল। আজ খুঁটিয়ে দেখলেও তা চোখে পড়ে না। মাটির

দেওয়ালে আড়াআড়ি একটি দড়ি টাঙনো। তাতে একটি লুঙ্গি, একটি শার্ট, একটা ধুতি, দুটো বগল-ছেঁড়া গেঞ্জি আর একটা গামছা ঝোলে। পরাণ ঠাকুর প্রতিদিন তার নামাবলি আর পুজো করার কাপড় পাট করে রেখে দেয় তার টিনের বাক্সের ওপর। অন্য পরিধেয়ের সঙ্গে সে নিত্যপুজোর বস্ত্র মেলায় না। ছেলেবেলা থেকে এট তার অভ্যাস। তার ছোটমা, মাধবের মা তাকে এমনি শিখিয়েছেন।

মেঝেতে গোটানো একটা রোগা বিছানা পলিথিন দিয়ে মোড়া। ভিতরে চারটি চট। ওগুলি মেঝেতে পাতা হয়। একটা সতরঞ্চি। পুরোনো খসখসে মার্কিনের গায়ে তাপ্পি দেওয়া চাদর। একটা পাতলা বড় তেল চিটচিটে বালিশ।

ঘরে একটি মাত্র কুলুঙ্গি আছে। তাতে একটা পাঁজি। কড়ে আঙুলের সমান একটা সামান্য জ্বলা মোমবাতি। কালেভদ্রে রাতবিরেতে লাগে। বহু পুরেনো একটা বাংলা সিনেমার গানের বই, যার অর্ধেকের বেশি ছিঁড়ে হারিয়ে গেছে। তাতে হলদে হয়ে যাওয়া আর পোকায় কাটা সুচিত্রা সেন আর উত্তম কুমারের ছবি। এই সিনেমাটা, তাকে ছোটমা নিজে সঙ্গে করে বর্ধমানে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিল। হেঁটে নয়, রীতিমত গরুর গাড়িতে চেপে বাবু হয়ে ছোটমার সঙ্গে বর্ধমান গিয়েছিল সে। জীবনে ওই একবার মাত্র হলে বসে সিনেমা দেখেছে সে। ছোট মা নিজে গানের বই কিনে দিয়েছিল। আর দিয়েছিল ফেরার মুখে ঠোঙায় করে সীতাভোগ মিহিদানা। সে কবে? এসব তার গতজন্মের ব্যাপার। ওই গানের বইটা পরাণ তার বাক্সে রাখত কোন মূল্যবান নিধির মত। তারপর এত লোক বইটা এতবার দেখেছে যে আর কেউ দেখে না। কেউ ফেলেও দেয় না ওটাকে। পরাণও না। ফেলতে পারে না বোধহয়। মাটিতে পড়ে গেলে কুলুঙ্গিতে আবার তুলে রেখে দেয়।

কুলুঙ্গিতে দু'চারটি বিড়ি আর চকমকি পাথর দেওয়া লাইটার থাকে রাত্রি-বেলায়। একটুকরো কাপড় কাচার সাবানও থাকে কুলুঙ্গিতে। বছরে এমন ছ'টুকরো সাবান তার প্রাপ্য। ঘরের অন্য কোণে একটা ঝাঁটা। রাত্রে শোবার আগে পরাণঠাকুর মেঝে সাফ করে নেয়। ঘরে কোন হ্যারিকেন নেই। কোন হ্যারিকেন বরাদ্দ নেই পরাণঠাকুরের। ঘরটায় তিনটে জানালা আছে। অনেক হাওয়া বাতাস। আর তিনটে জানালায় তিনবার

দাঁড়ালে, বারবাড়ির সব কটা কোণ—অর্থাৎ কয়লা, ধানের মড়াই, বৈঠকখানাঘর, এমনকি অন্দরের খানিকটাও দেখা যায়।

একবার কলকাতা থেকে এক কবি অতিথি হয়ে এসেছিল শুধারেতে, মাধব মাস্টারের বাড়িতে। পরাণের এই ঘরের তিনটে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ও বাইরে চোখ রেখে সে বলেছিল, বাঃ। খাসা। এ তো দেখি ঘর আর সিকিউরিটি পোস্ট দুইই, একেবারে টু ইন ওয়ান, তাই না?

পরাণ কিছুই বুঝতে পারেনি।

—দারোয়ানের গুমটি বোঝ?

—না।

—ওয়াচ টাওয়ার?

পরাণ বোকার মত তাকিয়েছিল।

—এখানে দাঁড়িয়ে তুমি বাড়ির ভেতর কাকে ওয়াচ কর ঠাকুর? ফুলঝুরিকে?

—ফুলঝুরি কে?

—স্মৃতি গো।

এই বলে সেই কবি তার বাঁ চোখ পরপর তিনবার বন্ধ করে খুলেছিল। শিস দিয়েছিল।

মাধবমাস্টারের বৈঠকখানা ডানদিকে রেখে অন্দরের পথ। দরজাবিহীন খোলা সদর। বাঁয়ে দোতলা। এটাই আদি বাস্তু। এখন দোতলার ঘরে থাকে মাধবের প্রথম পক্ষ। নিচের তলায় থাকে সৌরভ আর গৌরব। প্রথম পক্ষের দুই ছেলে। প্রতি তলায় একটি করে ঘর। একদিন এই দু'ঘরেই স্বামী হৃদয়ঠাকুরের সংসারে মাধবের মার নিত্য শয়ন থেকে নিত্য জাগরণ ছিল। আহার। নিদ্রা। ভয় ও অভয়। স্বপ্ন ও সোহাগ। ডাইনেও দোতলা। তবু এই দোতলা অনেক নতুন। বাইরে থেকে সিমেন্ট পলেস্তারা করা। পাকা বাড়ির মত দেখায়। এটি দ্বিতীয় পক্ষের। ছেলের দ্বিতীয় সংসার হওয়ার পর মাধবের মা-ই এই ঘর তুলেছে। ছেলের সংসারে, সব গোছগাছ, বিলিব্যবস্থা, ছেলের সর্বসুখ বুক দিয়ে করেছে মাধবের মা। সব তার হাতে গড়া। এখন গরবিনী দ্বিতীয় পক্ষ, কোলের আট বছরের মেয়ে নিয়ে ওপরে শোয়। নিচের ঘরে একা চিরদীপ রাজপুত্তুর। পরিষ্কার ভাগ। নিভাঁজ। দুই মহারানী বড় আর ছোট, দুই জনেরই দোতলার নীচের তলায়

মাটির দাওয়া। তারপর উঠোন। উঠোনের শেষে রান্নাঘর। রান্নাঘরের দাওয়া। তারপর পাশাপাশি দুটি ছোট ছোট ঘর। ভাঁড়ার আর ঠাকুর ঘর। স্মৃতি আর তার মা এই ঠাকুরঘরে শোয়। মা আর মেয়ে গায়ে গায়ে জাগে। ঘুমোয়। রাত্রি ভাঙে।

সেদিনও রাত নিশুতি হল। প্রতিদিন যেমন শোয়, ঠাকুরঘরের মেঝেয় পাতলা বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে আছে স্মৃতি আর তার মা। অন্যদিন শোয় আর ঘুমোয় মাধবমাস্টারের মা। আজ একটার পর একটা আকাশপাতাল ভাবনা তার মাথা থেকে যাচ্ছে না।

সাত পুরুষ আগে, মাধবের প্রপিতামহের প্রপিতামহকে শুধারেতে এনে বাগেশ্বর ও দেবত্র পুজোর ভার দেওয়া হয়। সেই তখন থেকে দেবতার আশ্চর্য দয়া এই পরিবারটির ওপর। প্রতি পুরুষে শিবরাত্রির সলতে বলতে একটি করে পুত্রসন্তান। যদিও সবারই সন্তান একাধিক। বাকিরা কন্যা। মাধবও তার বাবার একটিই ছেলে। এ সবের অর্থ হল পরপর ক'পুরুষ ধরে পুজোর ভার, পুজো থেকে সংসারের সংস্থান, কখনো ভাগ হয়নি। দেবতা সাজিয়ে না দিলে পরপর ক'পুরুষ ধরে সংসার এভাবে চলতে পারে না। এই ধারায় মাধব হল বর্তমান সপ্তম পুরুষ।

কিন্তু এরপর?

মাধবের দুই স্ত্রীর গর্ভে পুত্রসন্তান চারটি। তা ছাড়া কন্যাসন্তান—! আজকাল মেয়েরাও নাকি বাবার সম্পত্তির ভাগ পায়? সে বিয়ে হোক আর না হোক। তা-ই আইন? পুজোপাঠ থেকে যা কিছু আয়, বিষয় আসয় তাও কি ভাগ হয় নাকি? হতে পারে? এ তো জমিদারী নয়, বিষয় সম্পত্তি নয়। এসব দেবতার দান। মেয়েরাও তার ভাগ পাবে?

আইনের হাত—! কি এক ভয়ঙ্কর কুরুক্ষেত্র যেন মাধবের মা দেখতে পাচ্ছে।

তাহলে কি এই বুঝতে হবে যে বংশ পরম্পরায় বাবা বাগেশ্বরের যে দয়া ছিল তার শ্বশুরপরিবারে, তা আর নেই! বাবা কি হাত গুটিয়ে নিচ্ছে।

কেন?

এই সব কথা এইভাবে কোনদিন ভাবেনি মাধবের মা। আজ সকালে

সন্ন্যাসীকে নির্ভুল চিনে ফেলার পর তার পায়ের নিচের থেকে মাটি সরে যাচ্ছে।

জামাইবাড়িতে থাকার সময়, স্মৃতি আর বাদলের সম্পর্ক সে দেখেও দেখেনি। কালচে নীল পাতলুন আর কালচে নীল কামিজ পরে কাজে যেত বাদল। ডিউটির সময়ের হেরফের হত তার। কাজের সময় ত্রিশ দিন বাঁধা ছিল না। প্রায়ই বদলাত। কখনো ফিরত বেলা তিনটেয়। কখনো রাত বারোটা। কি বা দিন, কি বা রাতদুপুর, ভাত নিয়ে বসে থাকত স্মৃতি। যেন ওকে ভাত বেড়ে দিয়ে সামনে বসে থাকবে বলে সকাল হত স্মৃতির। দেখেছে বইকি, অনেক দেখেছে মাধবের মা।

কিন্তু তাই বলে, জামাই মারা যাবার পরও বিধবা মেয়ের···ওঃ।

মাধবের মার মনে হল ঠাকুরঘরের চার দেওয়াল হামা দেওয়ার মত গুঁড়ি মেরে তার দিকে থাবায় থাবায় এগিয়ে আসছে। সে দমচাপা হয়ে যাবে।

পাশ ফেরার সময় মাধবের মার কনুই লাগল মেয়ের বুকে। স্মৃতি ৩১ পার করে ৩২ পূর্ণ করতে চলেছে। এত অভাব. এত হেনস্থা, চার বছর বিধবা হয়েছে, ছ' বছরের ছেলের মা, তবু শরীরের আঁট আর জোয়ার দেখ।

মাধবের বৈঠকখানাঘরের পিছনে বিশাল তেঁতুল গাছের ডাল থেকে, থেকে থেকে কোন রাতচরা পাখির তীক্ষ্ণ গলা ডেকে উঠল কয়েকবার।

মা আর মেয়ে দুজনেই জানে যে দুজনই জেগে আছে।

—ভাবিস না, ওকে আমি চিনতে পারিনি, মা বলল।

—না চেনার কি আছে।

—ও তোর ভাগ্নে হয় না?

স্মৃতি চুপ করে থাকল।

—ও তোর স্বামীর বোনের ছেলে।

—মাসতুতো বোনের।

—বোন তো। তোর থেকে বয়সেও ছোট।

—আমরা সে রকম ভাবি না।

—তোরা ভাবিস না তো কি? সমাজ নেই? মানুষজনের চোখ কান নেই?

—চুপ কর।

—চুপ করব কেন, তোর ভয়ে? আবার সন্নেসী সেজেছে—

—ও সাজেনি।
—না সাজবে কেন! ও বেম্ভোচারী ঋষি। গলায় দড়ি দে তুই।
—কেন দোব? আমি কি গরু না ছাগল, যে গলায় দড়ি থাকবে! আমি মানুষ। গলায় দড়ি দেবার জন্যে মানুষ জন্মায় নাকি?
—এত কথা শিখলি কোথায়?
—নিজের জীবন থেকেই সবাই সব কিছু শেখে মা।
এই বলে স্মৃতি উঠে বসল। তারপর হঠাৎ মার কপালে হাত দিয়ে বলল, ইস্। তোমার কপাল এত গরম কেন মা?
স্মৃতির হাত চেপে ধরে মা বলল, বাদলা কেন এখানে এল?
—আমি ওকে আসতে বলেছি।
—ও নিজে আসেনি?
—না।
—তুই আসতে বলেছিস?
—হ্যাঁ।
—কেন?
—আমি যেখানে যাব ও সেখানে যাবে।
—তোর মুখে বাধছে না এসব বলতে! কি ঘেন্না!
খুব অলস ভঙ্গীতে আবার মার পাশে মেঝেয় পাতলা বিছানায় শুয়ে পড়তে পড়তে হেঁয়ালি করার মত স্মৃতি বলল, ও সাপের বিষদাঁত ভাঙতে পারে। সাপ খেলাতে পারে। আসবে না?
সে সব জানে মাধবমাস্টারের মা। বিয়ের সময় স্মৃতি চব্বিশ। জামাই আটচল্লিশ। তফাত অনেক। কিন্তু জামাই মানুষটি ছিল চমৎকার। দয়া, মায়া, মমতা—যে জানে, সে জানে। শুধামডির স্টেশনমাস্টার ছিল জামাই। কত বড় চাকরি। কত মান। মাস গেলে বাঁধা মাইনে। চাকরি ফুরোলেও কত পাওনা! সিঁদুর উঠল স্মৃতির সিঁথিতে। কত নিশ্চিন্তি। যেন ভিতর জুড়িয়েছিল স্মৃতির মার। নিশ্চিন্তিই তো খোঁজে মানুষ। হারে আমার নিশ্চিন্তির কপাল।
দয়া আর মায়ার মন ছিল বলেই বাপমা-মরা ভাগ্নেকে কাছে রেখেছিল মানুষটা। কিন্তু মামা তাকে মানুষ করতে পারেনি। বহুরকম বেপরোয়া হয়। বাদল একরকম অনাসৃষ্টি। সতেরো বছর বয়সে সাপ ধরা, বিষ কামানো,

গাছ গাছড়া, শিকড় বাকড় শিখেছিল। মামাকে বলেছিল সাপ পুষবে। বিষদাঁত ভাঙবে। সেটাই ব্যবসা। আসানসোলে ট্রাফিক জিমনাসিয়ামের দশ দিনের মেলায়, গায়ে সাপের ছোবল খাওয়ার খেলা দেখিবে। পিলপিল করে আসবে লোক। মেলায় মেলায় ঘুরবে। ওপরওয়ালাদের হাতে পায়ে ধরে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তার মামা তাকে রেল কোম্পানিতে—

—ও কে হয় তোর ?

—সব।

—সব মানে ?

নীরবতা। অখণ্ড নীরবতা। ঝিঁ ঝিঁ। একটানা ঝিঁ ঝিঁ। স্মৃতির চুল বাঁধার সময় চুলের ওপর চিরুনির আঁচড়ে এক ধরনের শব্দ পায়, তার মা। এখন অন্ধকারের গায়ে কেউ যেন তেমন চিরুনি চালাচ্ছে।

—একটা কথা বলবি ?

—কি ?

—তোর ছেলেটা কার ? বাদলার ?

—ওর বাবার।

—কে সে ?

এক ধরনের তাৎক্ষণিক উত্তেজনায় এক হাতে মাকে জড়িয়ে মার বুকে মুখ রাখল স্মৃতি। পাতলা, সামান্য গরম জল, স্মৃতির চোখ থেকে নেমে ওর মার বুক খানিকটা ভিজিয়ে দিল। মেয়েটার জন্যে দুঃখে ওর মারও কান্না পেতে লাগল।

—বললি না যে।

—আমাকে যে মন্ত্র পড়ে বিয়ে করেছিল, তার।

—তবু স্বামীকে লুকিয়ে পরপুরুষকে দেহ দিলি তুই ? এখন কাঁদছিস—

—সে জন্যে কাঁদিনি।

—তাহলে কাঁদছিস কেন ?

—কাঁদছি নিজের জন্যে। তোমার জন্যে।

—এত বড় অধম্মো করলি, তবু তোর মনে কোন আক্ষেপ নেই ?

—ধম্মো আসলে কি মা ? ধম্মের তুমি কি বোঝ ?

—চুপ কর তুই। আঁতুড়ঘরে নুন দিয়ে মারতে হত তোকে—

—মারলেই পারতে। এত দুঃখ পেতে হত না তাহলে—

—তোর সব দুঃখ তো বানানো।

—তুমি নিজে তো কম দুঃখ পাওনি মা।

—সে আর কে বোঝে? কপাল আমার।

—তুমি কি নিজে সেটা বোঝ। এত দুঃখ পেলে, তবু তোমার আসল দুঃখ কি, তুমি নিজেই তা বুঝতে পারলে না। আর তাই, কত পাপ করলে তুমি—

—তুই নিজে পাপী, তাই দুনিয়াশুদ্ধ পাপ দেখছিস। আমার কিসের পাপ রে?

কিছুটা কঠিন ও শীতল গলায় ছেড়ে ছেড়ে স্মৃতি বলল, মা হয়ে নিজের পেটের ছেলের জন্যে, আর একজনের পেটের ছেলেকে একটু একটু করে মেরেছ, খুন করেছ তুমি।

—কাকে?

—পরাণদাকে।

—আমি?

—হ্যাঁ, তুমি। তারপর দাদা। তুমিই গোড়া।

মা সহসা কিছু বলতে পারল না।

—এ পাপপুরী।

—থাকিস কেন তবে পাপপুরীতে। কেন আছিস?

—দাদার বাড়িতে এমনি থাকি না মা। টাকা দি।

—দিস না টাকা।

—কেন আমায় মুখ করছ তুমি?

—তোর বড় টাকার দেমাক

—তোমার জন্যেও টাকা দি। দাদা নেয়—

—আমার মরণ হোক ঠাকুর।

—যা সত্য, সেটা মানো মা। তোমার নিজের আসল আর গোটা দুঃখ তাহলে তুমি নিজে দেখতে পাবে। পাপও। মানো। মানলেই সব ভয় চলে যাবে। ভেতরে আলো হয়ে যাবে। কবে শুদ্ধি হবে, কবে গঙ্গা নাইবে মা? এইসব বলতে বলতে কি যে হল স্মৃতির, সে আবেগে আবার তার মার বুকে মাথা রেখে নিজেই ফুঁপিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

মার মনে হল, মেয়ের মুখের ভাষা সে একটুও বোঝে না। মেয়ের কান্নাও

বোঝে না। মেয়ের কিছুই বোঝে না তার মা। এই মেয়ে তারই মেয়ে, তবু মা তাকে চেনে না, জানে না। কে এ? এ মেয়েটা কে?
হঠাৎ মাধবমাস্টারের মার মনে হল, মাঝরাতে হাঁসের খাঁচার কাছে শেয়াল এসেছে আজও।
শব্দ না করে ঘরের ছিটকিনি খুলে আজও মধ্যরাত্রে নিঃশব্দ ঘরের বাইরে এল হৃদয়পুরুতের বিধবা। আশ্চর্য। আজ কোথাও শেয়ালের ছায়াও নেই। শেয়াল এসে থাকলে নালির মুখে গলা ঢুকিয়ে পালাবার মুখে ঠিক দেখতে পেত বিধবা।
হাঁসগুলি নিদ্রিত।
ব্রাহ্মণের বাড়ি মুরগি পোষা হয় না।

৭

॥ পরাণ ও বাকু ॥

গত চার মাস পরাণের কাছে শোয় বাকু।
একটা বাচ্চার ওপর যে মানুষের কেমন মায়া পড়ে যায়, তা পরাণঠাকুর কোনদিন বুঝত না। এখন বোঝে। স্মৃতি তার ছেলেকে নিয়ে আগেও এসেছে। গেছে। এখন তো টানা তিন বছর এখানেই আছে। কিন্তু স্মৃতির ছেলে বিবেক, যার ডাক নাম বাকু, তার ওপর পরাণের ঠিক মায়া পড়েনি আগে, যেমনটি গত চার মাসে পড়েছে।
বাচ্চা বাকুর ছোট্ট শরীর। পাশে শোয়। ঘুমের ঘোরে কচি কচি হাতে গলা জড়িয়ে ধরে। আগে বাকু তার মা দিদিমার কাছে ঠাকুরঘরে মেঝেয় শুত। কিন্তু ঘরটা বড় ছোট। বাকু বড় হচ্ছে। তিনজনে ছোট্ট মেঝেয় কুলোয় না। পরাণের কাছে, তাই। প্রথম প্রথম কদিন পরাণের অস্বস্তি হত। আজকাল ওরকম করে গলা জড়িয়ে না শুলেই খালি খালি লাগে পরাণের। বাচ্চার গায়ে এক ধরনের গন্ধ আছে। যা কোনদিন পরাণ জানত না। এখন জানে।

রাত্রে শেষ বিড়িতে সুখটান দিয়ে পাশে শুলে বাকু বলে, গন্ধ। বিচ্ছিরি। এখন আর তাই পরাণ রাত্রে ভাত খেয়েই বিড়ি ধরায় না। বাকুকে গল্প বলে। গল্প শুনতে শুনতে বাকু ঘুমিয়ে গেলে, ঘর থেকে উঠে এসে বাইরে দুহাতের মাটির দাওয়ায় উবু হয়ে বসে বিড়ি ধরায় পরাণ: যে পরাণের আর কোনভাবেই বদলাবার সম্ভাবনা নেই, যে পরাণ শুধু ছাঁচে ঢালা হয়ে গেছে তাই নয়, সে ছাঁচটাও এত পুরোনো আর ভোঁতা হয়ে গেছে যে তাতে আর কোন কিছুতেই নতুন করে জেল্লা বা যে কোন শান্ আনার কোন সম্ভাবনাই নেই, সেই পরাণও একটু একটু করে বদলাচ্ছে বাচ্চা বাকুর জন্য। কোথাও কোথাও তার ব্যবহারও বদল হচ্ছে।

এই বছর গোটা শীতকালটা, পরাণ তার শোবার ঘরে মেঝেয় রোজ তিন প্রস্থ করে পুরু খড় বিছিয়েছে। খড়ের ওপর চট। তার ওপর ছেঁড়া শতরঞ্চি। রীতিমত বাবু বিছানা পরাণের পক্ষে। কত শীত পার করেছে পরাণ। খড়ের এমন গদি সে কখন করেনি। কিন্তু এবারের কথা আলাদা। বাচ্চা বাকু শোয় যে তার কাছে।

একবার খড় নিয়ে এলেই তো সারা শীত চলে না। খড় সরে যায়। বিশেষ পরাণের শোবার ঘর আবার মাধবের ছেলের কয়লা বিক্রির অফিসও। মাধবের দ্বিতীয় পক্ষের ছোট ছেলে চিরদীপ এই ঘরে বসে কয়লার দোকান দেখে। তার বন্ধুরা আসে। বেঁধে রাখা খড়ের গদিতে কোন কোন দিন আড্ডা হয়। খড় সরে যায়। আবার আনতে হয় তাই।

আবার খড় আনতে গেলে মাধবমাস্টারের দু বৌ তেড়ে এল পরাণকে।

—দুটো মোষ একমাসে যত বিচুলি খায়, তোমার রোজ অত আঁটি লাগবে নাকি ঠাকুরপো?

এরা দুজনেই পরাণকে ঠাকুরপো বলে। যেন পরাণ সত্যিই ওদের স্বামীর সহোদর, শ্বশুরের আর এক পুত্রসন্তান।

—রোজ তো নিই না বৌদি।

—রোজ ছাড়া আবার কি!

পরাণ বলতে যাচ্ছিল, বাকু শোয় যে। কিন্তু সে কিছু বলল না। দু বৌর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল। ওরা দুজনেই চারটি করে ছেলেমেয়ের মা। তবু মায়ের মন কই তোমাদের! দুটো গাই তোমরা! একসময় বছর বিয়োনি ছিলে। এখন বাঁজা।

এসব কিছুই বলল না পরাণ। পরাণের এসব কথা যোগায় না। যোগালও না। কিন্তু সে খড় নেবার জন্ত হাত ঠিকই বাড়াল।

—তবু নিচ্ছে। আস্পদ্দা তো কম নয়, এক বৌ বলল।

—পিরিত লো পিরিত। আঁতের মানুষ, তার ছেলে, বুঝলি না? তুই যেন কি লা—

মাধবমাস্টারের দু বৌ শিবানী আর সাধনা, নিজেদের চোখে চোখে চেয়ে মুখ টিপে হাসছে। মেয়েদের, বিশেষ বিবাহিত মেয়েদের, যারা যৌন সম্পর্কের সবটাই জানে এবং সেই সম্পর্কের পৌনঃ-পুনিকতায় ফতুর, তবু ক্লান্তি-হীন, অবস্থা বিশেষে তাদের নিজেদের মধ্যে চোখে চোখে ঠারেঠোরে এক ধরনের হাসি আছে, যে হাসির যৌন ইঙ্গিতের কোন তুলনীয় উপমা নেই। আর্থিক অবস্থা ও মানসিক স্তর ভেদে, এই হাসির চেহারা এক একটা মুখে এক এক রকম। কিন্তু জাতে এক। সাধনা ও শিবানী নামে দুই পৃথুলাঙ্গী গ্রাম্য রমণীর মুখে সে হাসি তখন খোস ফোড়ার মত ডুমো ডুমো হয়ে ফুটেছিল।

ইতিমধ্যে আর এক বৌ পরাণের হাত থেকে খড় কেড়ে নেওয়ার জন্য টানছে। পরাণ দেয়নি। বলেছিল, বাকুর ঠাণ্ডা লাগবে।

এই বলে খড় নিয়ে পরাণ সেখান থেকে চলে গিয়েছিল।

এ অন্য পরাণ। মানুষটার পুরোনো আর ভোঁতা ছাঁচের থেকে আলাদা। শুধু বাকুর জন্য। এখন পর্যন্ত মাত্র এই একবারই।

৮

॥ পরাণের পূর্বকথা ॥

পরাণ যখন শুধারে গ্রামে, ও এ বাড়িতে প্রথম এল তখন তার বয়স চোদ্দ। সে আসবার সাত আট মাস আগে মাধব ও স্মৃতির বাবা হৃদয়পুরুত মারা গেছে।

সে ত্রিশ বছর আগের কথা। তখনও দুর্গাপুরে নতুন কারখানা তৈরী হচ্ছে সার সার। তারই একটায় কাজ করত মাধব। নিতান্ত গণ্ডগ্রাম থেকে হলেও তার মার চেষ্টায় ম্যাট্রিক পাশ করেছিল মাধব। পাশ করা তো চাকরি করার জন্যই। কানে আর শাঁখে ফুঁ, ঘণ্টা-নাড়া পুরুতঠাকুরের জীবন ছেলের জন্য চায়নি মাধবের মা।

কিন্তু স্বামীর হঠাৎ মরে যাওয়াটা তার হিসেবের মধ্যে ছিল না। স্বামীর জন্যে শোকের অবসরও পায়নি সে। মাধবের চাকরি রাখতে হলে পুজো হাত ছাড়া হয়। দেবতা ধরে থাকতে হলে, চাকরি করা যায় না। দুটোই চাই। উপায়?

শুলে কাঁটা। বসলে কাঁটা। উঠলে কাঁটা।

পাশাপাশি কাছাকাছি গ্রাম, দূরের গ্রাম. বর্ধমান শহর থেকে ব্রাহ্মণের ছেলে এনে 'বাবা বাছা' করল, কপালে চুমু খেল মাধবের মা। একের পর এক কত জনকে আনল। কেউ থাকল না। কেউ রাত পোহালে, কেউ দশ দিন পার হতেই চলে গেল। এক মাস থেকে, মাসভর পাওনা-দক্ষিণা খুঁটে বেঁধে, 'কাল আসছি', বলে একজন চলে গেল। আশা জাগিয়ে সেই যে গেল, আর এমুখো হল না।

মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটেছে মাধবের মা, একটা ছেলের খোঁজে। যে থাকবে। চারদিকে তখন কত কথা শুরু হয়েছে। হৃদয়পুরুত দেহরক্ষার পর বারবার এইভাবে পুরোহিত বদল হতে থাকায়, চারদিকে কথা তো উঠবেই।

এমনি করে কি দেবতার পুজো হয় ? মাধবকে ডাকো হে বামুনবৌ। পুজো ছাড়ো না হলে। বাবা বাগেশ্বরকে নিয়ে খেলা নয়।
চারদিকে জিব লকলক করছে। হিংসে। তার মাধব পাশ দিয়েছে, তার মাধব চাকরি করে, এ সইছে না যমদের। যম সব। মাঝেমাঝেই অফিস কামাই করে শুধারেত্তে এসে পুজো সামলাতে হচ্ছে মাধবকে।
দুর্গাপুরের চাকরির মুখে নুড়ো জ্বেলে, সে সব খুইয়ে মাধব যদি শুধারেত্তে এসে পাকাপোক্ত হয়ে বসে তাহলেই হাড় ঠাণ্ডা হয় যমেদের। কেন ? বাবার পুজো কি ঠিক ঠিক হচ্ছে না ? কোথাও একদিনও কোন ত্রুটি হয়েছে কোন পুজোর ? কোন মন্দিরে ? কোন যজমানের বাড়িতে ? ঠিক বটে, বাগেশ্বর ও আরও ক'টা মন্দিরে পুজো, কোলের মেয়ে, এসব সামলে যজমানদের বাড়িতে নিত্যপুজোয় যেতে তার হয়তো রোজই দেরি হয়েছে। কিন্তু গেছে তো ! কোন দেবতাকেই তো অবহেলা করছে না মাধবের মা। তবে ?
তবু শ্যাম আর কুল কিছুতেই থাকছে না। দুদিকেই টান পড়ছে। সামাল সামাল অবস্থা।
কে সামলাবে ? বড়ই অসহায় আর বিপন্ন তখন মাধবের মা। মাধবও। কঠিন সঙ্কট। এই সময় অগতির গতি বাবা বাগেশ্বর মুখ তুলে চাইলেন।
পরাণ এসে গেল।
কে পরাণ ?
হৃদয়পুরুতের আত্মীয় ? হৃদয়পুরুতের আত্মীয়তার পরিধিতে ডালপালার ডালপালা ধরে আত্মীয়তা। কেউ মনে রাখেনি। সেই আত্মীয়তাকে আবিষ্কার করল মাধবের মা। থাকে পুরুলিয়া জেলায়। থানা রঘুনাথপুর। গ্রাম আগইবাড়ি। সদ্য স্বাধীনতার পর সেই সময় যখন অনেক নতুন কারখানা হচ্ছে দুর্গাপুরে, মিহিজামে হচ্ছে রেল এনজিন তৈরীর শহর চিত্তরঞ্জন, আজও যেমন, তখনও দাউ দাউ করে জ্বলছিল খরার পুরুলিয়া। ঘরে ঘরে অভাব। বালক পরাণ তখন সদ্য বড় হতে চলেছে বলে তার গলার স্বর ভাঙা। হাতের কবজিতে, থ্যাবড়া পায়ে, অখ্যাত আগইবাড়ির তুচ্ছ পিতৃহীন বালক তখন বড় হতে চলেছে।
পুরুলিয়া থেকে নিজে সঙ্গে করে পরাণকে নিয়ে এল মাধবের মা।
তার গায়ে হাত বোলাল। চুমু খেল কপালে। বলল, তুই আমার সন্তান।

বাগেশ্বরের মন্দিরের দেবত্র, ঘরসংসার, সব কিছুরই ভাগ পাবি তুই। ও তোর নিজের জিনিস। চল বাবা, আমার কাছে থাকবি।

ছোটমার হাত ধরে—'ছোটমা' সম্বোধন মাধবের মা-ই শিখিয়েছেন—আগইবাড়ি থেকে আসার সময় গ্রামের সীমানায় দাঁড়িয়ে, একবার পিছন ফিরে চেয়ে খুব কান্না পেয়েছিল পরাণের। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিল পরাণ। ওখানে ঘরে ঘরে অভাব। দুবেলা দুমুঠো অন্ন নেই। তবু বুক ঠেলে কান্না আসছিল তার। এক ছুটে আবার তার ফিরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল সেখানেই।

মাধবের মা শক্ত করে তার হাত ধরেছিল। বলেছিল, কাঁদিস না বাবা। তোর মন চাইলেই বাড়ি আসবি। যখন ইচ্ছে। তুই বড় হবি, জোয়ান হবি। বাবা বাগেশ্বরের আশীর্বাদে কত সোনাদানা আনবি তুই।

এইসব বলতে বলতে কাঁদছিল মাধবমাস্টারের মাও। সে কান্নায় কোন ছলনা বা অভিনয় ছিল না।

এ বাড়িতে আসার ক'দিন পর থেকেই পরাণ শুনেছে, স্মৃতি তার বৌ হবে একদিন। কথাটা যে কেউ এসে তাকে বলেছে, তা নয়। তবু শুনেছে।

—এক কাজে দু কাজ সারলে নাকি মাধবের মা? একেবারে জামাই নিয়ে এলে?

—ঘরজামাই বল্।

স্মৃতির মা হেসে বলেছে, হ্যাঁ ভাই।

তখন স্মৃতি কাঁথায় শোয়। স্মৃতিকে কত কোলে করেছে পরাণ। কুট্টি স্মৃতির নাকের কত পোঁটা লেগেছে পরাণের গায়ে। স্মৃতি ওর চোখের সামনে, হাতের ওপর বড় হয়েছে। ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়া পরাণ অ-আ শিখিয়েছে স্মৃতিকে। কথামালাও। পুজোর বাতাসা, এলাচদানা দিয়েছে। চোত গাজনে ফলের দিন পাওয়া, গোটা তরমুজ দিয়েছে স্মৃতিকে। তরমুজ খেতে স্মৃতি খুব ভালবাসে।

একটু একটু করে বড় হয়েছে স্মৃতি। আর গল্পটা চালুই থেকেছে। পরাণের বৌ হবে স্মৃতি। অনেকেই পরাণকে জামাই বলে ডাকত। কেউ আপত্তি

করত না। মাধবমাস্টারের মা নয়। মাধবও না। বোকা পরাণ বিশ্বাস করত এসব।

স্মৃতি যে বছর বারোতে পা দিল, সেবার বাড়ি এসে 'জামাই আছ নাকি' বলে পরাণের খোঁজ করায় প্রথম মুখ ঝামটা দিল মাধবের মা।

তার পরের বছর থেকে স্মৃতিকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নিয়ে আসা হল পরাণের কাছ থেকে। স্মৃতি তখন বারো পূর্ণ। তার শরীরে লক্ষণ দেখা দিয়েছে। পরাণ ছাব্বিশ। পৃথিবীর কত প্রান্তরে নির্জন দূর্বা শুধু অপেক্ষা করে থাকে, কত ফুল ফোটে, কত পাখি গায়, তার সব কিছু কি জানে মানুষ? জানে না। পরাণের বুকের দূর্ব্বো ঘাস, ফোটা ফুল, আর পাখির গলার কোন হদিশ রাখল না কেউ।

এরপর সেই ঘটনা ঘটল আরও কয়েক বছর পর। স্মৃতি তখন আঠারো। পরাণ বত্রিশ।

সেবার দুর্গাপুজোর নির্ঘণ্ট ছিল অদ্ভুত। অষ্টমীর পুজো শেষ হয়ে সন্ধি পুজো শেষ হতে ভোর। তার একটু পরেই নবমী পুজোর শুরু।

অষ্টমীর দিন দুপুরে সামান্য ফল খেয়েছিল পরাণ। তারপর খ্যানের পুজো শেষ করে রাত পোহালে আবার স্নান করে নবমীর পুজোয় বসেছিল সে। পুজোর প্রধান পুরোহিত মাধবমাস্টার হলেও, মাধব নিরম্বু থাকত না। সে ফল, মিষ্টি, শরবত এবং অবশ্যই চা খেত। মাধবের মা-ই তাকে দিতেন এই সব। পরাণকে নয়। মাধবের মা বলত, পুজোপাঠে পরাণই তো আসল। পরাণ নিরম্বু থাকত। আজও থাকে। পুজো শেষ না হলে মুখে জল দেয় না।

পরিশ্রম, টানা উপবাস ইত্যাদিতে শরীরে এক ধরনের বিপর্যয় হয়। নবমী পুজোর শেষে তার গা বমি বমি লাগছিল। গত দেড় দিনে বারবার থামচানো ও ককিয়ে ওঠা প্রচণ্ড ক্ষুধা, নবমী পুজো শেষে মন্দিরের ভিজে ন্যাতার মত তার পেটে গুটিয়ে শুয়েছিল। একটু দূরে শ্বেতপাথরের থালা থেকে তুলে ফল মিষ্টি, আর শ্বেতপাথরের গ্লাশে চুমুক দিয়ে শরবত খাচ্ছিল মাধব। ব্রাহ্মণের প্রসাদের জন্য এই সব নিবেদন করে, ব্রাহ্মণ সেবার পুণ্যি করছিলেন রায়গিন্নী।

রায়বাড়ির বড় তরফের গিন্নী থাকেন কলকাতায়। দুর্গাপুজোর ক'দিন থাকেন শ্বশুরের ভিটেয়। তিনি যে বাড়ির বড় বৌ। শ্বেতপাথরের থালা

বাসন, আর যা কিছু, সবই তিনি সঙ্গে আনেন। তাঁর সঙ্গে আসে। তাঁর সঙ্গে যায়। সারা বছর ভিটেয় তালা। যখন আসেন, ছই দেওয়া তিনটে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে স্টেশনে। ওনার ফেরার ট্রেন ছাড়লে তিনটে খালি গাড়ি, মাঠে মাঠে শুধারে মুখে ফেরে।

মাধব খাচ্ছে। ব্রাহ্মণ সেবা। হঠাৎ ভীষণ ক্রোধ হল পরাণের। সে পা বাড়াল।

—ওকি, ছোট্ ঠাকুর, কই যাও। ফল সন্দেশ খাবে না? রায়গিন্নী ডাকল। পরাণ দাঁড়াল না।

বাড়ি এসে আর দু'চোখের পাতা এক করে রাখতে পারছিল না পরাণ। দুটো বাতাসা আর এক ঘটি জল খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন ঘুম ভাঙল, তখন স্মৃতি তার খুব কাছে দাঁড়িয়ে গায়ের ওপর হাত রেখে ডাকছে, 'পরাণ দা। ও পরাণদা।'

তখন ওই বাড়িতে আঠারো বছর থাকা হয়েছে পরাণের। থাকতে থাকতে রক্ত ততদিনে অনেকটাই পানসে, মরা বাসী মাছের রক্তের মত। তবু সেই ভয়ঙ্কর উপবাসক্ষত ক্লান্তির ঘনঘোর ঘুম থেকে উঠে, ডুরে শাড়ি পরনে স্মৃতিকে দেখে লহমায় হাওয়া লাফিয়ে উঠল পরাণের বুকের মধ্যে। সে নিজেই ঠিক বোঝেনি, কখন সে স্মৃতির হাত ধরে তাকে কাছে আনার জন্য টান দিয়েছে। স্মৃতি ঝটকা দিয়ে হাত সরিয়ে নেয়নি। কোন কটু কথা বলেনি। শান্ত, কিন্তু স্পষ্ট গলায় বলেছিল, ছিঃ। বড় মেয়েদের গায়ে হাত দেয় না।

পরাণ তার হাত ছেড়ে দিয়েছিল।

স্মৃতি বলেছিল, খাবে এসো।

রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে সেদিনও ভরপেট ভাত খেয়েছিল পরাণ। সম্ভবত আগের প্রায় দেড়দিন সম্পূর্ণ উপবাসী থাকায়, ভরপেট খাওয়া তার সহ্য হয়নি। সেদিন সন্ধ্যায় সে প্রচুর বমি করেছিল। ওই পর্যন্তই। জ্বরজ্বালা তার বড় একটা হয় না।

আজও না।

৯

।। বাঁশি ।।

অথচ এই স্মৃতি, তার পরের বছরেই—

সেটাই স্মৃতির প্রথম প্রেম। কুসুমে কীট। কুমারী স্তনে প্রথম উল্কি। কিন্তু খেলার নিয়ম মানেনি সেই প্রেমিক। সেই প্রথম ভিতরে ভিতরে ভয়াবহ জ্বর স্মৃতির। দগ্ধ চন্দন হয়ে যাওয়া। দীর্ঘদিন ফেরিঘাটে সংগোপন, একঠায় দাঁড়িয়ে থাকা। অনেক দূরে অপস্রিয়মান নৌকার গলুইয়ে, হারিয়ে যাওয়া এক আবছা লণ্ঠনের দিকে চেয়ে থাকা। যে লণ্ঠন আর কোনদিন আলোর গয়না ফেলে কাছে আসেনি।

পরের বছর বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল, মাধবমাস্টারের দুর্গাপুরের বন্ধুরা। একদা মাধব তাদের সঙ্গে কাজ করত দুর্গাপুরে। একদা, কারণ তার কিছুদিন আগেই মাধব তার দু'নম্বর বিয়ের কারণে দুর্গাপুরের চাকরিটা ছেড়েছে। ছাড়তেই হয়েছে তাকে। প্রথম স্ত্রী থাকতে আবার বিয়ে, প্রেমজ হলেও অনেকেই অনুমোদন তো করেই নি, তাছাড়া অনেক ইত্যাদি। নিট ফল, মাধবের চাকরিত্যাগ ও শুখারেতে প্রত্যাগমন। তবু পুরনো কিছু সহ-কর্মীদের সঙ্গে তখনো যোগাযোগের ও নতুন কুটুম্বিতার টাটকা টানে এসেছিল কয়েকজন। তাদের মধ্যে একজন ছিল সে দুর্গাপুরের নয়। দুর্গাপুর থেকে আসা দলের একজনের সে ছোটশালাবাবু। পরাণের সমবয়সী। কিংবা কিছু কমই হবে। হয়ত তিরিশ কিংবা আঠাশ। থাকেন কলকাতায়।

উনি নাকি দারুণ কোন চাকরি করেন এই বয়সেই। কি চাকরি, কেমন দারুণ, তা কে জানে! প্রচার যার পক্ষে যায়, সত্য মিথ্যার ডামাডোলে সেই লোকটার বানানো চেহারাটা কেবলই পেল্লায় হতে থাকে। শুখারেতে আসা এই শালাবাবুর ভাই হয়েছিল। ঝকঝকে হালের জামা প্যাণ্ট পরে

মাঠে, মাটির দাওয়ায়, যেখানেসেখানে উনি বসে যান। প্যান্টের পিছনে ধুলো লাগলে বয়েই গেল তাঁর।

কলকাতায় বসবাস, জেল্লাদার চাকরি, এসবই সব কথা নয় তাঁর সম্পর্কে। কথা হল, তিনি একজন কবি।

কবি তো কি? কবি বললেই, কবি হয় নাকি? যদি হয়ও, তাতে কি মহাভারতের গল্প একটু অন্যরকম হয়ে গেল? কিন্তু তখনই তাঁর দুটি বই বার হয়ে গেছে। শুধারে আসার সময় তিনি নিজের দুটি বই সঙ্গে করে এনেছিলেন। এবং আসার কয়েকঘণ্টা পরেই শুধারে গ্রামের সবুজসমিতির সম্পাদকের হাতে বই দুটি নিজ স্বাক্ষরসহ তুলে দিয়েছেন, তাদের লাইব্রেরির জন্য! তাতেই মাত। একজন কবি এসেছেন আমাদের গ্রামে। একজন কবি। ছাপানো বই, মলাটের ওপর জ্বলজ্বলে নাম, যেন এক দুর্লভ পাসপোর্ট। আসার পরে পরই যেন সর্বত্র অবারিত দ্বার এই মানুষটার। যুবকেরা তাকে ঘিরে ঘন হয়ে আসে। একটু কম বয়সীরা দূর থেকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকায়। তিনি যে পথ দিয়ে যান, তার কাছাকাছি জানালায় এসে দাঁড়ায় গ্রামের মেয়েরা। কৌতূহলে দূর থেকে দেখে নেয়। তারা কেউ কোনদিন কবি দেখেনি। প্রচার আর প্রচারের সঙ্গে কিছু চমক যোগ হলে এমনি হয়। গ্রামে, শহরে, সর্বত্র।

যারা সঙ্গে এসেছে, তারাও বলে, ও একজন কবি। ও কি আমাদের মত!

—ও কি ভাবে না ভাবে, তার কোন ঠিকঠিকানা মাথামুণ্ডু আছে নাকি!

—ওর ব্যাপারই আলাদা।

—ও যে কি দেখে কি বোঝে, তা ও-ই জানে

—আমরা দেখি গাছ, ও সেটাকে বলে আত্মপ্রকাশ। আমরা দেখি মেঘ, ও তাকেই বলে সম্ভাবনা। আমরা দেখি হাঁস, হংস। ও তাকেই বলে স্বাধীনতা। আরে, ওর কথা ছাড়ো।

—কেন হাঁসের মাংস কি আমি খাই না? খুবই খাই, বলে ওঠেন সেই শালাবাবু নিজেই। বলেই হাসি, হাঃ হাঃ

সমবেত হাস্যরোল, হো হো—

শুধারেতে আসা মাত্রই যেন একটা রংমশালের মত আলো মেলে দিয়েছে ও। কিংবা যেন এক বাজপাখি। যে তার শক্ত ও বিশাল ডানা গুটিয়ে নিতান্ত নিরীহ আবির্ভাবের মত উপস্থিত।

প্রথম দর্শনেই সেই কবি সোজা তাকিয়ে ছিল স্মৃতির দিকে। অপলক। বেশ কিছুক্ষণ। চোখ নামাতেই হয়েছিল স্মৃতিকে। কাছেই ছিল মাধব। ছিল মা। কবি বলেছিল, সুন্দর।

সদ্য আগত এক যুবকের মুখে বাড়ির কুমারী কন্যা সম্পর্কে এ হেন অসংকোচ উচ্চারণ অস্বস্তিকর। মাধব ও তার মার দিকে উচ্ছ্বসিত আবার বলল, আপনার বোন সুন্দর। আপনার মেয়ের কথা বলছি। সুন্দর।

মাধব এবং তার মা এখনও বলার কিছু পেল না।

—কি চমৎকার ফিগার।

ফিগার কি স্মৃতি জানে না। শাড়রি আঁচল, আঙুলের খুঁটে সে আরো টেনে এনেছিল গায়ের ওপর।

—আমার তো এর হাতের আঙুল দেখেই ফুরোচ্ছে না। একেবারে লিজ টেলরের মত।

মাধবও বুঝতে পারল না লিজ টেলর কি।

—তুমি মডেলিং করলে হৈ হৈ লেগে যাবে হে, কবি বলল স্মৃতিকে। মডেলিং কি, তার বিন্দুবিসর্গ ধারণা নেই স্মৃতি ও তার মার। শব্দটা, মাধব কালে ভদ্রে শুনে থাকবে।

—এই মেয়ের বিয়ে দিতে পারলে, তবেই নিশ্চিন্তি বাবা, মাধবের মা বলল।

—বিয়ের আবার ভাবনা কি?

—আমার কালো মেয়ে।

—কালো? ফুঃ

—কালো নয়?

—একে কালো বলছেন? বলুন এনিমিক নয়।

এর ভাষাই বোঝে না স্মৃতি ও তার মা। অভিধান হাতড়ে শব্দার্থ খুঁজে নেবার সংগতি মাধবের আছে। শব্দটা মনে থাকলে পরে দেখা যাবে।

—আমার মেয়ে তো কালোই বাবা।

—আপনি কখনো পূর্ণিমার রাতে আধমজা পুকুরে জল ঘেঁষা কলমির পানা দেখেছেন?

—হ্যাঁ

—ভালো করে বুঝুন। চাঁদটার কথা বলছি না কিন্তু। বুঝেছেন?

—বুঝেছি।

—জলে পড়া চাঁদের আলোর কথাও বলছি না কিন্তু।

—তা হলে ?

—জলে ভাসা চাঁদ লাগা কলমির পানার কথা বলছি।

—ও

—আপনার মেয়ের গায়ের রং সেই রকম। আ বিউটি—

স্মৃতির চোখে এক চোরা ঘোর নেমেছে। এক ঘনিষ্ঠ তন্ময়তায় কবির দিকে চেয়েছিল স্মৃতি। সে নিজেই তা জানে না। কবির চুলে কোঁকড়া আভাস, কিছুটা টানা চোখ, ও সব মিলিয়ে তার চেহারার শান শুধারে গ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে একেবারেই আলাদা। দ্বিতীয় কেন, তৃতীয়বারও ফিরে দেখা চলতে পারে— কলকাতায় নয়, শুধারেতে। স্মৃতি আশ্চর্য স্থির আর স্থাণু হয়ে গিয়েছিল। সেই কবির প্রতিটি কথা তার কান দিয়ে যেন গলা হয়ে বুকের ভেতর নেমে যাচ্ছিল। সেই মুহূর্তে স্বেচ্ছায় সেখান থেকে সরে যাওয়ার ইচ্ছা বা ক্ষমতা, কোনটাই তার ছিল না।

—কে নেবে বাবা এই মেয়েকে ?

—নেবে আবার কি ? বলুন ধন্য হবে। হাসালেন—

—আমরা গরিব, মাধবের মা বলল। আর ভেতরে ভেতরে কেমন কুঁকড়ে গেল স্মৃতি। আসলে, গরিব কথাটাই তার প্রাণে ভারি গরিব শোনাল তখন।

—গরিব আবার কি ? সেটা কি জিনিস বলুন তো ?

—তোমার চেনাজানা কোন ছেলে আছে ? আমাদের পালটি ঘর, এতক্ষণে যেন একটা বলার মত কথা পেল মাধব।

মাধবের মা বলতে যাচ্ছিল, তুমি আমার মেয়েকে— আর একটু হলেই বলে ফেলত হয়তো। কথাটা জিভের আগায় সামলে নিল মাধবের মা। গুছিয়ে নিল। বলল, তোমার বিয়ে হয়েছে বাবা ?

কবি হাসলেন। সে হাসি দেখে কিছুই বোঝা যায় না। হাসিটা দেখল স্মৃতি।

—জানতে চাইলাম বলে কিছু মনে করলে না তো বাবা !

—এইতো মুশকিলে ফেললেন মাসীমা,

কবি আবার হাসলেন। হাসিটা আবার দেখল স্মৃতি।

মাধবের মা মনে ভাবল সদ্যোআগত এই যুবকের বিয়ে হয়েছে কিনা এটা তার

কাছে এই মুহূর্তে নানা ভাবে জানতে চাওয়ার কোন মানে নেই। নিশ্চয়ই অবিবাহিত। না হলে ও যার শালাবাবু সে-ই তো বলে উঠত।
ও সব জেনে নিলেই হবে।
—তোমার বাবার নাম কি বাবা?
উচ্ছ্বসিত হেসে উঠলেন কবি। দুলে দুলে।
—হাসছ কেন বাপু?
—আমি বামুনের ছেলে কিনা জানতে চাইছেন তো?
নির্ভুল। তাই জানতে চাইছিল মাধবের মা।
হাসি থামিয়ে কবি বললেন, আমি বামুনের ছেলে।
—বেশ বেশ,
—কিন্তু আমি যে ব্রাহ্মণসন্তান তা প্রমাণ করতে পারব না।
—সে আবার কি কথা।
—আমার পৈতে নেই।
—কেন? পৈতে হয়নি তোমার?
—হয়েছিল
—তবে?
—পৈতে ফেলে দিয়েছি
—ওমা! কি অলুক্ষুণে কথা! কেন?
—ও আমার কোন কাজে লাগে না।
—তাই বলে ফেলে দেবে?
—আমার পোষায় না। পৈতের একটা মানমর্যাদা আছে। আমি তা রাখতে পারি কই? ফেলে দিয়েছি।
কবি বড়ই করুণ চোখে তাকাল।
এই একই কথা গ্রামের কোন যুবক বললে, মাধবের মা তাকে বা তার সম্পর্কে একটি কথাই বলতেন, তোর মুয়ে আগুন। অথবা তার মুয়ে আগুন।
কিন্তু কবির কথার গোছ, বলার চাল আর করুণ চাহনির জন্য তেমন কিছু মনেই হল না মাধবের মার। এমনিই হয়। যাকে দেখতে নারি, তার গলায় দড়ি। আর যাকে দেখতে পারি? সে হলো গে মোর কণ্ঠিধারী। বাহা রে মজা। আরোপিত চেকনাই বড় কুটিল জিনিস। তা নিজে ভেঙে যাওয়ার আগে বহু ভাঙচুর করে। যেন বহু দূরের এক স্বপ্নের ভিন দেশ, কলকাতা

থেকে এসেছে ও। যেন নতুন চেনা কোন নক্ষত্র। এমনি ম্যাজিক। আহা রে কি সরল ছেলেটা। মায়া হচ্ছিল মাধবের মার।

—তা বাবা, তোমার মা কিছু বলে না?

—মা?

—হ্যাঁ, তোমার মা। বলে না?

—ন্না।

—কোনদিন বলেনি?

—না তো।

—সে কি!

—আমার মা তো ব্রাহ্মণকন্যা নয়।

—মানে

—কিউপিডের কেস

—সে আবার কি

—কিউপিড। লভ ম্যারেজ। ওদের লভের নিট লাভ আমি।

কবি আবার হাসতে লাগল। অসভ্য? মাধবের মা সকলের অজান্তে একটা হোঁচট খেল। তার ছেলে মাধবও এই কাণ্ড করেছে দুর্গাপুরে। লভ। ঘরে বৌ ছেলে, তবুও। এখন এই যনতোন্নার লভের কথা থামলেই বাঁচে মাধবের মা। আর এ যা ছেলে! মুখে কোন খিল বলতে নেই। নিজের বাবামাকে নিয়ে আবার কি বলে বসে কে জানে। হে ঠাকুর, কেউ ওকে থামাও।

হাসছে। শুধু হাসছে। অসভ্য? কবি? এর নাম কবি? কি আশ্চর্য স্মৃতিরও হাসি পাচ্ছে। খুব হাসি পাচ্ছে তার। হাসি আড়াল করার জন্যে আঁচল দাঁতে কাটতে গিয়ে স্মৃতি হঠাৎ সচেতন হয়ে দেখল, একদৃষ্টে কবি তার দিকেই তাকিয়ে আছে। নিষ্পলক। সোজা। যেন স্মৃতির বুকের তলা পর্যন্ত চলে যাচ্ছে তার চোখ। যেন একটা সাদা তুলতুলে নরম বেড়ালছানা কিংবা একটা গোলাপায়রা মাতামাতি করছে তার বুকে। বুক। মেয়েদের যা কেবলই আড়াল করতে হয়। বুকের ওপর শাড়ির আঁচল আরও টেনে দেওয়া তাই যেন নিশ্বাস নেওয়ার মত স্বাভাবিক। তবু হাসে। অসভ্য? কবি? এই কবি নাকি?

এই সময় সেই ঘর থেকে সরে যাবার জন্য পা বাড়াল স্মৃতি। মা বলল,

তুই কি রে স্মৃতি, ব্যাভার শিখলি না এখনো ? পেনাম কর—
প্রণাম ?
চোখ তুলে সোজা তাকাতে পারছে না স্মৃতি। মাথা হেঁট করে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। তারপর সম্পূর্ণ ঝুঁকে তার পায়ে হাত দেবার আগেই সেই কবি স্মৃতির দুই হাত ধরে বলল, করছ কি। আমি কি প্রণাম পাওয়ার যোগ্য নাকি ?
স্মৃতি সেসব কিছুই শুনতে পেল না। সে ক্রমশ অসাড়। নাকের ডগা, কানের লতি কি কাঁপছে ? নিশ্বাসের বাতাস বা ঝাপটায় তার মুখ বুঝি ঝলসে গেল। কার নিশ্বাস ? সেই কবির ? না স্মৃতির নিজের ? স্মৃতি জানে না।
ভিতরে বাঁশি বাজলে এমন হয়।

১০

॥ কুসুমে কীট ॥

মানুষটা সত্যি আলাদা। অনেকটা অন্যরকম। দুর্গাপুর থেকে আসা সকলে টেনে ঘুম লাগাল দুপুরে। বিছানার দিকে গেলেন না তিনি। জমিতে চাষ আর গ্রামের লতাপাতাফুল চেনার জন্য এক দঙ্গল ছেলের সঙ্গে হৈ হৈ করে বার হয়ে টই টই করে মাঠেমাঠে সারা দুপুর ঘুরে, মাঠেমাঠে অনেক দূর চলে গেলেন। মস্ত মাঠের মধ্যে সূর্য কেমন ডোবে, ফোঁটায় ফোঁটায় ছড়িয়ে যেতে যেতে. মাঠ জুড়ে মিহি অন্ধকার কেমন হামা দেয়, হামা দিতে দিতে চরাচর কেমন ফোঁটায় ফোঁটায় অন্ধকারে ঢেকে যায়, তাই বড় আমোদ করে দেখলেন কবি। কলকাতায় এমন পবিত্র অন্ধকার কিছুতেই দেখা যায় না। সেখানে অন্ধকার, খিদিরপুরের জাহাজঘাটা সংলগ্ন মার্কামারা বেশ্যাপাড়ার মত। বিকিকিনির হাট। ধর্ষিতা নয়, কিন্তু আলো সেখানে অন্ধকারকে কেবলই ছেঁড়ে খোঁড়ে আর খামচায়। অন্ধকার বিক্রি হয়, তাই। এখানে অন্ধকার সূর্যের আলোর মতই স্পষ্ট অনর্গল, অহংকারী আর নিরেট।

প্রকৃতির খাস তালুক থেকে এখানে নেমে আসে অন্ধকার। জটার মত। জলের মত। গাঢ়। গভীর। গভীরতর। ভারজিন। সতী অন্ধকার। আহ্ হেভনস্, ভাগ্যিস এখানে বিদ্যুৎ আসেনি,—এই বলে কবি অন্ধকার বিষয়ে নানা কথা বলতে বলতে তার সঙ্গীদের দিকে তাকালেন।

—তাই বলে আলো কি নেই? আছে বৈকি। হ্যারিকেন। কুপি। এই সব ছিটেফোঁটা আলো। মেয়েদের যেমন ঋতু। স্বাভাবিক আর স্বাস্থ্যকর। সঙ্গীরা তবু কিছু বুঝল না। বেহেড বোকা মুগ্ধতায় শুধু চেয়ে থাকল। কবি বললেন, তোমরা একটা আন্দোলন কর। কি জান? বিদ্যুৎ চাই না। কেন জান?

—কেন? একজন জানতে চাইল।

—আদিমতাই স্বাধীনতা। আদিমতাই ঐশ্বর্য। আদিমতা বোঝ?

—না, ঘাড় নেড়ে জানাল একজন।

—আদিম মানুষ প্রাণে বাঁচার জন্য আত্মরক্ষা করত আর পৃথিবীকে ভোগ করত। বুঝে নিও হে, মানুষকে ভোগ করত না, পৃথিবীকে ভোগ করত—। আদিমতা আর আধুনিকতা দেখতে একরকম, কিন্তু দুটোর চরিত্র আলাদা। আধুনিকতা বোঝ?

—না, এবারও সেই আগের জন ঘাড় নাড়ল।

—আধুনিক মানুষ আত্মরক্ষা করে না, হয় আত্মহত্যা করে না হয় অন্যকে হত্যা করে। সে পৃথিবীকে ভোগ করে না, সে মানুষকে ভোগ করে। অন্য কোন মানুষ না পেলে, সে নিজেই নিজেকে ভোগ করে। নিজেকে নিজে খায়—কিছু বুঝলে?

এই সব কথা বলতে বলতে, অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পরও মানুষটা বাড়ি এল না। গিয়ে বসল সবুজ সমিতির দাওয়ায়। কবির সম্মানে সমিতির হ্যাজাক জ্বালান হল। তাস খেলা হচ্ছে।

মাধবের মা পরাণকে পাঠালেন কবিকে ডেকে আনতে। পরাণ অন্ধকারে আলো ছাড়াই যাওয়া আসা করে। মাধবের মা বললেন, লণ্ঠন নিয়ে যা পরাণ। অন্ধকারে না হলে আসবে কি করে?

পরাণ এসে যাওয়াতে সেই কবি তাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ক্ষিধে পেয়ে গেছে হে। কিন্তু খাওয়া দাওয়ার পর কি?

তারপর ঘুম ছাড়া আর কি হতে পারে ? রাত নটা মানে তো অনেক রাত। ছেলেরা মুখ চাইতে লাগল এ-ওর।

কবি বললেন, মাইরি, কি চাঁদই না উঠেছে! একেবারে ডার্লিং। ওকে যদি আজ রাতেই না দেখি, ও কথা বলবে না আমার সঙ্গে।

কবি বললেন, রাতের খাওয়ার শেষে তাঁরা দল বেঁধে যাবেন বদর মুনসী। তোমরা আমার সঙ্গে যাবে তো ?

—কাল সকালে যাবেন, সাইকেল করে, একজন বলল।

—রাতে নয় কেন ?

—রাতে সাইকেল চালান যাবে না। আমরাই পারি না

—হেঁটে যাব তাহলে

—আসতে যেতে অনেকক্ষণ

—কতক্ষণ ?

—তিন ঘণ্টা তো বটেই

—দারুণ

—কি বলছেন ?

—রাতে। আজ রাতেই। কাল সকালে তো আর চাঁদ থাকবে না।

—কি দেখবেন ?

—বলছ কি তুমি! কি নেই ওখানে ?

—কি আছে ?

—চাঁদ লাগা কালচে জল। রাত লাগা চাঁদ। আর পদ্ম। পদ্ম হচ্ছে ভৈরবী। বদর মুনসী হচ্ছে ভৈরব। এই হল তন্ত্র সাধনার রাত। ভৈরব চক্রের রাত। পবিত্র আদিমতা।

যেন শুধারে গ্রামের সকলের মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলছে না এই গ্রহান্তরের জীব। ভাষাটা হুবহু বাংলা। লোকটাও পুরো ও ঠিক ঠাক মানুষ। অথচ অনর্গল কত কি যে বলে। কি বলে ?

—এমন কোন রাতে তোমরা দল বেঁধে গেছো কখনো বদর মুনসীতে ?

—না।

—জানতাম। কি জানো, গেঁয়ো যোগী নয়, হাতের কাছের কোন কিছুই ভিক্ষা পায় না। আমি কিন্তু যাবো। যাবোই। তোমরা কেউ যাবে না ? ওরা পরস্পর মুখ চাইতে লাগল।

—একজন গেলেও যাব আমি। কে যাবে আমার সঙ্গে? একজনও যাবে না? ও হেল—

সে রাত্রে, কিছু পরে ছোট্ট একটা দল সত্যি এসে হাজির মাধবের বাড়িতে।

—ব্যাপার কি?

—আমরা ওনার সঙ্গে যাব, ছেলেদের একজন বলল।

—কোথায়?

—বদর মুনসী।

—তোমার কি মাথা খারাপ? কবিকে বলল মাধব, যাওয়া আসায় কতক্ষণ লাগবে জানো?

—জানি। তিন ঘণ্টা। ওখানে থাকব একদু'ঘণ্টা। রাত দুটো তিনটেয় ফিরে আসব আমরা।

পরাণ বলল, ওখানে অনেক সাপ। রাতে যাওয়া ঠিক নয়।

মাধব বলল, এ তোমার কলকাতা নয় বাপু।

ওদের যাওয়া হল না।

সে রাত্রে স্মৃতি একটা স্বপ্ন দেখল। সে দেখল তার বাম কানের ওপর কপাল ঘেঁষে, চুলের মধ্যে একটা মস্ত ফুল ফুটে আছে। এমন ফুল সে জীবনে কোন দিন দেখেনি। যেন কেউ বসিয়ে দিয়েছে ফুলটা চুলের মধ্যে। একটা অচেনা তীব্র, অথৈ সুগন্ধে স্মৃতির সেই স্বপ্ন ও স্বপ্ন মাখা ঘুম, মৃম্ করতে লাগল।

১১

॥ কবি ও পরাণ ॥

কথা ছিল দুর্গাপুর থেকে আসা অতিথিরা থাকবে ৭২ ঘন্টা। চারদিনের দিন রাত ভোর হবার আগেই প্রথম ট্রেন ধরল ওরা। গেল না শুধু একজন। সে কবি।

কিন্তু হল কি মানুষটার? দুর্গাপুরের দল চলে যাওয়ার পর সে ঘরের বাইরেই এল না। সকালের জল খাবার তার ঘরে পৌঁছে দেওয়া হল। দুপুরে ভাত খেয়ে আবার ঘরে ঢুকে সে দরজা জানালা বন্ধ করে শুয়ে থাকল। গত তিন দিন এই মানুষটাকেই মনে হয়েছে এক স্বয়ং মহারাজা। কিংবা কোন মস্ত সেনাপতির ছোট ভাই। যে কোন জায়গায় যখন খুশি যায়। চুপ করে থাকতে যেন জানেই না। মাধবমাষ্টার আর তার মার মুখের ওপর সিগারেট খায়। এক ঘর লোকের সামনে স্মৃতির বেণী ধরে টান দেয়। ঘরে বসে তাস খেলার সময় স্মৃতির পিঠে হাত দিয়ে নির্দ্বিধায় বলে, তুমি পাশে বসে থাকো। তুমি পাশে থাকলে, লাক্ ভাল থাকে।

স্মৃতির পিঠে বা কাঁধে সেই কবির হাত, হাতের আঙুল মাঝে মাঝে বসে গেছে। স্মৃতি জানে।

দু'বৌদি আড়ালে হাসা হাসি করেছে। মাধবমাষ্টারের প্রথম স্ত্রী, তার সতীন মাধবের দ্বিতীয় পত্নীকে বলেছে, তোরও তো লাভ ম্যারেজ। এসব হয় নাকি লা?

একবার স্মৃতি কোন ক্রমে বলেছিল, আমি বসে থাকলে চা আনবে কে?

—কেন পরাণ দা।

বহুবার চা এনে দিয়েছে পরাণ। বিশেষ দুপুরে। দুপুরে তার পুজোর কাজ থাকে না।

সেদিন বিকেলে কবি বলল পরাণকে, চলো পরাণদা। কোথাও ঘুরে আসি।

—কোথায় যাব ?

—ঘুরে আসব একটু। চলো।

ওরা বার হয়ে পড়ল। গ্রামের মুদিখানার দোকানের কাছে এসে কবি পরাণের হাতে টাকা দিয়ে বলল, দুটো কাচের গ্লাশ কেনো। আর একটা কলসি।

—কি হবে ?

—আজ তোমার আর আমার পিকনিক। পিকনিক বোঝ ?

—না।

—বনভোজন ?

—না।

সোনা পিসীমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে, বাঁয়ে মুসলমান পাড়া রেখে, গয়লা পাড়া পার হয়ে, খয়রা গোড়, শ্যামপুকুরের পাশ দিয়ে ওরা এসে দাঁড়াল পালিত পুকুরের পাড়ে। কাছেই একটা টিউবওয়েল। এটাই গ্রামের এদিকের সীমানা। নিরিবিলি। আরও একশো পা এগিয়ে গেলে এক মস্ত ঝাঁকাওয়ালা পলাশ গাছ। যেমন সোজা, তেমনি উঁচু। থোকা থোকা পলাশ। অজস্র। টকটকে লাল। টিউবওয়েলের মুখে কলসি ধরল কবি। জল ভরে সেটি কবির হাত থেকে নিয়ে কলসিটা প্রায় মাজাঘষা করল পরাণ। ধুয়ে পরিস্কার করে নিল।

আবার কলসি ধরলো কবি। টিউবওয়েলে ক্রমাগত কাঁাচ কাঁাচ আওয়াজ হতে লাগল। বোধহয় সেই শব্দে কাছাকাছি রবিফসলের ক্ষেত থেকে এক জোড়া শালিক উড়ে গেল। ক্ষেতটায় অজস্র কুমড়ো ফলে নিশ্চিন্তে মাটিতে অপেক্ষা করছে।

পলাশ গাছ ও তার চারপাশ বড্ড নির্জন। গাছের গুঁড়ির কাছে পরাণ জলভরা ছোট কলসি গুছিয়ে রাখার আগে, তার প্যান্টের পিছন পকেট থেকে চ্যাপ্টা বোতল বার করল কবি। জিন। কয়েক ঢোক গলায় ঢালল, দুটো গ্লাশে জল নাও পরাণদা।

—কি হবে ?

—মাল খাবো।

—আপনি মদ খান ?

—আঃ ঢালো তো। মেজাজ নষ্ট করো না।

—আমি খাই না।

—একদিন খাও।

—এ গ্রাম বাবা বাগেশ্বরের। আমি তাঁর পুজো করি। আমার এসব ছুঁতে নেই।

—একি ট্যাবু রে বাবা! ট্যাবু বোঝ?

—না।

—বেশ আছো মাইরি। তা বাগেশ্বরের গাঁ বলে কি এখানে মেয়ে পুরুষের ছোঁয়া ছুঁয়ি নেই? বাচ্চা কাচ্চা সব এমনি হচ্ছে নাকি? হ্যাঃ হ্যাঃ—

এই সব বলতে বলতে কবি নিজেই দুটো গ্লাশে খানিকটা জল ভরে আনল। তারপর বলল, একটু খেলে জাত যাবে না। মুখে গন্ধ হবে না। খেয়ে দেখো, মজা কেমন। কাম অন, পরাণদা—

—না।

—এ বোতলটা কবে খালি হয়ে যেত, বুঝলে? শুধারে এসে সবাই একেবারে শুধরে গেল। নিজেরা ছুঁল না। আমাকেও খেতে দিল না। আমি শালা হাঁপিয়ে উঠেছি—। তোমার গ্লাশে মাত্র দু'চামচ দিয়েছি। নাও।

—না।

—একা ভাল্‌লাগে না। প্লীজ।

হাসতে হাসতে কবি ডান হাতে পরাণের পিঠ ও গলার অনেকটা জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি যেন কি পরাণ দা। দু'জনে মজা আর ফুত্‌তি করার জন্যে তোমায় নিরিবিলি আলাদা ডেকে নিয়ে এলুম আর তুমি শালা ভাম মেরে বসে আছো। নাও—

—না।

—তুমি একটা ক্যারেক্টার মাইরি।

ক্যারেক্টার কি পরাণ জানে না।

—যা-ই বলি, তাতেই চুপ করে থাক। তুমি শালা একটি হত্‌তেল ঘুঘু।

এরপর কবি আর কথা বলল না বহুক্ষণ। পরাণও চুপ করে বসে থাকল। চারপাশ বড়ই নির্জন। মাঝে মাঝে আলটপকা দু'একটা পলাশ খসে পড়ছে গাছ থেকে। গাছ থেকে ফুলের মত হাল্কা কিছু মাটিতে পড়লেও, মাটি তা জানান দেয়। প্রতিবার এই নির্জনে এমন পুষ্পপতনের সঙ্গে দু'জনেই

ঘাড় ঘোরাল। কাছে দূরে পাশাপাশি গায়ে গায়ে অনেকগুলি পুকুর। পুকুরের জলে কেউ নামলে, জল ভরার ও জলের নানা শব্দ ভেসে আসছে মাঝে মাঝে। আর মাঝে মাঝে অনতিদূরের পথ বা মাঠ দিয়ে চলতি মানুষ জনের খলখলে গলার টুকরো।

যেহেতু কবি একাই পান করছিল, এবং জলে মেশানো জিন ছাড়া হাতের কাছে কিছুই ছিল না, এবং দুজনের কেউই কোন কথা বলছিল না, তাই চুমুকগুলো হয়ে যাচ্ছিল খুব দ্রুত। গাল, চিবুক ও চোখের পাতা ইতিমধ্যেই ভারি ঠেকছে।

—ডিমভাজা আনতে পারো?

—বাড়ি থেকে?

—ধ্যেৎ। চপ? পিঁয়াজি? দোকানে পাওয়া যায় না?

—পয়সা দিন।

—আর আমি এখানে একলা বসে থাকবো?

মাটির ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল কবি। ওপরে তাকাতে তার মাথাটা সামান্য ঘুরে গেল। টাল খাওয়ার মত। সে বুঝতে পারল তার নেশা হচ্ছে। যদি নিজেকে গুছিয়ে না ধরে, তাহলে নেশা হয়ে যাবে। সে উঠে খানিকটা পায়চারি করল নিজের মনে। তারপর মাটিতে বসল দু'হাতের পাতা মাটির ওপর রেখে। যেন দু'হাতের পাতার ওপর শরীরের ভার রেখে বসেছে। বলল, মনের বাড়া পাপ নেই, বুঝলে পরাণদা। আজ সকালে চলে গেলেই হত। এখন আমার নিজেকে লাথি মারতে ইচ্ছে হচ্ছে।

পরাণ কিছুই বলল না।

কবি বলল, তোমার ইচ্ছে হয় না?

—কি?

—শরীরের। আমি এখন সে রকম ইচ্ছেয় মরে যাচ্ছি। তোমার কপালে একটা দারুন বৌ আছে পরাণদা। বৌ'র সঙ্গে শুয়ে তোমার খুব সুখ হবে। একেবারে তুফানমেল কেস হবে রোজ। তাড়াতাড়ি বিয়ে করো পরাণদা, না হলে তোমার পাখি পালাবে।

পরাণ শুধু চুপ করে আছে।

—কথাটা মনে ধরলো না তো। তুমি যদি চাও, আমি তোমায় দেখিয়ে দিতে পারি, আজই ও আমার সঙ্গে পালাতে পারে। দেখতে চাও?

—পালাবেন কেন ? বিয়ে করুন।
—নাকি ?
—ছোটমাকে, দাদাকে বলুন।
—আর তুমি কি বুড়োআঙুল চুষবে ? তুমি শালা ঠিক অভিশাপ দেবে আমায়।
—স্মৃতি খুব ভালো মেয়ে
—চুমু খেয়েছো ওকে ? আদর করেছো কখনো ?
পরাণ কিছুই বলতে পারল না।
—শালা ঘোড়েল। হাতের কাছে এমন জিনিষ। না চেখে থাকা যায়! কত দিন থাকা যায় ? কতদূর এগিয়েছ দাদা—
—আমি চলে যাচ্ছি, পরাণ বলল।
—ও হরি, এনার দেখি মেজাজ হয়েছে। মেজাজের মুখে মুতে দি আমি—
এই বলে কবি পরাণের জন্য রাখা গ্লাশটায়, যাতে সে নিজের হাতে খানিকটা জল ও জিন ঢেলেছিল, তাতে মারল এক লাথি। তারপর আবার আচমকা পা চালিয়ে সে মাটির কলসি দিল ভেঙে। ভাঙা কলসির জলে ভিজে গেল গাছের গোড়া।
মাটির ওপর আবার চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল কবি। ওপরে তাকাতে তার মাথাটা বেশ ঘুরে গেল। সে বুঝতে পারল, সে নিজেকে সামলাতে না পারলে পুরো মাতাল হয়ে যাবে। সামলাবে বলেই উঠে বসল আবার। খানিকটা পায়চারি করার চেষ্টা করল। পারল না। মাটিতে বসল আবার নিজের দুহাতের পাতা মাটির ওপর রেখে। বলল, কোন মানে হয় না। আমি যে মরতে কেন ওদের সঙ্গে চলে গেলাম না ? সেই পাপে এখন ভুগছি। আমার নিজেকে লাথিই মারতে ইচ্ছে করছে। পরাণদা, তুমি শালা লাথ্থি মারো আমাকে। মার্‌রো পোঙ্—
লোকটার নেশা হয়ে গেছে।
পরাণ জীবনে মাতাল দেখেছে অনেক। কিন্তু সে সব গ্রামের মাতাল। এ কলকাতার। এমন মাতাল পরাণ আগে দেখেনি।
পরাণ বলল, বাগেশ্বরকে সন্ধে দিতে হবে। আমি যাচ্ছি—
—ওরে, আমার পাঁচালি পড়া পুরুত রে। আগে আমার জন্যে পিঁয়াজি আর চপ নিয়ে এসো। এই নাও টাকা—

প্রায় আধঘন্টা পরে তেলেভাজা নিয়ে সেখানে ফিরল পরাণ। কেউ কোথাও নেই। পরাণ ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে যতদূর পারে, তাকাল। দেখা পেল না। হাতের তেলেভাজার ঠোঙা সেখানে নামিয়ে রেখে পায়ে পায়ে বাড়ি ফিরল পরাণ।

সন্ধ্যা হল। সাতটা বাজল। আটটা বাজল। দেখা নেই। সবুজ সমিতিতে নেই। গ্রামের কোথাও কারো বাড়িতে নেই।

কবি ফিরল রাত প্রায় এগারোটায়। সঙ্গে তিনজন যুবক। কবি বলল, আমরা বদর মুনসী দেখে এলাম।

মুখে চোখে শরীরে কোথাও জিনের চিহ্ন মাত্র নেই। দেখে মনে হয় কিছুক্ষণ আগে স্নান করে চুল আঁচড়েছে।

—তুমি চান করেছো নাকি ? মাধব এভাবেই তার উদ্বেগ প্রকাশ করল।

—হ্যাঁ

—উঃ। তোমার জিদ বটে একখানা। সেই রাত করেই বদর মুনসী গেলে। এদিকে আমাদের অবস্থাটা জানো! মা-তো আর একটু হলে ডাক ছেড়ে কাঁদতে বসত। ধারে কাছে কোথাও স্মৃতিকে দেখা গেল না।

১২

॥ অজস্র লাল পলাশ ও ভাঙা কলসি ॥

এই যে সন্ধ্যায় বাড়ি এল না কবি, আসতে রাত এগারোটা করে দিল, তাতেই একটা খোলা বইএর মত মেয়েকে পড়ে ফেলল তার মা। মেয়ের চাহনি, নিঃশ্বাস, অস্থিরতা, হাসি, চটুল চঞ্চলতা, অকারণে চোখে জল, এসবই কদিন লক্ষ্য করছিল সে। কোন মেয়ে আর নিজেকে তার মার কাছ থেকে লুকোতে পারে ? কিন্তু কাল রাত্রে ব্যাপারটা অন্য মাত্রা পেয়েছে। সারা পৃথিবীর কাছ থেকে লুকোন আর আড়ালে থাকলেও, তার মার কাছে আর লুকোন থাকেনি। লুকোতে পারেনি স্মৃতি। লুকিয়ে রাখা অসম্ভব ছিল। মার কোল মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল স্মৃতি। শব্দ-না করে। পরদিন

সকালে ঘুম থেকে উঠতে বেলা হয়েছিল স্মৃতির। ওর মা বলেছিল, ওর শরীরটায় জুত নেই, ঘুমোক একটু।
বাইরে থেকে দরজায় শিকল টেনে দিয়েছিল স্মৃতির মা। মাধবের দুই বৌ শিবানী আর সাধনা চোখে চোখে চেয়ে মুখ টিপে হাসল। শ্বাশুরীর সামনে হাসবে, মুখ তুলে তাকাবে, তা তারা তখন চিন্তাও করতে পারত না। ছেলের সংসারে মাধবের মা, তখন রাজার মা। মার সামনে, স্বামী সাক্ষাতেও কপালের নীচে ঘোমটা নামায় দু'বৌ।
কিন্তু এ সব নিয়ে আর ভাবেনি স্মৃতির মা। ছেলেটা এসেছে। চলে যাবে। মাঝখান থেকে একটা বুকচাপা ধাক্কা দিয়ে গেল মেয়েটাকে। কি আর করা যাবে? নিরুপায়। কখন যে এই সব হয়ে যায়! কেন যে হয়! এসব মনের অসুখ। বদ্যির অসাধ্য। মনের ওপর তো হাত নেই। এরপর স্মৃতির বিয়ে হোক। এ'সব আপনি কেটে যাবে। এ একটা হাওয়া। আপনি এসেছে। আপনি চলে যাবে। ও তো আমাদের কাছে অন্য-আকাশের চাঁদ। ও ওর নিজের আকাশে চলে যাক। ফিরে যাক ও। রাত পোয়ালেই চলে যাক। ওর কেন এখানে পড়ে থাকা? আমার মেয়েটা পুরো মরবে নাকি! হে বাবা বাগেশ্বর—সারারাত এইসব চিন্তাই তার মাথায় ফরফর করতে লাগল।

পরদিন সকালে, মাধবেরমার সকল হিসেব আর হদিস ওলটপালট করে দিল ছেলেটা। কোন ভূমিকা না করে মাধবের মার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বলল, মাসীমা আমি কালকেই চলে যাব
—আটকাতে তো পারিনা বাবা।
—আমায় এখানে আবার আসতে হবে।
—সে বেশ তো বাবা
—কিন্তু তার আগে স্মৃতির সঙ্গে আমার কথা আছে
—কি কথা বাবা?
—স্মৃতিকে বলবো
—আমাকে বলা যায় না?
—তাহলে তো বলতাম।

—আমাদের বাড়িতে একঘরে শুধু তোমরা দুজন বসে কথা বললেও কথা হবে। এতো তোমাদের কলকাতা নয়।

আসলে মাধবমাস্টারের মা এই কথাই বলতে চাইল যে তারা দুজন একটি ঘরে বসে একলা কথা বললে মাধবের দুই স্ত্রী, স্মৃতির দু'বৌদিই সবচেয়ে বেশি কথা বলাবলি করবে। প্রথমে ঘরে। পরে বাইরে। কিন্তু একে তো তা বলা যায় না।

—ঘরে বসে কথা বলতে চাই না।

—তবে কোথায় বলবে ?

—আমি স্মৃতিকে নিয়ে বাইরে যাব।

—তুমি আর স্মৃতি ?

—আপনার অনুমতি চাইছি।

—অসম্ভব।

—খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো। আপনার কোন চিন্তা নেই।

—তোমার কথা আগে তোমার বাড়িতে বল, মাধবকে বল, আমাকে বল, তবে—

—সে তো বলবই

—বল তাহলে

—আগে স্মৃতির সঙ্গে কথা বলতে হবে। তাই থেকে গেছি। যদি 'না' বলেন, তাহলে আজই চলে যাব।

এই যে ছেলেটি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ; গতকাল রাতে বদর মুনসী দেখে যে রাত এগারোটায় ফিরেছে, আর কেউ না বুঝুক তার চোখ মুখ দেখে মাধবের মা ঠিকই বুঝেছিল ব্যাপার কি। ও চেহারা সে চেনে। নেশার চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য স্নান করলেও সে ঠিক বোঝে। তার স্বামী হৃদয় পুরুতের তো আর কোন দোষ ছিল না। মদ। লিভার পচে অকালে চলে গেলে মানুষটা। মদ চেনে না মাধবের মা ?

বিলক্ষণ।

কিন্তু এখন এই ছেলে, যা বলছে তারজন্য স্মৃতিরমা তৈরী ছিল না। কোন দুঃস্থ গৃহীর সামনে, কোন সন্ন্যাসী যদি ভোজবাজী দেখানোর মত শূন্য থেকে একটা সোনার থালা এনে সেই গৃহীর সামনে ধরে বলে, এটা তোর। শুধু তোর। নিবি না ?

—আমি কি বলব বাবা ?

—হ্যাঁ কিংবা না বলবেন।

—এ আমি একার মতে পারব না

—আর কার মত নেবেন ?

—মাধবের

—তবুও তো আপনার মত চাইতে হবে। আপনিই তো হাইকমাণ্ড।

মাধবের মা ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

—আপনার হুকুমই তো একমাত্র হুকুম এই বাড়িতে, এই বলে ছেলেটি হাসল। ওর হাসি বড় সরল। মায়া হয়।

মাধবমাষ্টারের মা বলল, শুধু তোমরা দুজন গেলে, গাঁয়ে আর কান পাতা যাবে না।

—বেশ তো কাউকে সঙ্গে দিন আপনি।

—কাকে দোব সঙ্গে! কোন বাচ্চাকে পাঠাতে মন চায়না

—কেন ?

—সে কি বোঝে! হয়তো খেলার টানে কোথাও চলে যাবে। তাহলেই সেই পাঁচ কথা।

কবি হাসল। বলল, পরাণদা যেতে পারে না আমাদের সঙ্গে ?

—পরাণ ? তা পারে।

যখন ঘর থেকে বার হল, তখন স্মৃতির পাশে পরাণ। তারপর কবি। স্মৃতির কথায় পরাণ গায়ে সার্ট দিয়েছিল। হাঁটু পর্য্যন্ত ধুতি। এখন এইটুকু আসতে আসতেই পরাণ কিছুটা পিছিয়ে গিয়েছে।

—কেমন লাগছে তোমার, কবি বলল পাশাপাশি চলতে চলতে, কি হল, কথা বলবে না ? তুমি কোনদিন কলকাতায় গেছ ?

—না।

—কলকাতা গেলে, তোমার এখানকার জন্য মন কেমন করবে ?

কথার উত্তর না দিয়ে স্মৃতি পিছন ফিরে তাকাল।

—বারবার পিছনে তাকাচ্ছো কেন ?

—পরাণদা পিছিয়ে যাচ্ছে।

—সে তো যাবেই। না হলে কথা বলবো কি করে? পরাণদা বোঝে। চল—

একটা নৌকোকে জলে ভাসিয়ে শুধু হাতে করে ঠেলে দিলে সেটা যেমন জলের টানে কিছুদূর যায়, তেমনি এগিয়ে গেল স্মৃতি। ঘর থেকে বার হবার আগে মা বলেছিল, আমি তোকে যেতে দিতাম না। কিন্তু ও তোর সঙ্গেই কথা বলতে চায়। আজকালকার কলকাতার ছেলে। তোকে যেতে না দিলে সব মিটে যায়। ভগবানের কাছে বারবার বলেছি, যাকে মন দিয়েছিস তুই, সেই মনের মানুষকে পা। তোর সুখ উথলে উঠুক। কিন্তু সাবধান। ও কি বলে কান করে শুনবি। কোন কারণে খবরদার নিজেকে আলগা দিবি না। পরাণ যেন সবসময় কাছে কাছে থাকে। খেয়াল রাখবি সবসময়। পুরুষ মানুষকে কোন বিশ্বাস নেই।

—তোমার মাকে বলেছি, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। কি কথা জানতে চাইবে না?

—বলুন।

—ওদের সঙ্গে আমি ফিরে গেলাম না কেন জান?

—না।

—তুমি আমায় পাগল করে দিয়েছ। তোমার জেলখানায় আমি কয়েদি। এখানে আটকে গেছি। কালই চলে যাব আমি। তুমি আমায় চিঠি দেবে?

—আপনি?

—তোমায় চিঠি না দিলে মরে যাব। তোমার চিঠি না পেলে মরে যাব। স্মৃতি, তুমি আমার দিকে তাকাও।

স্মৃতি তার চোখ ও দৃষ্টি নামিয়ে নিল।

—তুমি আমার দিকে তাকাও। বাড়িতেতো পাহারা। এখানেও তাকাবে না? স্মৃতি যেন আর চলতে পারছে না।—ওকি দাঁড়িয়ে গেলে কেন?

—পরাণ দা অনেক পিছিয়ে গেছে।

—ওইতো আসছে। চলো। শোন, সময় খুব কম। আমি তোমায় এবার আমার আসল কথাটা জিগ্যেস করবো। তোমায় উত্তর দিতে হবে। শুধু উত্তর দিলে হবে না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে হবে। তুমিতো কথাই বলছ না—

—বলছিতো।

—আমাকে তোমার ভাল লাগে ?

একটা বোলতা বোঁ-ও-ও করে উঠল স্মৃতির মাথার মধ্যে।

—আমি তিনবার বলব। কোন উত্তর না দিলে দুহাতে ধরে তোমার মুখ তুলে ধরব আমার দিকে। কে দেখল না দেখল বয়েই গেল আমার। আবার বলছি, পরপর তিনবার বলব—

—আমাকে তোমার ভাল লাগে ?

—আমাকে তোমার ভাল লাগে ?

—আমাকে তোমার

তৃতীয়বার কথাটা শেষ করার আগে পরাণ খুব কাছে এসে গেল। ওরা আবার পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। একটা সিগারেট ধরাল কবি।

—এত সিগারেট খান কেন ? স্মৃতি বলল।

—অনেক খাই বুঝি !

—দেখিনি, না ?

—বেশ করি খাই। কি করবে ?

—ফেলে দোব।

—দাওত দেখি।

স্মৃতির মনে হল একটা ছোট্ট লাফ দিয়ে সিগারেটটা ওর ঠোঁট থেকে নিয়ে ফেলে দেয়। ও যেন দেখতে পেল ও হাত বাড়ালেই, ওর বাড়ান হাত ধরে ফেলবে কবি। কি হবে তাহলে ? 'খবরদার নিজেকে আলগা দিবি না। আর একটু হলেই আলগা হয়ে যেত স্মৃতি।

—তোমাদের এখানে অনেক কুকুর, একেবারে পায়ে পায়ে ঘোরে। এগুলোর তো ইনজেকশন দেওয়া নেই।

—কুকুরের আবার ইনজেকশন হয় নাকি ? পরাণ বলল।

—কত। এইসব কুকুর শেয়াল কামড়ালে হাইড্রোফোবিয়া হবে।

পরাণ বা স্মৃতি, কেউই এই শব্দটা কোনদিন শোনেনি।

পরাণ বলল, সেটা কি ?

—জলাতঙ্ক। মারাত্মক।

যে পথ দিয়ে গতকাল পরাণ ও কবি গিয়েছিল, সেই পথ দিয়েই যাচ্ছে ওরা। সামনেই সেই টিউবওয়েলটা। পলাশ গাছটা এখান থেকে গোটা দেখা যায়। কাছেই রবি ফসলের ক্ষেতে কালকের কুমড়োগুলো আজও মাটিতে নির্বিকার

অপেক্ষা করছে।
—কুমড়োগুলো এমনি থাকবে নাকি ?
—আগে পাকুক, পরাণ বলল।
—তারপর ? কবি জানতে চাইল।
—চালান হয়ে যাবে
—কোথায় ?
—অত কি জানি। সহরে যাবে—
—সবই সহরে চলে যায়, বলো পরাণ দা!
পরাণ হাসল।
—তোমার হাসিটা মাইরি দারুন। চলো, ওই গাছটার তলায় বসি— ।

গাছটার তলায়, গতকাল কবির লাথিতে ভেঙে যাওয়া কলসির টুকরোগুলো তখনো পড়ে আছে। টাটকা। সেগুলোর দিকে আপনি চোখ চলে গেল পরাণের। তাছাড়া সে গতকাল রেখে যাওয়া তেলেভাজার ঠোঙাটাও খুঁজছিল। দেখতে পেলনা।
কবি তখন ফুল দেখছে। কবিকে দেখছে স্মৃতি। স্মৃতির তখন মনে হচ্ছে কবিকে ঘিরে এক ধরনের জ্যোতি যেন ভেসে বেড়াচ্ছে।
—সুন্দর, কবি বলল। তারপর বলল, ফুলগুলো সুন্দর, বল স্মৃতি!
—সুন্দর, স্মৃতি উত্তর দিল।
—আমার এই ফুল চাই
—আপনি গাছে উঠতে পারেন ? স্মৃতি জানতে চাইল।
—না ?
—তাহলে পাবেন কি করে ?
—পাব না ?
অজস্র ফুল পড়েছিল গাছটার নীচে। সেখান থেকে চারটে ফুল কুড়িয়ে এনে, কবির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে স্মৃতি বলল, নিন
—ধ্যাৎ, এ কে চাইছে! আমার ওই ফুল চাই। তোমায় দিতে হবে।
—আমি কি করে দোব ?
—তা জানি না। তোমায় দিতে হবে।

স্মৃতি এদিক ওদিক তাকাল। কাছাকাছি কোন বাগাল ছেলে যারা তরতর করে কাঠবেড়ালির মত গাছে ওঠে, তেমন কাউকে খুঁজছিল স্মৃতি। ধারে কাছে কেউ কোথাও নেই। দূরেও কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

—তুমি পার পরাণদা, স্মৃতি বলল পরাণকে।

—কি ?

—গাছে চড়তে

—এত বড় গাছ

—উঠবে না ?

—কতদিন উঠিনি। অভ্যেস নেই।

মস্ত বেড় গাছটার। সোজা। গাঁটে গাঁটে পা দিয়ে ওঠা। তিনজনেই গাছটার দিকে তাকাল।

—ওঠো না পরানদা! ফুল দাও।

গাছের কাছে এগিয়ে গেল পরাণ। গাছের গায়ে পা দেওয়ার আগে সে কপালে হাত ঠেকিয়ে গাছটিকে প্রণাম করল। এটি তার ছেলেবেলার অভ্যাস। তার নিজের মার শেখানো।

ওঠবার সময় হাত পা ছড়ে গেল পরাণের। ভাগ্যি গায়ে একটা জামা ছিল। তবু কেটে গেছে কণ্ঠার কাছে। রক্ত বার হচ্ছে।

গাছের উপর উঠে গেছে পরাণ।

নীচে থেকে কবি চীৎকার করে বলল, না না পরাণদা, ফুল ছিঁড়ো না। তুমি হাতে করে ডাল নাড়িয়ে দাও। আপনি পড়বে। আরও ওপরে উঠবে বলে পরাণ যখন পাতার জঙ্গলে মুখ ঢোকাল তখন স্মৃতির হাত ধরে সেই গাছের বেড়ের অন্যদিকে নিয়ে গেল কবি। বলল, বল আমাকে তোমার ভাল লাগে? এই বলে তাকে দুহাতে বুকের ওপর জড়িয়ে ধরল কবি। মুহুর্মুহু চুম্বনে স্মৃতির ঠোঁট, গাল, চোখ, চোখের পাতা যেন ছিন্নভিন্ন করে দিল। সারা মুখে কবির থুতু লেগে গেছে। স্মৃতির মধ্যে কোন প্রতিরোধ নেই। মার কথা তার কিছুই মনে পড়ছে না। সেই কবি তখন তার দুই ঠোঁটের ওপর নিজের ঠোঁট গুঁজে, স্মৃতির মুখের ভেতর নিজের জিব দিয়েছে। ভয়ঙ্কর কাঁপছে স্মৃতি। তার অসহ্য লাগছে। কপিকলে ঝোলান দড়ির মুখে বালতি যেমন কুয়োয় নেমে যায়, তেমনি গভীর ঘন অন্ধকার জলের দিকে সুতীব্র নেমে যাচ্ছে স্মৃতি। সে নিজেই বুঝতে পারেনি

কখন দুহাতে কবির গলা ও কবিকে জড়িয়ে, বিস্ফোরণের মত অজস্র চুম্বনের কয়েকটি ফিরিয়ে দিয়েছে। আবারও দিচ্ছে।

সব দেখতে পেয়েছে পরাণ। দেখতে পাচ্ছে। ভীষণ হাত কাঁপছে তার। আর তাই টুপটাপ করে অনেক বেশী ফুল খসে পড়ছে মাটিতে। নীচে। ওদের মাথায়। গায়েও।

তখন রোদ মরে আসছিল। লাল টকটকে পলাশের গায়ে তখন নারাঙ্গি রোদ্দুরের কমলা ফিনিক লেগে খুন হয়ে যাচ্ছিল চারিদিক।

আঃ। পরাণ আর দেখতে পারছে না। চোখ বন্ধ করতেও পারছে না। কবির ঠোঁট স্মৃতির গাল, চিবুক থেকে, গলা হয়ে বুকে নেমে এসেছে। ছিঃ। এ দৃশ্য দেখতে নেই। স্মৃতি এবার ছটফট করছে। স্মৃতির বুকে, স্তনে— কিছুতেই চোখ বন্ধ করতে পারছে না পরাণ। গাছের যে দিকে ওরা সরে গিয়েছিল, সেদিক দিয়ে পরাণ গাছ থেকে নামছে—ঠোঁটের উল্কি এঁকে দিয়েছে লোকটা। স্মৃতি হাত ছাড়াতে চাইছে। পরাণের মনে হচ্ছে, স্মৃতি আক্রান্ত।

পরাণ যখন গাছ থেকে নামল, তখন একটু দূরে পিছন ফিরে বসে আছে স্মৃতি। স্মৃতি কি কাঁদছে?

কবি বলল, ইস্। দুপায়ে কেটে গেছে দেখছি। হাতেও কেটেছে। চলো, ডেটল লাগাবে। বাড়িতে ডেটল আছে তো?

—ডেটল কি? এই বলে পরাণ কবির দিকে তাকিয়েছিল। সোজা।

বাড়ি ফিরতেই ছোটমা বলল, এমন ভাব তোর গায়ে কাটল কি করে পরাণ?

—পড়ে গিয়েছিলাম ছোট মা।

—ভাল করে ধুয়ে, পাথর কুচি পাতা ছেঁচে রস লাগা। এখুনি।

১৩

॥ চেষ্টারফিল্ডে ১০০০ বছরের পুরোন গির্জা ॥

পরদিন কলকাতা ফেরার ভোরের গাড়ি ধরবে বলে শুধারে গ্রামে মাধবের বাড়িতে যখন ছইঢাকা মোষেরগাড়িতে উঠল কবি, ভরতি রাত তখন। রাত পৌনে তিন। শুধারে থেকে তখন সেই রাতদুপুরে যাত্রা না করলে ওই গাড়ি ধরা যাবে না। এতটা পথ মোষের গাড়িতে একা যাবে মানুষটা? মোষেরগাড়ির গারোয়ানতো কোন সঙ্গী নয়। তাই মাধবের নির্দেশে পরাণ চলল সঙ্গে। মাধব হিসেব করে দেখল ভোর সাড়ে চারটার ট্রেন ধরিয়ে দিয়ে পরাণ, পৌনে ছটা, খুব দেরী হলে ছটার মধ্যে শুধারে ফিরে আসবে। ফিরে বাগেশ্বর ও অন্যান্য নিত্যপুজোর কাজ ঠিক ধরে নিতে পারবে। সুতরাং কোন অসুবিধা নেই। এবং পরাণের যাওয়াই বিধেয়।

মোষেরগাড়িতে উঠেই খড়ের গদিতে পাতা সতরঞ্চের ওপর শুয়ে পড়ল লোকটা। গাড়ির ঝাঁকানিতে মাঝে মাঝে লাফাতে লাগল। এক সময় আর পারল না। উঠে বসল মানুষটা। থেকে থেকে দমকা দুলুনিতে তার মাথা গাড়ির ছই'এ ঠুকে গেল বেশ কয়েকবার।

কবি বলল, আমি তোমার হাঁটু ধরে বসছি পরাণবাবু। আমার নিজের কোন ব্যালান্স নেই।

কবি সত্যিই এক হাতে পরাণের হাঁটু ধরে বসে থাকল।

—আমি তাহলে যাচ্ছি পরাণবাবু?

পরাণ কোন উত্তর দিল না।

—তুমি আমায় আবার আসতে বলবে না?

পরাণ নিরুত্তর।

—গতকাল যা কিছু দেখেছো ভুলে যেও!

—আপনি ওকে বিয়ে করবেন না?

পরাণ এই প্রথম কথা বলল।

—না।

—কেন ?

—বিয়ে করার মত কিছু হয়নি বলে। আর হলেও করতাম না। কেন জান ?

পরাণ তার দিকে তাকাল।

—বিয়েতে আমার বিশ্বাস নেই। আমার যোগ্যতাও নেই। আমি আমার স্বভাবের হাত ধরে চলি। লোভ হলে চেপে যাই না। তুমি কি আমার কথা শুনছো ?

—বলুন

—কিছু বুঝছো ?

—না।

—আমি ভেবেছিলাম ফুলঝুরি আমার সঙ্গে খেলতে চাইছে। জখম হওয়া বাঘিনী শিকার করা, আর চোট পাওয়া খেলুড়ে মেয়ের সঙ্গে হাডু ডুডু বেশ মজার।

—আপনি বাঘ শিকার করেন বুঝি ?

—আমি ? বাঘ ? শিকার ? হোঃ হোঃ। তুলনা দেবার জন্যে বললাম। তুমি তো আচ্ছা লোক পরাণবাবু—

—বললেন যে।

—তোমার ইয়ে কিন্তু একেবারে ফ্রেশ ভেজিটেবল। গ্রীন ফ্রম দা গার্ডেন। ঐসব মেয়ে মাইরি খুব ঝামেলা। মন খারাপ হয়ে যায়। খেলা হচ্ছে খেলা। তার বেশী তো আর নয়—, নয়কি ? তোমার কি মন খারাপ হয়েছে পরাণ বাবু ? এ'সব কিছু না হে। এমন তো হয়েই থাকে। শোন, তোমাকে একটা গল্প বলি। গল্প নয়, সত্যি। অন্ততঃ লোকেরা সাতশ পঞ্চাশ বছর ধরে এই গল্পটাকে সত্যি বলেই জানে ও অন্যকে শোনায়। তুমিও শোন।

—চেষ্টার ফিল্ড বলে একটা জায়গা আছে ইউ. কে. তে। ইউ. কে জানত ? বিলেত ? সাহেব ? যাক্, সাহেব আর বিলেত এই দুটো তুমি বোঝ তাহলে! সেই সাহেবদের দেশ ইংল্যাণ্ডে চেস্টারফিল্ড বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে একটা পুরনো চার্চ আছে। চার্চটা কি হলো জানো, আমাদের যেমন মন্দির, সাহেবদের তেমনি গির্জা, চার্চ। আমরা যেমন পুজো

তলায় কিম্বা মন্দিরে অঞ্জলি দি, ওরা তেমনি রোববার রোববার গির্জায় গিয়ে অঞ্জলি দেয়। বিয়ের দিন ওদের বরকনে গির্জায় যায়। গির্জাতে ওদের পুরুত বিয়ে দেয়। এই হল ব্যাপার। তা চেষ্টার ফিল্ডের গির্জা হাজার বছরেরও বেশী পুরোন। সেই চার্চের মাথা সরু হয়ে অনেক উঁচু হয়ে ওপরে উঠে গেছে। তাজ্জব ব্যাপার কি জানো, ওই গির্জার মাথা একদিকে বেশ হেলে গেছে। কতদিন ধরে একদিকে হেলে আছে জান? সাতশ পঞ্চাশ বছর। তার আগে মাথা সোজা ছিল। সাতশ পঞ্চাশ ধরে মাথা একদিকে হেলান। এই নিয়েই গল্প। সাতশ পঞ্চাশ আগে একদিন বিকেলে যখন হঠাৎ দেখা গেল মাথাটা একদিকে হেলে গেছে, তখন সেখানকার লোকেরা সবাই খুব চিন্তিত হয়ে এর কারণ খুঁজতে লাগল। অনেক গবেষণা করে ওদের পাদরীরা, মানে সাতশ পঞ্চাশ বছর আগে সেখানের লোকেদের পুরুতরা বলল যে, এই হেলে যাওয়ার কারণ হল একটা বিয়ে, যেটা সেদিন সকালে ওই গির্জায় হয়েছিল। জানা গেল যে সেদিন সকালে যে মেয়েটির ওই চার্চে বিয়ে হয়েছিল, সে ছিল সত্যিকারের কুমারী। পাদরীরা আরও বলল যে এ নিয়ে চিন্তার কোন কারণ নেই—, আবার যেদিন ওই গির্জায় আবার কোন জেনুইন কুমারী মেয়ের বিয়ে হবে, ওই গম্বুজ আবার আগের মত সোজা হয়ে যাবে। তার পর সাতশ পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে। এর মধ্যে কত হাজারহাজার কেন, কয়েক লাখ বিয়ে হয়েছে ওখানে। কিন্তু গম্বুজ যেকে সেই। হেলে আছে। আর গল্পটা লোকের মুখে মুখে চলছে। তুমি কিছু বুঝলে?

—আমরা এসে গেছি

—আরে হ্যাঁ, তাইত। এতো দেখছি স্টেসনে পৌঁছে গেলাম। তোমায় এই গল্পটা কেন বললাম বলত? তুমি তো ওকে ভালবাস পরাণ বাবু—

—বিয়ে বুঝি খালি মেয়েদেরই হয়?

—তা কেন? বর আর কনে, দুই নিয়ে বিয়ে। তবে গল্পের বিষয় হল ভারজিন ব্রাইড। কুমারী মেয়ের কুমারীত্ব—

এই বলে কবি খুব অন্তরঙ্গ ভাবে পরাণের কাঁধে হাত দিল। আর হাত দেবা মাত্রই নিজের শরীরের ভার সামলাতে না পেরে অনেকটাই গড়িয়ে নেমে গেল সে। কারণ ইতিমধ্যে গারোয়ান দুটি মোষ খুলে গাড়ি নিচে নামিয়েছে। যে ভাবে গরুমোষের গাড়ি নামায় আর কি।

কবি বলল, দাঁড়াও পরাণবাবু। গল্পটা শেষ হলেও গল্পের মজাটা শেষ হয়নি। সেটা তোমায় বুঝতে হবে। ওয়েট স্যর, আমি টিকিট কেটেই আসছি। আমি তোমাকে রিলিফ দিতে চাই। অনেষ্টলি।

টিকিট কেটে, আবার পরাণের কাছে এল কবি। সিগারেট ধরিয়ে বলল, তাহলে গল্পটার মানে কি হল?

পরাণ সম্পূর্ণ ভাবলেশ হীন।

—মানেটা কি হল তাহলে? কুমারী নয়, মানে কি? সবাই কি সতীত্ব খুইয়েছে? সতীত্ব মানে শরীর আর কি! সবাই বিয়ের আগে শুয়েছে? আদৌ তা নয়। মানেটা আলাদা।

—আমি তাহলে যাচ্ছি।

—আরে দাঁড়াও না। মানেটা তো বোঝ। শরীর কিসসু না। শরীর ধুয়ে ফেলা যায়। কিন্তু মন? মনই হল আসল। মনের দিক থেকে মানেটা হল, কোন মেয়েই ঠিক যাকে বলে—হেঃ হেঃ। এই হল মানে। বি স্পোর্টিং পরাণবাবু।

—আপনার বাড়ি কি বিলেতে?

—কোন দুঃখে?

—আপনি কি সাহেব?

—কি জন্যে? ওহ্‌হো, তুমি ভাবছ এটা সাহেবদের গল্প বলে কেবল সেখানকার মানুষ আর সমাজের ব্যাপার। সাহেবদের যা, তা আমাদের নয়? তা নয় মাইডিয়ার পরাণ দা, এটা সব মানুষের ব্যাপার। কুমারী কথাটার মানে ভাবলে, মনের দিক থেকে দেখলে সব মেয়েই—, মনে মনে দেওয়া কিংবা চাওয়া মানেও তো, নয়কি? বিগ ব্রাদ্রার, কি বলতে চাইছি, তুমি বোঝ! তাহলেই সব খুশিসে ভুলবে—

—আপনার মা-ও কি তাই?

—কি বললে?

—আপনার মা-ও কি তাই?

—তুমি আমার মার কথা বললে কেন?

—আপনি যে বললেন সব মেয়েই? আপনার মা-ও তো মেয়ে—

—ব্লাণ্ট, ব্ল্, ব্যস্—টা—ড্

থুতু ফেলল পরাণ।

—থুতু ফেলছো তুমি? য়ু প্যারাসাইট—

—আপনার পায়ের কাছে কাঁচা গু।

পরাণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গীতে এগিয়ে আসতে গিয়ে পিছিয়ে গেল কবি। তার পায়ের পাতার নীচে মানুষের মল।

শুধু শরীরের ময়লা।

ট্রেন আসার ঘণ্টা বাজল তখন।

কবির গাড়ি আসছে। কলকাতার গাড়ি।

১৪

।। বাগেশ্বরের ঘোড়া যেখানে খুশি যেতে পাবে।।

—মামা, একটা গল্প বলো।

রাতে, পাশে শুয়ে প্রতিদিন এই কথা বলে বাকু।

—ও, পরাণ মামা!

কটা আর গল্প জানে পরাণ! সেই বাঘ আর বক। সিংহ আর ইঁদুর। শেয়াল আর আঙুর ফল। মাসী, তুমিই আমার ফাঁসির কারণ। এইসব। আরও মাত্র দু'একটা গল্প। বারব্রত আর পাঁচালির গল্প সে বেশক'টা জানে। ওসব বলতে চায়না সে। শুয়েশুয়ে আবার ঠাকুরের গল্প? পুকুরে একটা ডুব দিয়ে, কাপড়ছেড়ে, শুদ্ধি হয়ে তবেইতো ঠাকুরদেবতার গল্প বলা যায়। ঠাকুরের কথা ভাবলেও যে কত নিয়ম, নিষেধ, বাধা আর জড়তা পরাণের মনে। ফলে বলাগল্প, আবার বলতে হয়। বকেরমত ঠোঁট নামায় পরাণ। বাঘের মত হাঁ। ঘড়ঘড় করে গলাসাফ করে। বাঘের পার্ট করার মত গলায় বলে, আবার বকশিশ চাইছিস? যা। যা। তোকে খেয়েফেলিনিকো, এই তোর বাবার ভাগ্যি। হা-লু-উ-উ-ম। খিলখিল করে হেসে ওঠে বাকু।

অন্ধকার মাটির ঘর। শীতকাল বলে দরজা জানালা বন্ধ। আলোর কণাও নেই। তবু বাকুকে স্পষ্ট দেখতে পায় পরাণ।

গল্প বলতেবলতে কেমন যেন আড় ভেঙে যায় পরাণের। শরীর সচল হয়ে যায়। যে মানুষটা গত তিরিশ বছর ধরে একটুএকটু করে নিজেকে গুটিয়ে, কুঁকড়ে, আড়াল করে রাখে, সে নিজেকে মেলে দেয়। বেঁচেথাকার একটা মজা পেয়েযায় ট্যারাচোখে ছানিপড়া পরাণ। সেই ফাঁসির গল্পটা বলার সময় সে হাঁ করে দেখায়, রাখাল কতবড় হাঁ করেছিল। নিজের হাঁমুখ আনে বাকুর কানের কাছে। তারপর মুখ একটু সরিয়ে নিয়ে 'কট্' করে শব্দকরে পরাণ। মাসীর কানকাটা হয়ে গেল। হি হি করে হাসতেহাসতে বাকু বলে, দাও, দাও, কানটা আমায় দাও। কোন কোনদিন কাটা কান হাতে উঠে দাঁড়ায় বাকু। জানালার কাছে যায়। ঢিল ছোঁড়ার মত হাত ছোঁড়ে। কানটা সে ছুঁড়ে দিল। কোন কোনদিন আঙুরক্ষেতের শেয়ালহয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে দেখায় পরাণ। পাশে বাকুও লাফায়। হাততালি দেয়। হাসে।

—পরাণ মামা, তুমি বাঘ দেখেছ ?

হারে কপাল। সে-কি আজকে ? পরাণ বাঘ দেখেছে জীবনে তিনবার। প্রতিবারই শিবরাত্রিতে বর্দ্ধমানে, মহারাজার ১০৮ শিবমন্দিরের মেলায়। শিবরাত্রির মেলা চলে আট দশ দিন। তাঁবু খাটিয়ে খাঁচায় জানোয়ার দেখায় দু'চারটে। আগে দেখাত। হয়তো এখনো দেখায়। কে জানে। সেসব তা আর কিছুই মনে নেই। তবু বাকু ছাড়ে না।

—বলনা পরাণ মামা

—দেখেছি

—কেমন দেখতে ?

বাঘের বর্ণনা করতে হয়।

—খুব জোর বাঘের ?

—খুব।

—বাঘ উড়তে পারে না কেন ?

—ডানা নেই যে।

—নেই কেন ?

—ভগবান দেয়নি

—কেন দেয়নি ভগমান

—ভগমান নয় বাকু, ভগবান

—সব বুঝি ভগবান দেয় ?

—আর কে দেবে তাহলে।

—আর বক ?

—বকের কি ?

—বকের ডানাও ভগমান দিয়েছে ?

—ভগমান নয় বাকু, ভগবান, মান নয়, বান—

—ডানাও ভগবান দিয়েছে ?

—হঁ্যা

—কিন্তু বাঘ যদি বককে ধরে ? কি হবে তালে ?

পরাণ বলতে পারত 'জানিনা যা।' কিন্তু তা না বলে বলল, বক চেষ্টা করলে বাঘ তাকে ধরতেই পারবে না।

—কেন ?

—যে চেষ্টা করে ভগবান তাকে ঠিক বাঁচিয়ে দেয়।

—বক তাহলে বাঘকে হারাতে পারবে ?

—বাঃ। বাঘেরগলা থেকে বক হাড বারকরেছিল না ?

—কিন্তু বাঘটা তো ওকে—

—সে বাঘ হল পাজী। বককে ধরতে তো আর পারেনি—

—ভগবান সবাইকে জোর দেয় ?

—চেষ্টাকরলেই দেয়।

—আমাকেও দেবে ভগমান

—ভগমান নয় বাকু, ভগবান। বাকুর উচ্চারণ শুদ্ধি করে দেয় পরাণ। ভগবান উচ্চারণ সে ঠিক ঠিক জানে। অথচ লেবুকে সে নিজে বলে নেবু। যাচ্ছি বলে না, বলে যাচ্চি। এমনি কত কি। এগুলোও যে একধরণের ভুল তা পরাণ জানেই না। যেটা জানে, সেটা শুধরে দেয়। বারবার। ওযে বাকু !

—আমাকে দেবে ? ভগবান ?

—কি দেবে ?

—জোর।

—নিশ্চয়ই দেবে।

কি করে যে কথাটা বলে ফেলল পরাণ। আর বলেই বুকের ভেতরটা কেমন হাল্কা হয়ে গেল তার। কি আশ্চর্য অভয়! কি ঠাণ্ডা শান্তি!

আবার অন্য কোনদিন বাকু বলে, আঙুর কি গো পরাণ মামা?
—রোজশুনছিস। একটা ফল।
—কেমন দেখতে?
—এতটুকুটুকু
—কেমনখেতে?
—মিষ্টিমিষ্টি আবার কোনটা যম টক
পরাণ কখনো জাত-সরেস আঙুর খায়নি। গুধারে গ্রামে পুজোর থালায় যে আঙুর আসে কালেভদ্রে, তা হয় নিতান্ত অম্ল অথবা স্বাদহীন পানসে।
—আমায় আঙুর দেবে?
—দোব।
—কবে?
—গাজন আসুক। ফলের দিন দোব।
—কে দেবে? ভগবান?
—দূর বোকা। দেখিস নি, ফলের দিন অনেকে ভকৃতেদের ফল খেতে দেয়।
—ভকৃতে কি?
—যারা গাজনের সন্নেসী হয়, তাদের ভকৃতে বলে
—কি ফল দেয়?
—অনেক
—কি?
—ডাব, কমলা'নেবু', কলা, নারকোল, শসা, আম, আঙুর, তরমুজ,—যে যেমন পারে, কত্ত ফল
—সব ভকৃতেদের জন্যে?
—সব?
—ভকৃতেরা খায়?
—খাবে না? খুব খায়।
—পরাণমামা
—কি?

—আমি ভকৃতে হবো।

এ এক স্বর্গরাজ্য। শুধু দুজনার।

প্রতিদিন এই ভাবে কথা বলতেবলতে একসময় বাকু ঠিকই হাত রাখে পরাণের বুকের উপর। উঁচুউঁচু পাঁজরের হাড়। পরাণের বুকে যেখানে বর্ণ কালচে খয়ের আর পুঁতির মত উঁচু, তারওপর হাতরেখে, তবেই বাকু ঘুমিয়ে যায়। পরাণ জেনে গেছে, বাকু তার মার কাছেও এমনি করে শোয়। বাচ্চারা কোন কথা গোপন করতে জানে না। প্রথম প্রথম খুব অস্বস্তি হত। এখন এটাও একটি অপেক্ষা।

—সন্নেসী তোমার কে হয় পরাণ মামা?

—কেউ না।

—তোমায় তো ডাকল। মামা বুঝি পুজো করতে পারে না?

—তুই ঘুমো

—তুমি সাপটা দেখেছিলে?

—হ্যাঁ।

—মামাকে যদি সাপটা কামড়ে দিত!

—কামড়ায়নি তো

—আমার খুব ভয় করছিল

—কেন?

—সাপ কামড়ায় তো। মরে যায় তাহলে।

বাদলকে বাকু চিনতে পারেনি। শুধামডিতে সে ছিল তিনবছর বয়স পর্যন্ত। পিতৃবিয়োগের পর তার মা নানা কাজে অনেকবার শুধামডি গেলেও, সে, সেই যে তার মা আর দিদিমার সঙ্গে, শুধারে চলে এসেছে, তারপর আর একবারও সেখানে যায়নি। ফলে তার স্মৃতিতে শুধামডির অনেক কিছুর ওপরই পর্দা পড়ে গেছে। পুরু আস্তরণ।

তবু বাদলকে ভোলার কথা নয় বাকুর। যে লোকটা,—কালচে নীল প্যান্ট আর কামিজ গায়ে—তার মার সামনে দাঁড়িয়ে আচমকা পকেট থেকে সাপ বার বরত; আর তার মা ছুটে বেড়াত, তাকে বাকুর ভোলার কথা নয়। কিন্তু একমাথা ঝুমরি রুখো চুল, সারা মুখে দাড়িগোঁফের লতানো জঙ্গল, গেরুয়া লুঙ্গি—বাদলকে সে একটুও চিনতে পারেনি।

কিন্তু সকালে নেপপুকুরপাড়ে সন্ন্যাসী দেখতে মা দিদিমার সঙ্গে বাকুও গিয়েছিল। বাচ্চারা সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে। সেও দেখেছে। তারপর সারা দিন ঘরেবাইরে গাঁ-জুড়ে এই সন্ন্যাসীর কথাই হয়েছে। তারও কিছু-কিছু শুনেছে বাকু। তাই আজরাতে শুয়ে অন্যগল্প নেই।

—তুমি পড়ে গেল কেন পরাণ মামা ?

—কি জানি।

—তোমার গায়ে জোর নেই ?

—ঘুমো এবার।

—নারকোলের জল খেতে ভাল ?

—ভাল।

—ওই সন্নেসী আবার আসবে ?

পরাণ চুপকরে থাকল।

—বলো না, আবার আসবে সন্নেসী ?

বাকু অনেক ঘন হয়ে এসেছে পরাণের বুকের কাছে।—ও পরাণ মামা,

—সন্নেসী আর আসবে না।

—কেন ?

—মাধবদা নিজে পুজো করবে এবার

—কোথায় ?

—মন্দিরে

—আর নেপপুকুরপাড়ে ?

—ওখানে আবার কি !

—মামা মন্দিরে পুজো করলে কি হবে ?

—বাবা ওর ঘোড়া ছুটিয়ে দেবে।

—বাবা বগেশ্বর ?

—হ্যাঁ তো।

—সবাই জানতে পারবে ?

—হ্যাঁ।

—কি করে জানবে ?

মাঝরাত্তিরে রাধাপুকুরের দিক থেকে সাঁ সাঁ করে ডাকতেডাকতে ছুটে আসবে হাওয়া। ঝাঁকবেঁধে পালাবে সব জোনাকি। সব ব্যাঙ লাফ দেবে

পুকুরে। সব কুকুর চুপ। বাঁশবনে যেন বাঁশগুলোকে ধরে কে ঝাঁকাচ্ছে। এইভাবে বাগেশ্বরের মাঝেমাঝে জেগেওঠা সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাসের গল্প বলতে লাগল পরাণ—

তখন যদি কেউ জেগে ওঠে, তাহলে সে কিছুতেই মন্দিরের দিকে তাকায় না। দেবতা জেগেছেন। দেবতা মন্দিরে আসছেন। ওদিকে তখন মুখ করতে নেই। তখন মন্দিরের মাথার ত্রিশূল থেকে, মনে হয়, এক জোড়া প্যাঁচা খুব ডাকছে। ঝনাৎ করে শব্দ হয় মন্দিরের কাঠেরদরজায়। শিকল আপনি খোলে। ভগবানকে তো হাতে করে তালা, শিকল এসব খুলতে হয় না। তারপর মন্দিরের চাতালে শোনা যায় ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ।

—কেন?

—বাবাবাগেশ্বর তার ঘোড়ায় চাপে।

—তুমি দেখেছো?

—হ্যাঁ

—কেমন দেখতে ঘোড়া

—কালো

—কোথায় থাকে ঘোড়া

—মন্দিরে। তুইও দেখেছিস

—ওটাতো মাটির

—ওই ঘোড়া

—জ্যান্ত হয়ে যায়?

—হ্যাঁ

—কোথায় যায়?

—যেখানে খুশি

—নেপপুকুর?

—এক লাফে নেপপুকুর চলে যাবে। বদ্দোমান চলে যাবে। পৃথিবীর যে কোন জায়গায় যেতে পারে, আকাশেও—

একেবারে পরাণের গায়ে লেপটে আছে বাকু। তার নিঃশ্বাস লাগছে পরাণের গলার কাছে।

—পরাণমামা, তুমি বাবাবাগেশ্বরকে দেখেছো?

পরাণ চুপ করে থাকল।

—পরাণমামা

—দেখেছি

—আমায় দেখাবে ?

—দেখাব।

বাকুর হাত চলে এসেছে পরাণের বুকে।

হল কি পরাণের ? সে বাকুকে বাবাবাগেশ্বর দেখাবে ?

একটা সামান্য ছ'বছরের ছেলের মধ্যে কি অসাধারণ ক্ষমতা আছে! ব্যাথা পাওয়ার অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছিল পরাণ। বেঁচে থাকার ব্যাথা আর যন্ত্রণা আবার ফিরে পাচ্ছে সে। কে তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে এসব ? বাকু। বাচ্চা বাকু। ফোঁটায় ফোঁটায়।

বাকু ঘুমিয়েগেলে এইমাত্র বাইরের দাওয়ায় এসে বসল পরাণ। দেওয়ালের ঠাণ্ডা তার পিঠে ছ্যাঁত করে লাগল।

১৫

॥ মা, তোমাব মুখ আমি ভুলে গেছি ॥

শরীরে কোনজায়গা অসাড হয়ে গেলে তাকে মহাব্যাধি বলে। পরাণের ভেতরটাই যেন অসাড হয়ে গিয়েছিল। যন্ত্রণাহীন। আস্তে আস্তে সেই মহাব্যাধি সারিয়ে দিচ্ছে বাকু। সেরে যাচ্ছে। আবার 'বোধ' হচ্ছে। আবার অনুভূতি জাগছে পরাণের। সব চেয়ে বড কথা আবার তার যন্ত্রণা হচ্ছে। যন্ত্রণা। জীবন নিয়ে যন্ত্রণা।

মার খেতেখেতে মার খাওয়ার যন্ত্রণা বোধও যে হারিয়ে ফেলে, সে যখন আবার ফিরে পায় এই যন্ত্রণা, তখন সে-ই জানে, এ যন্ত্রণা কত মধুর, কত দরকারী এই যন্ত্রণা, শুধু বেঁচেথাকার জন্য। পরাণ ব্যাখ্যা জানে না। বিশ্লেষণ জানে না কিন্তু সে মানুষ। যন্ত্রণা জানে। একদিন যন্ত্রণা ছিল তার। তার সব যন্ত্রণা একটু একটু করে মরে গিয়েছিল।

আবার পরাণের যন্ত্রণা হচ্ছে। এ'যন্ত্রণা আগেরমত নয়। অন্তরকম। তার অসুখটা যেন সেরে যাচ্ছে ভেতর থেকে।

যন্ত্রণার এই জাগরণ, জেগে ওঠার এই ক্ষতবিক্ষত নোনা স্বাদ বড় তীব্র আর মধুর। কত কি যে মনে পড়ে যায় পরাণের। স্মৃতিতে সোরগোল ওঠে। যেন তার ছেলেবেলা তাকেই হাত ধরে টানছে। আগইবাড়ি। তার গ্রামের নাম। পরাণের গ্রাম। একদিন ছিল। পুরুলিয়া জেলার রাম কানালি স্টেসনে নেমে বাসে করে রঘুনাথপুর। রঘুনাথপুর থেকে আগই বাড়ি। সে কি এখানে? বার মাস খরার জায়গা। খরা বড় ভীষণ গো। এইমাত্র বাইরে এসে বসেছে পরাণঠাকুর। আজ এখনও তার বিড়ি ধরানো হয়নি। এই নির্জন রাত্রে, বহুদিনপর তার ফেলেআসা নিজেরগ্রাম ও বাড়ি আর মাকে মনে পড়ে গেল। মা। চোখের জলে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে চারদিক। মাকে মনে পড়ে। মা। মা। মা। কিন্তু মার মুখ মনেকরতে পারছে না সে। স্মৃতিথেকে সরে গেছে গ্রামের রাস্তা। পরাণ শিশুর মত ক্রন্দন করতে লাগল।

আগইবাড়ি। তুই কোথায় চলেগেলি মা আমার।

শুধারে থেকে বর্দ্ধমান। বর্দ্ধমান থেকে আসানসোল। ট্রেন বদলে বার্নপুর। দামোদর। রামকানালি। একেবারে কু ঝিকঝিক দিয়ে গাড়ি চলে যাচ্ছে পরাণের মাথারভিতর দিয়ে।

কু ঝিকঝিক আর কয়লারধোঁয়ার কথাই মনেআসছে পরাণের। ত্রিশবছর আগে যখন সে এসেছিল, তখন ধোঁয়া উঠত রেলের এনজিনে।

ত্রিশবছর আগে ছোটমার হাতধরে আগইবাড়ি থেকে যেবার প্রথম এল, কথাছিল, তখন সে এক বছর বাড়ি যাবে না। আসার ক'মাস পরেই পুজো এসে গেল। হঠাৎই একেবারে অন্যরকম হয়ে গেল আকাশ। সেদিন দুপুরে রায়বাড়ির ঠাকুর দালানে ঠাকুরের গায়ে রংওঠা আর সিংহের কেশরলাগান দেখছে ১৪ বৎসরের পরাণ।

ত্রিশবছর আগের সেই চোদ্দবছরের ছেলেটাকে, আজ এইমুহূর্তে অবিকল দেখতে পাচ্ছে পরাণঠাকুর। অনেক, অনেকদিন পর। হাঁটুপর্যন্ত ময়লা মোটা থানধুতি। গায়ে ফতুয়া। ওর গায়ের ফতুয়াটা মরেযাওয়া হৃদয়-পুরুতের। শুধারে গ্রামে আসার পর ছোটমা দিয়েছে। ঢলঢল করত গায়ে। কাঁধের পাশদিয়ে ঝকঝকে পৈতে দেখা যাচ্ছে। রোজ মাজতে

হত পৈতে। না হলে ছোটমা রক্ষে রাখত না। আজও মাজে পরাণ। রোজ। এ তার নিত্য-অভ্যাস। মাথায় তেল চকচক করছে বালকের। গালে আর নাকের নিচে, ওপরের ঠোঁটে, পশমের মত হাল্কা আর নরম ঝাপসা চুল। চতুর্থিরদিন রায়েদের দুর্গাদালানে ঠাকুর রং হচ্ছে। এখনো সোলারকাজ, ডাকেরসাজ ওঠেনি। আজরাতে কিংবা কালসকালেই উঠবে। তার আগে ঘাম তেল। তারপর একসময় মায়ের চোখ। মায়েরচোখ আঁকবে কুমোর। মায়েরচোখ আঁকা দেখতে নেই। আঁকার আগে পিতিমেকে পোনাম করবে হরদাদাকুমোর। কাঁদবে। তারপর—, তারপর?

—তারপর?

—তারপর?

সেই চোদ্দবছরের ছেলেটার বুকেরমধ্যে লহমায় আকুল দু'হাতবাড়িয়ে ডাকতে আরম্ভ করেছে আগইবাড়ি: আয়, আয়। আয়, আয়। যেন পরাণের মায়েরগলায় ডাকছে। বন্ধুদের হাতছানি হয়ে ডাকছে। মজাপুকুর, ফাটামাটি, রোগাছাগলছানা সবাই ডাকছে—আয়, আয়। আয়, আয়।

হঠাৎ, হঠাৎই যেন সে টেরপেল পুজোয় তার বাড়ি যাওয়া হবে না। একবছর পর সে বাড়ি যাবে। একবছর? সে কতদিন? কোনদিন একবছর শেষ হবে না। তারভিতরটা, কাটাপায়রারমত লাফাতে লাগল। কষ্ট। বড় কষ্ট। পুজো এসে গেলে এত কষ্ট, তা সে জানত না। সেদিনসন্ধ্যায় বাগেশ্বরকে সন্ধ্যারতি দিতে গিয়ে সে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল। পাশেই বসেছিল ছোটমা। রোজ বসে থাকত। পুজো করা শেখাত তাকে। কোথাও যেন কোন খুঁত না থেকে যায়। কচিছেলে, ওকে ঠিকঠিক শিখিয়ে নিতে হবেতো! নাহলে আমার মাধুর অকল্যান। গোটা গাঁয়ের অকল্যান। এইসবকথা বলত।

পর্দা সরে গেছে। ত্রিশবছর আগের সে দৃশ্য আজও সমান জীবন্ত। হুবহু মনেপড়ে যাচ্ছে, দেখতেপাচ্ছে পরাণ। সব। তার বুকেরভেতর শব্দ হচ্ছে।

—কাঁদছিস কেন?

বালক হাউহাউ করে কেঁদে উঠল।

—শরীরখারাপ হয়েছে তোর? পেটে লাগছে?

—আমি বাড়ি যাব ছোটমা

ছোটমার কঠিনচোখ দেখতে পাচ্ছে পরাণ।

—সে কি এখেনে! যাব বললেই যাওয়া হয়?

—আমি বাড়িযাব ছোটমা

—এখানের কাজকর্ম কে করবে?

—তোমার পায়ে পড়ি ছোটমা

—তখন যে বলেছিলি এক, দেড় বছর বাড়ি যাবি না।

পরাণ আর হাতেকরে ঠিকঠিক প্রদীপ দেখতে পারছে না দেবতাকে। পঞ্চপ্রদীপের একটা সলতে পড়েগেল মাটিতে। পড়েযাওয়া সলতে দেখতে পাচ্ছে পরাণঠাকুর। হাতে করে ঘণ্টা বাজাতে গিয়ে তাল কেটেযাচ্ছে। সেই কাটাতাল শুনতে পাচ্ছে পরাণঠাকুর। শাঁখে ফু দিতেগিয়ে আওয়াজ হল না। একরাশকান্না ঠেলেউঠল বুকদিয়ে। এইবার ককিয়ে কেঁদে উঠল বালক। একদলা থুতু লেগেগেল দেবতার পঞ্চমুখী শাঁখে।

'—এ কি করছিস, এই। ছোটমার গলা শুনতে পাচ্ছে পরাণ। ওর হাত থেকে শাঁখ নিয়ে, শাড়ীরআঁচলে মুছে, তাতে গঙ্গাজলের ছিটে দিয়ে নিজেই শাঁখ বাজাচ্ছে ছোটমা। দেখতে পাচ্ছে পরাণঠাকুর।

—দাঁড়া। মাধু আসুক। তারপর বার করছি তোর বাড়ি যাওয়া। আসুক মাধু একবার।

বন্দী। বালক তা বুঝতে পারল। মানুষ তো বটেই, পৃথিবীর যে কোন প্রাণী বন্দী হলেই বুঝতে পারে। যতই আদর করো, ছোলা দাও, খাঁচার পাখিও তা জানে। বোঝে। মানুষ তো বুঝবেই। বালক। শিশু। সবাই।

বেঁধে রাখবে আমায়? ধরে রাখবে? আমি পালাব। আজ রাতেই পালাব। তার হাতের পাতা, নাকের পাটা ও চোয়াল শক্ত। বালকের কপাল দপ দপ করছে।

বাহ্‌বা। সাবাস। সেই ১৪ বছরের ছেলেটাকে বাহ্‌বা দিচ্ছে পরাণ।

বাড়ি। বাড়ি। বাড়ি! মা। মা। মা। আমার মা।

পালাব। পালাব। পালাব। মা, তোর কাছে যাব। যাবই।

আহা, অহো, শরীরে কি বল। সাহস। বুনো জিদ। পথ ঘাট ঠিক ঠিক জানে না। মাঠে মাঠে আগ্রাসী অন্ধকার। তবু পালাব। আর আসব না কোনদিন।

পালাতে হয়নি। সেদিন রাতেই মাধবদাদা এসে গেল দুর্গাপুর থেকে। ছোটমার কাছে সব শুনল মাধব। একটুও, একবারও বকল না মাধব দাদা। হেসে বলল, যাবে বইকি। পুজোয় বাড়ি যাবে না? কালই যাবে।
মাধব ওকে টাকা দিয়েছিল। লোক দিয়ে বর্দ্ধমান পর্যান্ত পৌঁছে, টিকিট কেটে আসানসোলের গাড়িতে বসিয়ে দিয়েছিল। মাধবকে দেবতা মনে হয়েছিল পরাণের। দেবতা। আসার সময় মাধবকে কথা দিয়েছিল যে লক্ষ্মী পুজোর পরের পরের দিন শুধারে ফিরবে সে। তা-ই ফিরেছিল। মাধবদাকে কথা দিয়েছিল যে।
দাওয়ায় বসেবসে সেই অন্ধকারে মোষের গলার ঘণ্টা শুনতে পেল পরাণ। এতই অন্যমনস্ক ছিল পরাণ ঠাকুর, শব্দটা যে সংলগ্ন গৃহস্থ বাড়ির গোয়াল থেকে আসছে তা তার খেয়াল হল না। তার মনেহল, কোনভাবে গোয়াল থেকে বারহয়ে প্রাণীটা সামনের অন্ধকারে কাছেই কোথাও দাঁড়িয়ে আছে। শব্দ হচ্ছে গলার ঘণ্টার। কিংবা তা-ও নয়। শব্দটা যেন তারই গলার নিচে, তারই বুকের থেকে উঠে এসে একটু দূরে তার বুকের লোম ছুঁয়ে শূন্যে ভাসছে। তাই?
লাইটার জ্বালাল পরাণ। লাইটার ধরা হাতটা সামনে অন্ধকারে বাড়িয়ে নিজের বুকের ওপর একটু আলো ফেলল।
কোথাও কিছু নেই।

১৬

॥ পরাণের প্রেম, প্রেমিক পরাণ ॥

বহুক্ষণ হল বাকু ঘুমিয়ে গেছে। আকাশের তারাদেখে বোঝাযায় রাত বেশ সরে গেছে। তবু বসেআছে পরাণঠাকুর। আজরাত্রে তার বুঝি নিস্তার নেই। আঃ। কত কি যে মনে পড়ে যাচ্ছে পরাণের। আঁচে ওথলানো দুধের মত ফেনিয়ে উঠছে কত কিছু। আবার সেই কবিকে মনে পড়ছে পরাণের।

সেই কবি চলেযাওয়ার পর একেবারেই বদলে গিয়েছিল মেয়েটা। শুধু রোগা নয়, কেমন খালি হয়ে গিয়েছিল। একাএকা কাঁদত মেয়েটা। কারও কাছে কোন কিছু গোপন থাকেনি। মাধবমাষ্টারেরমা তো জানতই। তার দুই স্ত্রীও জেনে গেল। অন্দরমহলে কি ব্যবহার বরাদ্দ হল স্মৃতির জন্য, তা পরাণ জানে না। সেই কবি চলেযাওয়ার পর টানাদেড়মাস স্মৃতিকে দেখতেই পায়নি পরাণ। তারপর একদিন স্মৃতি এল পরাণের কাছে। পরাণের কাছে তার একটা জিনিষ চাই। পরাণই তা দিতে পারে। বলা ভাল, একটা কাজ করতে হবে পরাণকে। কি কাজ? পরাণকে যেতে হবে আশুতোষপুর। সেখানে পোষ্টঅফিস। পরাণ যাবে চিঠি ফেলতে। কবিকে লেখা স্মৃতিরচিঠি। পৃথিবীর আর কেউ যেন টের না পায়।

চিঠি নয়, স্মৃতি সেই কবির ঠিকানা বাড়িয়ে দিল।

—চিঠি কই?

—তুমি লিখেদাও পরাণদা। আমার হাতেরলেখা খুব খারাপ।

—আমারও।

—তবু তুমি লেখ।

চিঠি তৈরী হল। কথা স্মৃতির। হাতেরলেখা পরাণের।

শ্রীচরণেষু,
আপনি কোনই পত্র দেন নাই। কেন দিলেন না, ভাবিয়া আকুল হইতেছি। দয়া করিয়া পত্র দিন। পত্র পরাণদার নামে দিবেন। প্রণাম।

ইতি

সেবিকা স্মৃতি।

শুধারে থেকে আশুতোষপুর, অনেক পথ মাঠে মাঠে। চলল পরাণ। কদিন পর আবার গেল। চিঠির উত্তর আসবে এই আশায়। ডাকঘর থেকে লুকিয়ে আনতে হবে সে চিঠি। এলো না। প্রতিদিন, পর পর কদিন গেল। এলো না। আবার লিখল স্মৃতি। নিজেই। খুব ছোটছোট চিঠি। যথা—'আপনার হাতেরলেখা আমায় পাঠাবেন। তাতে বুলিয়েবুলিয়ে আমার হাতেরলেখা ভাল করবো।' 'আপনার একটা ছবি পাঠাইবেন। সাবধানে থাকিবেন। আমরা ভালআছি। চিঠি পরাণদার নামে দিবেন। তাহলেই আমি পাইব। কেউ জানিবে না।'

সব চিঠি ডাকে দিয়ে আসে পরাণ। ডাক দেখে আসে। ভারী গোপন সে ব্যাপার। প্রেমের চেয়েও গোপনীয়।

এরপর একদিন সত্যিই সেই কবির চিঠি এলো। মুখবন্ধখাম আশুতোষপুর থেকে এনে পরাণ তুলে দিল স্মৃতির হাতে। খামনিয়ে একছুটে সেখান থেকে চলেগেল স্মৃতি। আবার এল পরদিনই। বলল, মানে বলে দাও পরাণদা।

সুন্দরী স্মৃতি,

তুমি খুব ভাল মেয়ে। আমি মানুষ হিসেবে অনেক ছোট। লোভের হাত ধরে চলি। বাঁচি। জখম হওয়া বাঘিনীর মত খেলোয়াড় মেয়ে ভাল লাগে। তুমি যে একেবারে বাগানের টাটকা সব্জী। তুমি যা দিয়েছ তাই নিয়ে ও তোমার কাছে আরও যা পেতে পারতাম, কিন্তু পেলাম না, তাই নিয়ে আমি ৪৬টি কবিতা লিখেছি। এটাই আমার লাভ। আর নয়। আমি তোমার ও নিজের কাছ থেকে নিস্তার পেতে চাই।...

কি মানে ?

তবু সুখ ফিরে এলো স্মৃতির চোখে মুখে। আর এক পাগলামি পেয়ে বসল তাকে। মাধবমাষ্টারের ছেলেদের—চিরদীপ, জয়দীপ এদের খাতারপাতা প্রায়ই ছেঁড়া যেতে লাগল। দুটো পেন্সিল হারিয়ে গেল ওদের। কবির লেখা সেই চিঠি, স্মৃতির হাতের লেখায় এক একদিন, এক একটাপাতায়, পরাণের কাছে আসতে লাগল। কোন কোনদিন দুপুরে, ওই সব লেখা কাগজের দলা পরাণের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে পালিয়ে গেল স্মৃতি।

এবং স্মৃতি ধরা পড়ে গেল। পাওয়া গেল স্মৃতির কাঁচালেখা ও ভুলবানানে ভরা অজস্র চিঠি। যা কোনদিন ডাকে দেওয়া হয়নি। যা পরাণ জানে না—

"—আমি কোনদিন তোমায় ভুলতে পারব না। কি করে ভুলবো! তাহলে মরে যাব আমি।"

"—আমি তোমার কাছে যাব। তোমার দাসী হয়ে থাকব। মা বলেছে, তুমি মদ খাও। শুনে আমার খুব কষ্ট হয়েছে।"

"—তুমি আমায় লাথি মারো, ঝাঁটা মারো। আমি কিছু বলব না। আমি তোমার কাছে থাকব।"

"—তোমার কাছে থেকে লেখাপড়া শিখব। আমায় দেখে কেউ হাসবে না। তুমি এসো। আমায় নিয়ে যাও। এসো। তুমি। তুমি। তুমি।"

তারপর আর মনে করতে চায় না পরাণ। সে বড় নিগ্রহের গল্প। স্মৃতিকে। তাকেও। তার প্রতি নিগ্রহের মধ্যেও, রুখে, আবার উঠে দাঁড়াল মেয়েটা। হ্যাঁ, রুখে দাঁড়াল। স্মৃতির বয়স যখন মাত্র আট বা নয়, তখন এক বোশেখের ত্বপুরে তার মা তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য বলেছিল, দাঁড়িয়ে থাক্ রোদে। স্মৃতি প্রথমে শাস্তি মানতে চায়নি। মা তাকে বাধ্য করলে, সে দাঁড়িয়েছিল। তারপর রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়তে লাগল। মা বলল, চলে আয়। আর কোনদিন করিস না। স্মৃতি নড়েনি। মা বলল, বললাম তো চলে আয়। স্মৃতি নড়ল না। মা বলল, মরবি নাকি। এত গোঁ কিসের? স্মৃতি অনড়। বেলা বেড়ে চলল। মা বলল, ঘাট হয়েছে। ওরে দেমাকী, তোর এত দেমাকের দাম কে দেবে? পায়ে পড়ি তোর। চলে আয় মা। স্মৃতি বলেছিল, আগে মনে ছিল না? যা বলেছ, তাই করবো। মরবো তো মরবো।

সেবার রোদ লেগে স্মৃতির এগারো দিন তুমুল জ্বর হয়েছিল। এই স্মৃতি। একরোখা। বলল, 'আমি পড়বো। ইস্কুলে যাব আমি। আবার।' জিদ। সেই অসম্ভব বুনো ও তেজী জিদ ওর।

শুধারে থেকে সিঁথিচেরা গ্রাম চার মাইল দূরে। সেখানে হাইস্কুলে ছেলে মেয়েরা একসঙ্গে পড়ে। ভর্তি হল স্মৃতি। শুধারে থেকে সিঁথিচেরা, সিঁথিচেরা থেকে শুধারে, বহুদিন, বহুদিন, তাকে সঙ্গ দিল পরাণ। এতটা পথ আসতে যেতে এত বড় মেয়ের সাথী লাগে। প্রায়ই।

পৃথিবীতে যে প্রেমিক তার মনোবাসিতানারীকে অন্যেরদ্বারা চুম্বিত হতে ও তীব্রবিস্ফোরণে সেই চুম্বন ফিরিয়ে দিতে দেখেছে, সে পরাণ। পৃথিবীতে যে প্রেমিক তার রমণীর ভালবাসা পায়নি, কিন্তু ভালবাসায় হরিণী হয়ে যাওয়া সেই মেয়ের ছুটে খেলে বেড়ানোর জন্য শ্যামলসবুজ বনানী হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে পরাণ।

এইতো পরাণের সারা জীবন ধরে একেরপর এক এলাকা ছেড়ে আসার গল্প।

আশৈশব। এলাকার পর এলাকা শুধু ছেড়েই এসেছে সে। পিতৃহীন বালক তার সদ্য কৈশোরে ছেড়ে এসেছে তার গ্রাম। তার মা। তার প্রেম, তার ভালবাসার এলাকা থেকেও নিঃসাড়ে সরে এসেছে সে। অন্যের জন্য সে। তার জন্য কেউ নয়। কোথাও তার জন্য সামান্যতম ভূমিও নেই, যা তার নিজের। এই হয়। শোষিত মাত্রই শুধু বাস্তুহারা নয়, সর্বঅর্থে বাস্তুহীন। তবু জাগছে পরাণ। জাগছে ছ'বছরের বাচ্চার ভালবাসায়। বাকু তাকে জাগাচ্ছে। মানুষকে জাগানোর, বাঁচানোর, জীবনে ফিরিয়েআনার অসাধারণ শক্তি আছে শুধু মানুষের। শিশুরও। আর তাই, এই নিশুতে অন্ধকারে বদর মুনসীর জলে সিঁদুরে পদ্মর মত দুলছে পরাণের ভেতরটা। এক গভীরসুখের মত, ফেলেআসা জীবনের সবদুঃখ মনেপড়েযাচ্ছে পরাণের। সব। কলকল-করা এক ভরানদীর মত গভীর সুখ হচ্ছে তার। দুঃখের সুখ।
বারে বাকু।
বাকুর পাশে শুয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল পরাণ ঠাকুর।

১৭

॥ গার্ড সাহেব, পতাকা তোল ॥

রাত ভোর হল। পাখি ডাকল। আকাশের রং বদলাল। প্রতিদিনের মত পুজোয় বার হল পরাণ। হাতে সাজি। কপালে তিলক। স্নানের পর টেরি কাটা। গায়ে মলিন নামাবলী। পরিস্কার পৈতে। হলদেটে ধুতি। মূলমন্দির বাগেশ্বরের। সেখানে পুজোতে যায় প্রায় একঘণ্টা। কোনদিন সওয়াঘণ্টাও। বাগেশ্বরের মূলমন্দির ছাড়াও গ্রামের চারদিকে--অবশ্যই গোটা গ্রাম নয়, গ্রামের যে অংশ একসময় কেবল সম্পন্ন ধনীদের অঞ্চল ছিল, এবং এখনও তথাকথিত বামুন কায়েতদের বাবু পাড়া—আরও চারটি শিবমন্দির আছে। সেগুলিও দেবত্রর অংশ। মন্দিরগুলি প্রাচীন। গঙ্গাসাগরে স্নানকরতেআসা কোন লোলচর্ম, কিন্তু স্বনির্ভর

বৃদ্ধার মত। প্রতিটি মন্দিরের ভিতরেরমেঝে আশ্চর্য ঝকঝকে আর পরিস্কার। চারদিকে ছড়ানো এই চারটি মন্দিরের জন্য এক বা একাধিক বিধবা আছেনই। তাঁরাই মন্দিরগুলির দেখাশোনা করেন। কেউ তাঁদের এই কাজ দেয়নি। জমিদারিশরিকানারও তাঁর কেউ নন। এঁরা নিজের হাতে প্রতিদিন মন্দিরের মেঝে মোছেন। মাজেন। যেমন ক্ষান্ত ঠাকরুণ। শীতল ও পরিস্কার মন্দিরের মেঝেতে কিছু পড়লে তুলে খাওয়া যায়। এইসব মন্দিরের বৃদ্ধরা যে যাঁর মন্দিরে প্রতিদিন পুজো না হলে মুখে জল দেন না। পরাণ তাই মূল মন্দিরে আসারপথে, পারলে এই দু'একটি মন্দিরে পুজো সেরে; বাগেশ্বরের মূল মন্দিরে আসে। এতে কোন দোষ নেই। শিবঠাকুর অল্পে তুষ্ট। ভোলাভালা। ক্ষান্তঠাকরুনের ধারণা পরাণঠাকুর রোজই তার মন্দিরে দেরি করে আসে। বলে, 'তোর পুজো হবে, তবেত জল খাব। একঢোক চা ঢালব গলায়।' শরীরগতিক খারাপ থাকলে এই সব বৃদ্ধাদের ছোট ছোট নাতিনাতনীরা হাজির থাকে মন্দিরে। পুজোর ফুল অন্ততঃ হাতে করে একটা নিয়ে যেতেই হবে। ভক্তির কোন ছুটি নেই। পুরোহিতেরও না।

প্রতিদিনের মত বাগেশ্বরের মূলমন্দিরে আসার পথে অন্য যে মন্দিরগুলি আছে, তাতে আজও পুজো সারতেসারতে আসছিল পরাণ। কিন্তু আজ একটা অন্যঘটনা ঘটল। পথে তাকে কিছুক্ষণ আটকেদিল কয়েকজন। তারা বলল—। পরাণ তা মনেরাখতে চায় না। মোটকথা, সবমিলিয়ে আজ বাগেশ্বরমন্দিরে পৌঁছুতে অন্যদিনের তুলনায় কিছু দেরি হয়েগেল পরাণের। আর সে আসার কিছুক্ষণ পরেই স্মৃতি এলো মন্দিরে। পরাণ তখনো পুজো আরম্ভ করেনি। করতে যাচ্ছে। স্মৃতি বলল, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে পরাণদা।

হাতে সামান্য গঙ্গাজল নিয়ে পরাণ পৈতেতে হাত দিল। তারপর বলল, কি কথা?

—এদিকে তাকাও।

পরাণ হাতে পৈতে জড়ানো অবস্থায় তারদিকে তাকাল।

—গতকাল তেঁতুলেপাড়ায় যে পুজো হল, সেই পাকুড়গাছটাকে ঘিরে একটা চালা হয়েছে, জান?

—কারা করল?

—সিডিউলরা সবাই মিলে করেছে।
—কেন?
—ওটা দেবস্থান হয়ে গেছে। কাল ওখানে তুমি আর সন্নেসী বাগেশ্বরের পুজো করলে যে।
—অমন করে কি দেবস্থান হয়?
—কেন হয় না? কাল যেমন গাছতলায় হল, তেমনি এই মন্দিরও কোনদিন কেউ শুরু করেছে। মানুষই সব করে। দেবস্থানও।
পরাণ কিছু বলল না।
—আর একটা কাণ্ড হয়েছে।
—কি
—ওরা সবাই দাদার কাছে গিয়েছিল।
—কারা?
—হারা, ফিরু, দাসপাড়ার অনেকে। ওরা দাদাকে গাছতলায় পুজো করতে বলেছে।
এই বলে স্মৃতি পরাণের চোখের দিকে সোজা চেয়ে থাকল। তারপর বলল, ওরা দাদার কাছে যাবার আগে তোমার কাছে এসেছিল। তোমায় ওখানে পুজো করতে বলেছিল। তাই না?
নির্ভুল বলছে স্মৃতি। আজ পুজো করতে আসার পথে ওরাই কিছু সময় নিয়েছে পরাণের। মন্দিরে আসতে কিছু দেরি হয়েছে তাই।
—দাদা সব শুনেছে।
'দাদা সব শুনেছে।' শুনেই ভয় করতে লাগল পরাণের।
—তুমি তো 'না' করে দিয়েছ?
—মাধবদা রাগ করেছে?
—দাদা না করেছে, তুমিও না করেছ। দাদা খুব খুশি হয়েছে।
—অ।
—পরাণ দা, কাল যে সন্নেসী এসেছিল সে আমার চেনা। তাকে আমিই আসতে বলেছিলাম।
—আমার পুজোর দেরি হয়ে যাচ্ছে।
—ছোট করে পুজো করবে আজ।
—পুজো তো ছোট করে করা যায় না।

—খুব যায়।

—ও সব বলতে নেই।

—কেন নেই? তেঁতুলেপাড়ার পুজোটাও যদি দাদা ধরে! সকালে 'না' বলেছে. আবার বিকেলে ওদের ডেকে দাদা যদি বলে, পুজোর ভার নিলুম। তাহলে? দাদাকে তো জান।

—মাধব দা তো 'না' বলেছে।

—না, হ্যাঁ হতে কতক্ষণ?

—আরও একটা পুজো? অতদূরে?

—দাদা ধরলেই তোমায় করতে হবে, মাথারদিব্যি আছে নাকি?

—সে তো হবেই

—কেন? হবে কেন?

—আমার সঙ্গে সেইরকম কথা হয়েছিল

—কি কথা!

—যতপুজো সব আমি করব

—কবে হয়েছে কথা?

—ছোটমা যখন আমায় নিয়ে এসেছিল

—ওঃ। ঠিক আছে। আজ এখন তুমি ছোট করে পুজো করো। আমার কথা আছে তোমার সঙ্গে।

—কি কথা?

—বলছি। তাড়াতাড়ি পুজো শেষ করো।

—কি হবে? সন্ধ্যেবেলায় শিবপুজো আছে। আবার কাল। একদিন ছোট করে কি হবে?

—আর কতদিন তুমি এমন করে খাটবে?

উত্তরে পরাণ একটা অদ্ভুত কথা বলল। এমন সে বলে না। বলল, যতদিন না মরি।

পরাণের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাওয়া গেল।

—শোন পরাণদা, আজ সন্ধ্যেবেলায় তুমি এখানে শিবপুজো করবে না।

—কে করবে তাহলে?

—দাদা।

—কাল তো আমি সন্নেসীর কাছে নিজে ইচ্ছে করে যাই নি। আর কোনদিন

যাব না। তুমি মাধবদাকে বলে দিও —, স্পষ্টই মিনতি জানাল পরাণ।
—দাদা বারণ করেনি।
—তাহলে ?
—আমি মানা করছি।
পরাণ নিজেকে গুছিয়েনিয়ে তাকাল বাবাবাগেশ্বরের দিকে। যথাসাধ্য শিরদাঁড়া সোজাকরে মাথাটা একটু উঁচুকরার চেষ্টা করল সে। তার কিছু গরমবোধ হচ্ছিল। যদিও এখনো বেশ ঠাণ্ডা। বিশেষ মন্দিরের ভিতর। সে কোষাকুষি থেকে আবার নিজের হাতের তালুতে জল নিয়ে নিজের মাথায় কয়েক ফোঁটা দিল। তারপর এখন ঘণ্টা বাজাবার কথা না হলেও, হাতে করে ঘণ্টা বাজাল। তারপর পাঁচটা কলকেফুল নিয়ে রাখল বাগেশ্বরের মাথায়।
—পরাণ দা আমার দিকে তাকাও।
পরাণ আঁধবোজা চোখে ঠাকুরের মুখোমুখি। স্মৃতির দিকে সে ফিরল না। স্মৃতি দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে মন্দিরের দরজা ভিতরথেকে ভেজিয়ে দিল।
—এ সব কি করছো ?
—তুমি সন্ধ্যেবেলায় পূজো করবে না আজ।
—কে করবে তাহলে ?
—বলেছি তো, দাদা।
—মাধবদার কষ্ট হবে।
—হোক।
—মাধবদা যদি আমায় তাড়িয়ে দেয় ?
—দিক।
—আমি কোথায় যাব তাহলে ? কোথায় থাকব ?
—আমার কাছে।
—পাগল।
—তুমি শিব পূজো করবে না আজ সন্ধ্যেয়।
—কেন ?
—তুমি যাবে বর্দ্ধমানের মেলায়।
—কোথায় ?
—১০৮ শিব মন্দিরে। বাদল থাকবে ওখানে।
—বাদল কে ?

—কালকের সন্নেসী। তুমি যাবে ওর কাছে।
—আমি যাব না।
—বাদল তোমায় সব বলবে। তোমায় যেতেই হবে। তুমি ভয় পেও না।
—আমি যাব না।
—আমি তোমার কাছে চাইছি পরাণদা।
—কি চাও?
—তোমার কাছে যা চেয়েছি, তাই পেয়েছি। আজ আবার চাইছি। দাও, পরাণদা। দাও। দিতেই হবে। যাবে তুমি। এই বলে, স্মৃতি মন্দিরের মেঝেতে ঢিপঢিপ করে কপাল ঠুকে বাগেশ্বরকে প্রণাম করল। তার মাথা ঠোকার মৃদু শব্দ হচ্ছিল ভুঁয়ের ওপর।
যখন মাথা তুলল, তখন স্মৃতি কাঁদছে। দরদর করে জল নামছে দু'চোখ থেকে। নিঃশব্দ।
—কাঁদছ কেন স্মৃতি?
—আনন্দে।
আঁচলে মুখমুছে, মন্দির থেকে বারহয়ে, চাতাল পারহয়ে, সিঁড়িদিয়ে নেমে-গেল স্মৃতি। আজ সে-ও উপবাস করে আছে। শিবরাত্রি।
তার মুখদেখে কিছু বোঝা যায়না।

১৮

॥ চাকাব গভীর দাগ ॥

আজ শিবরাত্রি। এখন রাত্রি প্রায় দশটা। শেষফাল্গুনে গ্রামেরপক্ষে প্রায় নিশুত।
মন্দিরের সোজা অনেকটা জায়গা জুড়ে বটগাছ ঘিরে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। এইখানে বটগাছের গুঁড়িঘিরে চারদিকে গাজনের মেলা হয়। মাঝ-খানে আলকাফ, যাত্রা হয়, ছোট আসরে। চারপাশে হামা দিচ্ছে কুয়াশা। বটগাছের পাতায় শব্দ হচ্ছে কদাচিৎ।

চারদিক বড়ই শুনশান। বাগেশ্বরের মন্দিরের ভিতরে দেবতার দিকে মুখ করে বসেছিল স্মৃতি। একা। মন্দিরের কাঠেরদরজা ভিতরথেকে ভেজান। ভিতরথেকে খিলদেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। একপাশে হ্যারিকেন রাখা। হ্যারিকেনের বিপরীত দিকে দেওয়ালে স্মৃতির মস্ত ছায়া পড়েছে। আর ছায়া পড়েছে দেবতার মূর্ত্তির ও বাগেশ্বরের নিজের কালো ঘোড়ার। এই সময় এইভাবে মন্দিরে একা বসে থাকলে ভয় পাবার কথা।

কিন্তু অনেক ভয় ডর, সে স্মৃতি, অনেক আগে ও নানা ভাগে পার হয়ে এসেছে। আসলে স্মৃতি নিজের মুখোমুখি হতে চাইছিল। অজস্র উত্তেজনা ছিল তার ভিতরে। গতকাল সন্ন্যাসী এসেছিল। এই এতক্ষণে, বর্দ্ধমানের মেলায় বাদল আর পরাণদার নিশ্চয়ই দেখা হয়েছে। কিন্তু এসব কথাও ভাবছিল না স্মৃতি। সে চাইছিল আরও অনেকটা এগিয়ে দেখতে, যেখানে পেঁাছুলে কোন অন্যায় ও পাপবোধ থকে না। সব সার্থক ও আলো হয়ে যায়। কি ভীষণ আলো ক্যাঙলা হয়ে উঠেছে মেয়েটা, শুধু নিজের জন্য নয়, সকলের জন্য। কেউ যদি জানত! জীবনের, বেঁচেথাকার মানে খুঁজেপেতেচায় ও, শুধু নিজের একলারজন্য নয়, সকলের জন্য। সকলের জন্য—, কিন্তু কেমন করে? স্মৃতি থই পায় না। পড়াশোনা তার কিছুই বলার মত নয়। দুবার পরীক্ষা দিয়েও সে এস. এফ. পাশকরতে পারেনি। কিন্তু সে যে বেশী বয়সে ছেড়ে দেওয়া পড়াশোনা আবার শুরু করেছিল, অনেক চেষ্টা করেছিল, এটা একেবারেই অন্য রকম ও বড় ব্যাপার। এখনও খবরেরকাগজ সে রোজপড়ে। অনেক বই তার পড়া হয়েছে। পেলেই পড়ে। বহু বিষয়ে সে অনেকটাই ভিতরে যেতে পারে। ২৪ বছর বয়সে স্মৃতির যখন বিয়েহল, তখন সে আগের স্মৃতির চেয়ে চাহনিতে, ভাষায়, ব্যক্তিত্বে অনেকটাই আলাদা ও অন্য। স্মৃতির স্বামী রাখোহরি চট্টোপাধ্যায়ের বয়স যদি ৪৮ না হয়ে আরও অনেক কম হত, যদি রাখোহরি চট্টোপাধ্যায় শুধামডি নামে অখ্যাত টিমটিমে স্টেসনের স্টেসন মাষ্টার না হয়ে কোন জংশন স্টেসনের ছোট চাকুরেও হত, যদি—

যদি বিয়ের পর স্মৃতির চারদিকে থাকত জীবন্ত জীবন, আকর্ষণ, সংঘর্ষ, যদি—

এই সবই যদি। নিতান্তই কল্পনা। ৪৮ বছরের স্বামী। ছোট্ট স্টেসন। চারদিকে শুধু যেন শীতঘুম। এ-ই তার বাস্তব। সে থাকল বাড়ির পালিত

খুটে বাঁধা গাভিটির মত। যারজন্য যত্ন ও আয়োজন আছে। এবং যে বিনিময়ে গৃহস্থকে অবশ্য কিছু দেয়।

বিয়ের পর স্মৃতি টের পেল তার ভিতর থেকে সেই কবি কোথাও যায়নি। রয়ে গেছে। মরেনি। বেঁচে আছে। দগদগ করছে থোকাথোকা লাল-পলাশ। বিয়ের পর স্বামীরঘরে গিয়ে প্রথম ছ'সাতদিন কেমন অভিব্যক্তিহীন ছিল স্মৃতি। স্বামীর সঙ্গে প্রথম শারীরিক সম্পর্কের সময় কেউ জানল না, তার ওপর অজস্রলালপলাশ ঝরে পড়তে লাগল। এক অশরীরি, কিন্তু তীব্র শরীরি তুমুলউন্মাদ তার ভেতরেরঘরে খিলধরে ঝাঁকাতেঝাঁকাতে কেবলই বলতে লাগল, আমাকে তোমার ভাল লাগে? বলো, বলতেই হবে, আমাকে তোমার ভাল লাগে? তার স্বামী স্পষ্ট করে বলেছিল, 'আমার মনে হচ্ছে জীবনে প্রথম পাশবিক অত্যাচার করলাম। ছিঃ।' স্মৃতি তবু কিছুই বলেনি। নিছক অভিনয়করেও সে স্বামীর মাথায়, চুলে হাত বোলাতে বা বুকে মাথা রাখতে পারত। কিন্তু অভিনয়করার মত তৎপরতাও সে হারিয়ে ফেলেছিল।

কবে কোন মাছরাঙা এসেছিল। কবে কোন চাতক এসেছিল। অকারণ। অকারণ। তবু রেহাই নেই। স্বামীর সঙ্গে রতিলগ্না যে মেয়ের জীবনে চোরাচাতক, গোপনমাছরাঙাহয়ে ঠোঁট ডোবায়, তার জীবন বড়ই কঠিন। গভীর চাকারদাগে শুধু পিছনের পথ। সামনে কি?

ফলতঃ তার দেহমন, কোনদিন সোহাগিনী হয়ে বেজে উঠল না। তারমত আর পাঁচটামেয়ের জীবনে যেমন হয়ে থাকে, স্বামীরসংসারে রাণী বা হরির লুটের বাতাসা, কোনটাই হতে পারল না সে।

যদিও রাখোহরি চট্টোপাধ্যায় মানুষটি বিশেষ গোছান ধরনের। স্ত্রী-বিয়োগের পর টানাচারবছর তিনি বিয়ে করেননি। সেইসময়ই তার দুইপুত্র-সন্তানকে—তারা তখন বেশ বড় হয়ে গেছে। কেননা রাখোহরি প্রথমবিবাহ করেছিলেন ২৩ বছর বয়সে ও চারবছর আগে যখন তাঁর প্রথমস্ত্রী মারা যান তখন তার বড় ছেলের বয়স ১৭ ও মেজো ১৪—তিনি হোস্টেলে দিয়েছিলেন। শুধু গোছানহওয়া ছাড়াও মানুষটি যত্নশীল ও স্নেহপ্রবন। এবং বেশ নরম-মনের মানুষ। তার সংসারে রাখোহরি নিজে, তারস্ত্রী স্মৃতি আর ভাগ্নে বাদল। নির্ঝঞ্ঝাট।

রাখোহরি স্মৃতিকে আদ্রার রেলের লাইব্রেরী থেকে বই আনিয়ে দিত। পুরু-

লিয়া, ধানবাদ কিংবা আদ্রা গিয়ে সিনেমা দেখে আসার জন্য বলত। মাঝে মাঝে এ কথাও বলত, দেখ আমি ঠিক তোমায় জোর করে বিয়ে করে আনতে চাইনি। তোমার মা-ই—

—হঠাৎ একথা বলছো কেন?

—আমি বুঝতে পারি যে তোমার মনে খুব দুঃখ, কোন সুখ নেই।

—দুঃখ কেন হবে?

—আমি বুঝি। বুঝতে পারি। হয়তো তোমার উপর অন্যায় হয়েছে। কিন্তু আমি ঠিক এ'রকম চাইনি। তোমার মা-ই বারবার—

—বারবার মারকথা বলে খোঁটা দিচ্ছ কেন! আমরা গরিব বলে?

—তোমরা গরিবহলে, আমিও গরিব বাপু

—তোমার রেলেরচাকরি

—তোমার দাদা হেডমাস্টার

—সে তো প্রাইমারী

—সরকারী তো

—তোমার প্রভিডেণ্ডফাণ্ড, পেনসন, ইনসিওরেন্স

—তোমারদাদার কত জমিজমা,

—বাঁধামাইনের থোকটাকা আর জমিরচাষ এক হল?

—টাকা খাটিয়ে জমি। জমি বেচলে টাকা। এক নয়?

—তবু জমারটাকা বছরবছর বাড়ে, এই বলে স্মৃতি হেসেছিল।

—জমির দাম, চালেরদামও তো বছরবছর বাড়ে, এই বলে স্মৃতির স্বামী হেসেছিল।

—চাকরির টান অন্য জিনিষ,

—জমির টানটা বলো,

—শুধামড়িতে তোমার কত মান

—শুধারেতেও তোমার দাদার কত বোল্ বোলাও.

এই বলে হাসতেহাসতে আচমকা তার হাত ধরল স্বামী। তার শরীরে হয়তো সেই পূর্বের বৈদ্যুতিক তৎপরতা নেই! কিমবা হয়তো আছে, স্মৃতি তা টের পায় না।

রতিইচ্ছায় পুরুষ মাত্রই আক্রান্ত হয়। বড়ই অসহায় লাগে তখন। বিশেষ, প্রায় পঞ্চাশে যে পুরুষের দ্বিতীয় নতুন নির্দিষ্ট নারী আছে।

আবহমান প্রজনন ক্রিয়ার হাত ধরে চলে মানুষ। রতি, আরতি হয় অথবা বিরক্তি—যার যেমন নারী।
টেনেনেওয়া স্মৃতিরহাত তখন নিজেরগালের ওপর রেখেছে রাখোহরি। স্মৃতি বলল, আমার ভাল্ লাগছে না—
—কি হয়েছে তোমার ?
—মাথাধরেছে
—কখন ?
—সকালথেকে।
—প্রায়ই মাথা ধরছে। চোখ দেখাবে ?
—খালি ডানদিক ধরেছে
—কালওতো তাই ধরেছিল
—না, কাল বাঁদিকে হয়েছিল
—টিপে দেব ?
—না। আলো নিভিয়ে দাও।
আলো নেভাল রাখোহরি।
অন্ধকার।
তার ছেলেবেলায় এক সার্কাসের তাঁবুতে একটা খেলা দেখেছিল রাখোহরি। একটা লোক গলায় লোহারতার ঝুলিয়ে, সেই তারেবাঁধা একটা খুবভারী পাথর শুধু গলাদিয়ে মাটিথেকে তুলছে।
চারদিকে খুব হাততালি পড়েছিল।
অন্ধকার ঘরে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে হঠাৎ হাততালি দিয়ে উঠল রাখোহরি।
—কিহল ? স্মৃতি জানতে চাইল।
—কিছু হয়নিতো, নিরীহ নির্বিষ কণ্ঠস্বর রাখোহরির।
—হাততালি দিচ্ছ যে
—হাততালি কোথায় ?
—ওই তো দিচ্ছ
—মশা মারছি।

এর ক'দিনপর বিকেলে ষ্টেসনথেকে ফিরে একটা খাম, স্মৃতির হাতে দিয়ে রাখোহরি বলল, এটা সাবধানে রেখ। হারিও না—

—এতে কি আছে ?

—ডুপলিকেট কপি আছে। সব খুব জরুরী কাগজ।

—কিসের ?

—আমার পি. এফ. আর ইনসিওরেন্সের নমিনি বদলে, তোমাকে করে দিয়েছি।

—এ কেন করলে ?

—নমিনি তো কাউকে করতেই হয়। যখন টাকাটা হাতেপাবে তোমার ভালমন্দ যেমনবুঝবে, করবে।

—আমি কেন করবো ?

—আমি যদি না থাকি ?

—তুমি থাকবেনা মানে ?

—যদি না থাকি। তা-ই জন্যেই তো নমিনি করা।

স্মৃতি তার স্বামীর দিকে চেয়ে থাকল।

—আরও একটা কাজ করেছি

—কি ?

—পি. এফের খানিকটা কমিট করে দিয়েছি

—সেটা কি ?

—পি. এফের খানিকটা টাকা তুলবো না। নেব না। রেলকে তা লিখে-দিলাম।

—কেন ?

—রিটায়ার করতে আর কদদিন ? তখন মাসেমাসে পেনসন পাব। না হলে বুড়োবুড়ি খাব কি ?

স্মৃতি স্থিরদৃষ্টিতে তার স্বামীকে দেখছিল।

—বালাইষাট, নিজেরকথা সামলেনিয়ে রাখোহরি বলল, তুমি বুড়ি হতে যাবে কোন দুঃখে! মুখে এসেগেল। কিছু মনে করো না—

—তুমি বুড়োহলে আমিও বুড়ি। আমি বুড়ি নাহলে তুমি বুড়ো নও। হয়েছে ?

—আমি তো এখুনি বুড়ো

—তুমি বুড়োখোকা

—আমি তোমার আগে মরে যাব। গেলেও পি. এফ. ইনসিওরেন্সের সব

টাকা তুমি পাবে। মাসে মাসে পেনসনের টাকা—
স্মৃতি তার স্বামীর মুখে নিজের হাত চাপাদিয়ে কথাবন্ধ করে দিয়েছিল।
—বলবে না এসব কথা।
—কাজটা ঠিক করিনি? ঠিকই করেছি।
—কেন বলছ এ সব কথা?
—পরমায়ুর কথা বলা যায়!
—সে তো সবারই
—তবু হিসেবতো একটা আছে। আমি যে অনেকটাই খরচ করে ফেলেছি গো—
স্মৃতি দু হাতে নিজের কান ঢাকল।
—তার চেয়ে এককাজ করি।
—কি?
—সত্যিসত্যিই ঘুম করে পটলতুলি, কি বলো?
স্মৃতি দু'হাত বাড়িয়ে স্বামীর হাত টেনে নিজের বুকের ওপর চেপে ধরেছিল। রাখোহরির হাতেরপাতার ওপর ধ্বক্‌ধ্বক্ করছিল স্মৃতির হৃদপিণ্ড। স্মৃতি চোখ বন্ধ করেছিল। সে চকিতে চোখে অন্ধকার দেখেছিল। ভগবান জানেন, রাখোহরির মৃত্যুরকথা তার কখনো মনে হয়নি। এবং তখনো স্মৃতির জীবনে বাদল ও বাদলের জীবনে স্মৃতি, কেউ কারো জন্যে বিপন্ন হয়নি।
—তুমি কাঁদছ?
স্মৃতি তার স্বামীরবুকে নিজেরমুখ ডুবিয়ে কেঁদেছিল। তার দুইচোখ থেকে অনর্গল দরদর নামছিল কান্না। রাখোহরির বুকের খানিকটা ভিজে গেল।
—এতে কাঁদবার কি আছে। কাঁদছ কেন?
তার চোখেরজলে ভিজে যাওয়া স্বামীরবুকে—একবুক ঘনলোমে, যার অনেকগুলি সাদাটে হয়ে যাওয়ায় একবুক সাদাকালো লোমে—, নিজের ভিজেঠোঁট রেখেছিল স্মৃতি। স্বামীর বুকে, গলায়, চিবুকে ও চোখে নিজে অযাচিত ও অজস্র চুম্বন করেছিল সে।
রাখোহরি তখন ভিতরেভিতরে কাঁপছে। —আজ তোমার মাথা ধরেনি তো? কথাটা বলতেগিয়ে গলা বুজে এল রাখোহরির।
—বোকা। তুমি বোকা, এই বলে স্বামীর দুইঠোঁটের ওপর সে তার দুই-

ওষ্ঠের তাপ ঢেলে দিল।

প্রদীপের শিখা বাড়ানোর জন্য সলতে উসকেদেওয়া হয়। এ তা নয়। সাবেকি স্টোভ'এ পামপকরে আনাহয় যে আগুন, এ তা-ই।

ওদের দুজনের চারদিকে সমস্ত পৃথিবী তখন শব্দহীন হয়ে গেছে। ওদের জীবনে লতায় পাতায় এই স্বাভাবিকতা সেই প্রথম।

কিন্তু ওই একদিনই। যেন হঠাৎ পথভুলে জানালাদিয়ে লাফিয়ে ঢুকেছিল কোন ভিনহাওয়া। কিংবা ভুলকরে না জেনে জলভেবে চোঁ করে একচুমুকে নেশার প্রতিক্রিয়ায় হারিয়ে গিয়েছিল স্মৃতি। শুধু একদিন।

আবার পরদিন থেকে যে কে সেই। আমানিমাখা পান্তার মত দিন। কোন কোনদিন পিঁয়াজকুচি আর লংকার সাথে পান্তানিয়ে টানাটানি। কি ভয়ংকর ক্লান্তি। কি অসম্ভব অবসাদ। দুজনেরই।

তবু স্মৃতির রান্নাকরতে ভাল লাগত না। ঘরগোছাতে ইচ্ছা হত না। সন্ধ্যাবেলায় গা ধুয়ে, কাপড় বদলে, কপালে টিপ পড়তে সে প্রায়ই ভুলেযেত। মনেপড়লেও, মন হত না।

এই ভাবে বিবাহিতজীবনের প্রথম তিন মাস যাওয়ার পর একদিন দুপুরে স্মৃতি তাদের বিছানায় শুতে এসে বালিশের তলায় একটি বই পেল। অনুমান, দুপুরে বাড়িতে ভাত খাওয়ার পর, মাস্টার বাবু, তার স্টেশনে যাওয়ারআগে, বইটি তার স্ত্রীরজন্য রেখে গেছেন। লাইব্রেরী থেকে আনানোবই, তিনি বিছানার ওপর, বালিশের পাশে রাখতেন। বালিশের নিচে রাখাট নতুন। বইটা খুবই পাতলা। স্মৃতি বইটা পড়তে আরম্ভ করল। সেই বই-এর তিন পাতা পড়া হবার আগে তার শরীরে শির্ শির্ করে এক ধরনের অনুভূতি হতে লাগল। আরও একপাতা এগিয়ে যাবার আগে সে নিজের ঘরের দরজাজানলা বন্ধ করে দিল। বন্ধঘরে শুধু সে, আর সেই বত্রিশপাতার চটি বই।

রাত্রে শোবার সময় স্মৃতি বলল, এইবই কেন রেখেছ?

রাখোহরি বলল, আর একটা আছে। দেখবার বই। দ্যাখো, এই বইটা।

অজস্র মৈথুনের ছবি আছে এই বইটায়। ছবিগুলো স্পষ্ট। বড়। নানা-আসনে। বইটার বেশ দাম।

দেখতেদেখতে নিজেকে ফুটন্ত মিছরিরদলা মনেহল স্মৃতির। কিংবা মরিচ মাখানো আধসেদ্ধ ডিমের গরমকুসুম, যেমন সেই কবি সকালে খেত। কবির

দাঁত বসলে হাল্কা ধোঁয়া উঠত ভাঙা কুসুম থেকে।

রাখোহরির মনেহল তার যুবতীস্ত্রীর রমণী শরীর থেকে এই প্রথম অন্য বাস পাওয়া যাচ্ছে।

সেই অবস্থায় স্মৃতি বলল, তুমি কি জ্যোৎস্না রাতে পুকুরের জলে চাঁদলাগা কলমীপানা দেখেছ?

ঠোঁটথেকে বোঁটা আলগা করে হাঁফধরা গলায় স্মৃতিরস্বামী বলল, আমি কি কবি নাকি?

—তবে তুমি কি?

—এই তো আমি। শুয়োর।

—আর আমি? স্মৃতি বলল।

—কি তুমি?

—ওই বইয়ে যেমন লেখা আছে।

—কেমন?

—কুত্তি। বিয়োব।

কিন্তু স্বামীর সঙ্গে এইজীবনেও ফাঁকি। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ। ফাঁকা লাগে। খিচখিচ। এক ধরনের অপরাধবোধ। তার শরীর রোজ কাতর ও প্রস্তুত হয়। কার জন্য? আরও সক্ষম, আরও রতিপটু পুরুষের শরীর চায়, তার শরীর। নিজেকে তার নিছক কামিনী ও বেশ্যা মনে হয়। স্বামীকে বেশ্যা গামী। এইভাবে বাকু পেটে এসে গেছে—

নিজের জীবন বৃত্তান্তের এইখানটায় এসে, শিবরাত্রির রাত্রে মন্দিরে একা স্মৃতি, দেবতার দিকে চেয়ে ছোট অসহায় মেয়ের মত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

এ ভাবেই স্মৃতি কাঁদে। কখনো একা। কখনো দেবতার দিকে চেয়ে। কখনো তার মার বুকে মাথা রেখে। তার বুকেরভিরের পাথর সরেগিয়ে জল বারহয়ে আসে, যেমন মাটির নিচে নিহিতস্তর থেকে উঠেআসে জলধারা। তবু স্মৃতির ভিতর ধুয়ে যায় না। তার ভিজে চোখ আবার খটখটে হয়। দৃষ্টি শূন্য। আর সে সেইভাবে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। স্মৃতি সেইভাবে দেবতার দিকে চেয়ে থাকল।

—তুমি আমায় বলো ঠাকুর, আর সবাই যেমন মন্দিরে তোমার কাছে এসে

নিজের নিজের সুখ-দুঃখ, ব্যথা, কষ্ট, চোখের জল, এমনকি পাপও নামিয়ে রেখে চলে যায়. আমি তেমন পারি না কেন ? তোমাকে মেনে নিয়েই তো, সবাই সব কিছু মেনে নেয়। মুখবুজে, চোখবুজে। আমি তা পারি না। বাইরে যা কিছু হচ্ছে, তা যাতে সবাই চোখবুজে, মুখবুজে মেনে নেয় তাই জন্যেই কি তুমি, আর তোমারমন্দির ? যে মারছে, আর যাকে মারা হল, তারা দু'জনেই তোমার কাছে সমান ? বাঃ ভগবান। যুগ যুগ ধরে তুমি শুধু এইরকম ? আর কিছু নয় ? বলিহারী তোমার ব্যবস্থা।

পাপপুণ্য, ন্যায়অন্যায়, সব কিছুর ওপর আর সবাইকার কাছে যদি তুমি সমান, তুমি যদি খালি শালগ্রাম শিলা, আগে তোমার সঙ্গেই হিসেব পরিষ্কার হওয়া চাই দেবতা। আগে তোমার বিলিব্যবস্থা চাই। যদি তোমার থেকেই সব সুখআরদুঃখ, তাহলে মাত্র কজন সুখ পাবে আর বাকি সবাই দুঃখ, তা কেন ? সবাই তো তোমায় মানে, মাথায়করে রাখে, সবাই-কার মধ্যে নিক্তির ওজনে সুখদুঃখবেঁটে ভাগকরে দাও। নাহলে কিসের দেবতা তুমি ! সবাইকার জন্য সমান ব্যবস্থা করো। সমানব্যবস্থা। একচুল বেশী কম নয়। তবে বুঝি তুমি সবাইকে সমান দেখো। সমান।

এমন সময় বাইরে থেকে খুলেগেল মন্দিরের দরজা। মা।

—এখানে একা বসে কি করছিস।

স্মৃতি উত্তর দিল না।

—কি করছিস এখানে ?

—বসে আছি।

—সন্ধেবেলায় মাধু কতদিন পর নিজে শিবরাত্রির শিবপুজো করল, শিবকথা পড়লো, তখন তো একবারও এ'মুখো হলি না।

স্মৃতি উত্তর দিল না।

—কেন এলিনা তখন ?

—আসিনি।

—পরাণকে পাঠালি বদদোমান। নিজে এলি না !

—কি করতাম এসে ?

—দাদাকে হাতে হাতে এগিয়ে দিতিস।

—দাদার ছেলেরা পারে না ?

একথার কোন উত্তর নেই মাধবের মার। সে অন্যকথায় গেল। বলল, তোর

দাদা তোকে খুঁজছে।
—দাদা ?
—হ্যাঁ।
—কেন ?
—তার অমি কিজানি।
—তুমি যাও। একটু পরে যাচ্ছি।
—এখুনি চ
—কেন ?
—মাধু আমায় পাঠালে। তোরসংগে তার কথা আছে।
—হঠাৎ ?
—ভাই বোনে কথা হবে, তার আবার হঠাৎ কি ? সারা সন্দে পুজোকরে আর শিবকথা বলে এলিয়ে পড়েছে মাধু। তোর জন্যে জেগে বসে আছে।
স্মৃতির মনেহল দাদা কিকথা বলবে মা তা জানে, কিন্তু বলবে না। কোন কৌতূহল প্রকাশ না করে স্মৃতি উঠে দাঁড়াল।
দুজনে নিজের নিজের হ্যারিকেন নিয়ে মন্দিরের বাইরে এলো।
—চাবি দে
মাকে মন্দিরের চাবি দিল স্মৃতি।
মন্দিরে তেমন মূল্যবান কিছু নেই। কিন্তু কোনক্রমে বাইরে থেকে তুলেদেওয়া মন্দিরের দরজার শেকল পড়ে গেলে গরুছাগল ঢুকে যায়। রাত্রে মন্দিরের দরজার শেকলে তালা দেওয়া থাকে তাই। এই নিয়ম।
শেকল তুলে মন্দিরে তালা দিলেন হৃদয়পুরুতের বিধবা। দু'বার টেনে নিশ্চিত নিঃসন্দেহ হলেন যে চাবি ঠিক লেগেছে। এই সব সাবধানতা তিনি ভোলেন না। এ সবে তাঁর কোনদিন, একবারের জন্যও ভুল নেই।
বহুবছর পর শিবরাত্রিরসন্ধ্যায় বাগেশ্বরের মূল মন্দিরে শিব পুজো ও শিবকথা পড়ে সত্যিই ক্লান্ত ছিল মাধব। এবং ছিল বিরক্ত ও উত্তেজিত। আজ বিকেলের মুখে স্মৃতির কথায় পরাণের বর্দ্ধমানের ১০৮ শিব মন্দিরের মেলায় যাওয়ার সময় থেকে তার বিরক্তি ও উত্তেজনার শুরু। এবং এখনো দুটোই তার ভিতরে ক্রিয়াশীল। কিন্তু ভেতরের ভাব, সে মাধব, আড়াল করতে জানে। এইমুহূর্তে যথারীতি তার মুখদেখে তার ভিতরের, বিরক্তি, রাগ ও উত্তেজনা ঠাওর করা যায় না।

তবু রক্ষা বলতে হবে যে বাগেশ্বরের মন্দিরে শিবরাত্রির শিবপুজো, সন্ধ্যায় হয়। এর একটা কারণ আছে। আগে জমিদারির শরিক ও সেবাইতদের অন্তঃপুরিকারা ও ব্রাহ্মণবাড়ির মেয়েবৌরা গরুরমোষের গাড়িতে চেপে, সঙ্গে বাড়ির কিছু পুরুষ, বালক ও জমিতেকাজকরা বলিষ্ঠ চাষাভূষোর পাহারায়—তারা অবশ্য পায়ে হেঁটেই যেত—রাত্রে বর্দ্ধমানের ১০৮ শিবমন্দিরে মেলা দেখতে যেত। রাত্রে বাগেশ্বরের মন্দিরে শিবরাত্রির পুজো হলে তো সেট সম্ভব ছিল না। ঘরের ঠাকুরের পুজো ফেলে কি দূরে মেলায় যাওয়া যায়? তাই বাগেশ্বরের মন্দিরে শিবরাত্রির শিবপুজো সন্ধ্যায়। চিরকাল যে কোন ব্যবস্থার পিছনেই একটা কার্যকারণ থাকে।

এই সময় মা আর স্মৃতি ফিরল।

স্মৃতি সরাসরি দাদার সামনে এসে বলল, তুমি আমায় খুঁজছো?

—কোথায় গিয়েছিলি?

—মা বলছিলো, তোমার আমার সঙ্গে কথা আছে।

স্মৃতি ভেবেছিল, দাদা আজ বিকেলে পুজো ফেলে পরানের ১০৮ শিব মন্দিরে যাওয়ার কথা তুলবে। বিস্ফোরণের জন্য সে প্রস্তুত ছিল মনে মনে।

মাধব সেদিকে গেল না। অনুত্তেজিত স্বাভাবিক সামান্য হেসে বলল, বলছি, অত তাড়া কিসের!

—মা বললো, তুমি আমার জন্যে জেগে আছ!

—বোস। বলছি

—বলো, স্মৃতি দাঁড়িয়েই থাকল।

—বাকুর পৈতে দোব ভাবছি।

—বাকুর পৈতে?

স্মৃতি তার দাদা, মাধব মাস্টারের দিকে সোজা চেয়ে থাকল।

—তুই কি বলিস? আমার দিকে অমন করে চেয়ে আছিস কেন?

—এত তাড়াতাড়ি কিসের!

—তাড়াতাড়ি কিরে! এটাই তো সময়।

—পৈতে দিলে কি হয়?

—তুই কি বলছিস!

—বাকুর পৈতে দরকার নেই

—জাত মানবি না তুই? কুলক্রিয়া করবি না?

—আমি তো জাত মানি না। কুলক্রিয়াও না।

—তোর ছেলে কবি হবে নাকি? সেই যে ইল্‌লুতে বজ্জাতটা এসেছিল আমাদের বাড়িতে? মা হঠাৎ চিৎকার করে উঠল।

—তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? মাধব বলল।

স্মৃতি হাসল শুধু।

—তুই কি ভেবেচিন্তে কথা বলছিস?

—তুমি শুতে যাও দাদা।

—তোর মাথায় কি ভর করেছে বলতো। আমি ঠাকুর পৈতে দোব, সামনের—

—কোন দরকার নেই দাদা, মাঝপথে মাধবকে থামিয়ে দিল স্মৃতি।

—বামুনেরছেলের সময়ে পৈতে হবে না?

—আমার ছেলে খাটবে খুটবে। তুমি এসব নিয়ে ভেব না।

শান্ত, স্থির, স্পষ্ট গলায় বলল স্মৃতি। তার কণ্ঠস্বরে, উচ্চারণে ও বলার ধরনে এক নিশ্চিত দৃঢ়তা ছিল। যেন এইপ্রসঙ্গে সবকথার ওপর পূর্ণচ্ছেদ টেনেদিল স্মৃতি। মাধব বলেছিল, তুই কি ভেবেচিন্তে কথা বলছিস?

ভাবনা চিন্তা?

নিশ্চয়ই ভেবেছে স্মৃতি। একবার নয়. বহুবার। বহুদিন তার মনের ভিতর, একাএকা, এই উত্তর তৈরি করে রেখেছে স্মৃতি। কেবল জানতো না এত দ্রুত, আজই, এইমুহূর্তে দাদাকে কথাটা বলে দিতে হবে। লোকে যেমন সংসার খরচের বাইরে, কোন বিশেষ ব্যাপারের জন্য, একটু একটু-করে জমিয়ে আলদা করে টাকা তুলে রাখে ও সময়ে বারকরে দেয়, সেভাবে জমানো কথাটা বারকরে দিল স্মৃতি। বলে দিল। কোথাও এইনিয়ে কোন নাটক আরম্ভই হতে দিল না। বলল, বাকু কোথায় মা?

—ঘুমোচ্ছে।

—কোথায়?

কোথায় আবার। আমাদের ঘরে—

আমাদেরঘর মানে, ঠাকুরঘরের স্বল্পপরিসর মেঝে। কোনদিকে না তাকিয়ে পায়েপায়ে ঠাকুরঘরের দিকে এগিয়েগেল স্মৃতি। মেঝের পাতলা বিছানায় ঘুমোচ্ছে বাকু।

ছেলেটার জন্যে কে করে দিল বিছানা? নিশ্চয়ই মা। আর কেউ নয়।

স্মৃতি জানে।

ছেলেরপাশে শুয়েপড়ার আগে স্মৃতি, দুটি বাতাসা মুখে দিয়ে ঢক ঢক করে একঘটি জল খেল। এইভাবেই শিব রাত্রির উপবাস ভঙ্গ করল সে। এবং আবার তার মৃতস্বামীকে মনে পড়ল। মনে পড়বেই। কারণ সন্তান তাদের দুজনের। কিন্তু বাকুর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত শুধু তার। বাকুর মার। নিতান্ত-একক ও নিজস্ব সিদ্ধান্ত। চাকার গভীরদাগথেকে উঠেআসছে অনেক গভীর ভাঙাচোরামাটি। চাকায়চাকায় বড়ই জীবন্ত হয়ে এই হ্যারিকেনের মৃদুআলো-জ্বালান ঘরে তার মৃত স্বামী, তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

স্মৃতি তার ঘুমন্ত ছেলের গায়ে হাত দিল।

—পরাণ মামা কখন আসবে মা?

—তুই ঘুমোসনি?

—না।

—তোর ভয় করেনি?

—করেছিল।

—তাহলে একা শুয়ে আছিস কেন?

—বড়মাইমা বকেছিল। মামাও।

স্মৃতি বড় আদরে তার ছেলেকে চুমু খেল।

—পরাণমামা কখন আসবে মা?

—এসেযাবে। ঘুমো।

—কেন গেল পরাণমামা?

—তোরজন্যে ঘোড়া আনবে।

—সত্যিকারের ঘোড়া? জ্যান্ত?

—তুই ঘুমো।

বাকু তার মারবুকে মাথা গুঁজেদিল। একহাতে জড়িয়ে ধরল মার গলা। তারপর অন্যহাত বাড়িয়েদিল তার অধিকারের অমৃত কুম্ভের দিকে, যা প্রতিটি জাতকের কাছে ঈশ্বরের দান। ছেলেকে বকতে গিয়েও কিছু বললনা স্মৃতি। বুকেরওপর চেপে ধরল।

চাকার গভীর দাগ, ঘনহয়ে, উথলে উঠল আবার।

১৯

॥ বাদল ও পরাণ ॥

পরাণের পরনে ধুতি। উর্দ্ধাঙ্গে একটি সোয়েটার। ১০বছরআগে মাধব মাস্টারের ওই বাতিল সোয়েটারটা বড়বৌদির কাছে চেয়ে নিয়েছিল সে। পরাণের গায়ে ঢলঢলে। তারওপর চাদর। আগে একটা হাতঘড়ি ছিল পরাণের। সখের। নিজের। ছ'বছরআগে আগ্রাথেকে ফেরারজন্য সে হাত-ঘড়িটি বেচে দেয়। সেই বেচেদেওয়া হাতঘড়ির দুঃখ তাকে এখনো বেঁধে। ১০৮ শিবমন্দিরের চৌহদ্দির ভিতর ঢুকতে টিকিটলাগে। স্মৃতি তাকে কুড়ি টাকা দিয়েছে। আর কিছু খুচরো।

ভিতরে বিশাল জায়গা। লম্বালম্বি ভাবে পাশাপাশি দুটি পুকুর। দুই পুকুরের চারদিকের পাড়ে অনেক ডাঙাজমি। অনেক গাছ। রকমারি। চারদিকে যাত্রীতে ভরে গেছে। শুধু মানুষের মাথা। বসেআছে। দাঁড়িয়ে-আছে। চলছে। কোথাও জায়গা নেই।

মন্দিরের ভিতর বাহির জম জম করছে। থিক থিক করছে, ভন ভন করছে লোক। দোকানের পর দোকান। আলো। লোক। লোক। লোক। স্বেচ্ছাসেবক। হোমগার্ড। খাকী পোষাকপরা মেয়েরাও ভীড় সামলাচ্ছে। মেয়েগুলির অধিকাংশের বয়স কম। খাকীর পোষাক ছাড়াও কাঁধেরকাছে রঙীন সাটিনের গোল আর লম্বা কাটা কাপড়ের টুকরো লাগান। সবাই চটপটে। ছেলেদের সঙ্গে সমান সমান। এরা হোমগার্ড—হোমগার্ড ব্যাপারটাই পরাণের পুরো অচেনা—না পুলিশ তা পরাণ জানে না। মেলায় ছড়িহাতে খাকী পোষাকপরা মেয়ে তার অভিজ্ঞতায় একেবারে নতুন। আসলে ওরা এন. সি. সি ক্যাডার। পরাণ ধরে নিল, এরা মেয়েপুলিশ।

পরাণ কোনদিন মেয়েপুলিশ দেখেনি। এইরকম?

মেলায় এসে, নিজের অজান্তে মেলাই দেখছিল পরাণ। বাবু ওলে সেও

দেখত। মেলার কোথাও, আগের মত, কিছু জানোয়ারও নিশ্চয়ই কেউ এনেছে। বাঘের খাঁচা আসেনি? এলে, বাকুকে বাঘ দেখাত পরাণ। মেলা তো থাকবে। বাকুকে মেলা দেখাতে আনা যায়না একদিন!

স্মৃতি বলে দিয়েছিল, ১০৯ নং শিবমন্দিরের কাছে বাদল দাঁড়িয়ে থাকবে তোমার জন্যে।

সারসার ১০৮ শিবমন্দির থেকে ওই ১০৯ নং বেশ অনেক তফাতে। মন্দিরের মূল চৌহদ্দির বাইরে। দিনমানে একা দাঁড়িয়ে থাকে এই মন্দির। রাত্রে ১০৯ নং বুক্কভুতুমের মত অন্ধকারে হারিয়ে যায়। এতই তফাতে যে অদূরে পিচ রাস্তায় পথচলতি গাড়িরআলো পর্যন্ত এটার গায়ে পড়ে না। শোনা-যায়, বর্দ্ধমানরাজের প্রজাদের মধ্যে জাতপাতের নিরিখে যারা ছোট, তাদেরজন্যই নাকি মহানুভবরাজাধিরাজ এই মন্দির আলাদাকরে গড়েছিলেন। আজকাল আর জাতপাতের বালাই নেই। সবকিছু সবাইকারজন্য খোলা।

ভিড়েরমধ্যে পথকরে মেলারমধ্যে ১০৯ নং খুঁজেনিতে পরাণের অনেকক্ষণ লেগে গেল। এখানেও লম্বা লাইন। নারী ও পুরুষের আলাদা।

১০৯ নং-এর কাছেও বড়বড় বাংলা হরফে সেই ঘোষণাটি আছে, যার মমার্থ হল, মহামতি বিড়লা পরিবারের অর্থানুকুল্যে এইমন্দিরের সংস্কার করা হয়েছে ও হচ্ছে, বিড়লা পরিবারের ট্রাষ্টী ইত্যাদি…

এখনকার রাজাদের নাম কি বিড়লা? এখনো রাজা আছে? পরাণের হঠাৎ মনে হল।

এখানেও একটি বড়বাক্স রাখা। বাক্সের ওপরে ফোকর। বাইরে তালা। বাক্সে কিছু দেবারজন্য একটা পকেটে হাতদিয়ে পরাণ দু'টো দশটাকার নোট পেল। খুচরোর জন্য যখন সে অন্যপকেটে হাত দিয়েছে, তখন একজন পিছন থেকে, পরাণের কাঁধে হাতরেখে চাপ দিল। যা হয়েথাকে তার ক্ষেত্রে, আচমকা ভয়পাওয়ারমত চমকে ও কিছুটা কেঁপে উঠল পরাণ।

—চিনতে পারছেন?

বলিষ্ঠ। নীল উর্দি। নীল প্যান্ট। ঝকঝকে দু'চোখ। একমাথা লতানো ঝুমরি রুক্ষ চুল। অনেকদিনের দাড়ি। না হলে চেনা যেত না।

—আমি বাদল।

পরাণ তখনো শুধু চেয়ে আছে। এবার বলল, গেরুয়া কই? ঝোলা? সাপ?

—ওসব বর্দ্ধমানের হোটেলে রেখে এসেছি। এইবলে, বাদল পরাণের হাতধরে বলল, আসুন আমার সঙ্গে।

দুজনে হাঁটতেহাঁটতে অনেক এগিয়ে গেল। মেলারভিড় পাতলা হয়ে আসছে। এখানে মাঠের মাঝখানে বাঁশ পুঁতে পর্দা টাঙানো। সিনেমা হবে। সারারাত। পুরনো স্টীল আর রংচটা পোস্টার মারা রয়েছে বাঁশের চাটাইর ওপর। অনেকদিনআগে, ঠিক কবে আর মনেনেই, ছোটমার সঙ্গে এই মেলায় এসে সারারাত সিনেমা দেখেছিল পরাণ। আরও একবার এসেছিল। সিনেমা দেখেছিল আরও একটা। সেটাও স্মৃতিতে বড় ঝাপসা।

পরাণ দাঁড়িয়ে কটা স্টীল দেখল।

—সিনেমা দেখবেন?

—না।

—আপনি সিনেমা দেখেন?

—অনেকদিন আগে দেখেছিলাম।

পরাণ একথা বলল না যে এই সিনেমারই গানেরবই এর কয়েকট পোকা খাওয়াছেঁড়াপাতা, ক'বছরআগেও তার ঘরের কুলুঙ্গিতে পুরান পাঁজির মধ্যে ভাঁজকরে রাখা ছিল। এখনো তার ছেঁড়াপাতা ওড়ে। সে তুলে রাখে।

যেখানে সিনেমা হবে, সেখানে কাছেই চারটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরাণ যখন বাঁশেরচাটাই আর চটের ওপর ঝোলানো স্টীল দেখছে, তখন মেয়েগুলি মাঝেমাঝে এদিকে তাকিয়ে হাসছিল। ওদের গাঢ় কটকটেরঙের শাড়ি। মাথায় ফুল। বোঝা যায়। বাদল বেশ বুঝতে পারছিল। পরাণ ঠাকুর ছবি-ই দেখছে। চারটি অন্যরকম রমণীকে পরাণ বোধহয় খেয়ালও করেনি।

চারজনের একজন এগিয়ে এল বাদলের কাছে। বলল, একটু নেশা দাওনা মাইরি! আছে? বড় শীত করছে যে!

মেয়েটির গলাপেয়ে পরাণ পিছনফিরে তাকাল। পরাণ তাকাতেই মেয়েটি তারকাছে সরে এলো। নিজের বাঁচোখ বন্ধকরে মেয়েটি বলল, তোমার কাছে আছে? দেবে?

—কি?

—টাকা। মোষেরগাড়ি আছে আমাদের। যাবে নাকি?

মেয়েটি পরাণের হাতধরতে যাচ্ছিল। তার আগেই পরাণের হাত ধরল বাদল। ওরা মেয়েটিকে কিছু বলল না।

ওরা আবার হাঁটতে লাগল। আরও দূরে যাওয়া দরকার। যেখানে এরাও নেই।

এখানে মানুষ জন নেই। দু'চারটে ছইওয়ালা গরু-মোষের গাড়ি এখানে ওখানে। কাটা ধানের গোড়া রয়েছে জমিতে। দূরে মেলার কোন কোন আলো, এখান থেকে, মশালের মত মনে হয়। মেলার একটানা মিহি আওয়াজ ভেসে আসছে।

নীলপ্যান্টের পকেটথেকে একটা মাফলার বারকরে বাদল তার গলায় জড়িয়ে নিল।

—আপনি তো সব জানেন, বাদল বলল।

—কি জানি?

—আজ, কেন আপনি মেলায় এসেছেন, জানেন না?

—কিছু জানি না।

—বৌ আপনাকে কিছু বলেনি!

—বৌ কে?

—স্মৃতি। কিছু বলেনি?

—না।

বাদল হঠাৎ পরাণকে প্রণাম করল।

—একি করছেন, আপনি সন্নেসী

—আমি তা নই

—তাহলে ভেক ধরেছেন কেন?

—আমি মিথ্যে করে ভেক ধরিনি। আমি দুই-ই। আমি সন্ন্যাসী। আমি সন্ন্যাসী নইও। একটা কাজ আছে। যতদিন সেই কাজটা না হয়, ততদিন এই আমার জীবন।

—মানত করেছেন বুঝি?

—মানত? হ্যাঁ, তাই হয়তো—

—কোন্ ঠাকুরের কাছে মানত কারছেন?

—তোমার কাছে পরাণ ঠাকুর

—দেবতা নিয়ে মজা করতে নেই

—বৌ আপনাকে কিছুই বলেনি ?

—বৌ কে ?

—স্মৃতি ?

পরাণ কোন কথা বলল না। বাদল বলল, আপনি কি আমারকথা শুনছেন ?

—কোথায় থাকেন আপনি ? পরাণ বলল।

—শুধামডি।

—যেখানে স্মৃতির বিয়ে হয়েছিল ?

—হ্যাঁ। আমি ওখানে রেলে কাজ করি। আপনি কি আমার আর বৌ'র ব্যাপারে কিছুই জানেন না ?

প্রতিবারই স্মৃতিকে 'বৌ' বলছে বাদল। আর প্রতিবারই পরাণের গলার কাছে দলা পাকিয়ে উঠছে।

—একটা কাজ আছে। জরুরী কাজ। করতেই হবে। আপনাকে চাই।

—কি কাজ ? এতক্ষণে পরাণ জানতে চাইল।

—বলছি। সেই কাজটা হলে, তবেই বৌ আমার ঘরে আসবে।

—আপনার আর স্মৃতির বিয়েহলে বাকু কোথায় থাকবে ?

—আমাদের কাছে থাকবে। কেন ?

—বেশ। বেশ। ভগবান তোমার ভালো করুন, এই বলে পরাণ হঠাৎ উঠে দাঁড়াল।

—একি, উঠলেন কেন ? কোথায় যাচ্ছেন ? বসুন, বলে বাদল পরাণকে আবার বসিয়ে দিল।

—পরাণঠাকুর, বাদল ডাকল।

—বলুন।

—আবার 'আপনি' কেন পরাণঠাকুর ? আমি তোমার ছোট। তোমার আপনজন—

—আমি এবার যাই

—বাগেশ্বরের মন্দিরের ভিতরে একটা ঘোড়া আছে ?

—ও দেবতার নিজের ঘোড়া।

—কালো ?

—হ্যাঁ,

—পরাণঠাকুর, বাগেশ্বরের মন্দির থেকে বাবার কালো ঘোড়া আপনাকে বার

করে নিয়ে আসতে হবে— ।

পরাণ তার নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। এমনকথা যে মুখে আনাযায়, ভাবাযায়, তাই তার স্বপ্নেরও বাইরে। পরাণের বুক ভীষণ টিপ টিপ করতে লাগল। পরাণ বলল, ও ঘোড়া কোনদিন বাইরে যায় না। নড়ে না। মাধবদাও নাড়ায় না।

—আপনি করবেন।

—এ পাপ।

—এটাই পুণ্য।

—ছিঃ।

—স্বাধীনতা চাই না আপনার?

—কার স্বাধীনতা?

—আপনার। কাল যেখানে পুজো করলাম, ওখানেই আবার বাগেশ্বরের অন্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হবে। সেই দেবতা, প্রণামী, যজমান সব আপনার হবে।

—আমার একারহলে কি পৃথিবীতে আমার মত সবাইকার দুঃখু ঘুচে গেল? পরাণ হেন মানুষের কাছে এই কথাটা শোনারজন্য বাদল তৈরি ছিল না। বাদল বলল, সব মানুষের কথা জানি না। আমি আপনার কথা বলছি—

—আমার চাই না।

—লটারীর টাকা পেলে নেবেন না আপনি?

—টিকিট কেনার পয়সাই নেই আমার। লটারী পাব কোথায়?

—কোন চাকরিপেলে নেবেন না আপনি?

—সে তো পেয়েছিলাম।

—কোথায়? কবে?

—ছ'বছর হল। অনেকদূর। আগ্রায়।

—কি হল সে চাকরির?

—থাকতেই পারলাম না।

বাদল চুপ করে থাকল। খাপছাড়াভাবে পরাণ বলল, আটদিন আগ্রার খুব কাছে ছিলাম। আমি তবু তাজমহল দেখিনি।

—চলে এলেন কেন?

—ভগবান যেমন চাইলেন। গত জন্মে অনেক পাপ করেছিলুম বোধ হয়।

—ভগবান কিছু করে না। সব মানুষ করে।

—এ'জন্মে মন্দির থেকে ঘোড়া চুরি করলে আবার পরেরজন্মে শাস্তি পাব। বাদল বলল, তাহলে বাকুকেও কি আপনি ভগবানের হাতে ছেড়ে দেবেন?

—কেন, বাকু কি করেছে।

—গত জন্মে পাপ করেছে।

—বাকু? কি বলছেন আপনি? ও খুব বাচ্চা যে—

—না হলে বলুন, একটা বাকুর ব্যবস্থা হলে কি পৃথিবীর সব বাকুর ব্যবস্থা হল।

—বাকুর কথা আসছে কেন?

—বাকুর বয়সে তুমি কি পাপ করেছিলে পরাণঠাকুর

—আমার কথা বাদ দাও ভাই।

—বাকুও তোমার মত হবে।

—কেন?

—ওর মামা কি ওকে এমনিএমনি কাছে রাখবে? পুজোর সবকাজ তুমি যেমন করছো, ওই বাকু করবে একদিন, তোমারইমতন। তুমিযেমন, তেমন হয়ে যাবে বাকু। তাই তুমি চাও?

—কেন, বাকু ওখানে থাকবে কেন?

—কোথায় থাকবে তাহলে?

—তোমার কাছে। তার মার কাছে। তোমরা যে সংসার করবে বললে

—তা হবেনা

— কেন হবেনা?

—তার আগে তোমার মুক্তিচাই পরাণঠাকুর

—আমার মুক্তি মানে কি?

—তোমার স্বাধীনতা!

—স্বাধীনতা?

—যতদিন তুমি স্বাধীন না হচ্ছো ততদিন আর সব কিছু স্মৃতির কাছে ময়লা। শুধু পাপ। তোমার স্বাধীনতাই একমাত্র পুণ্য তার কাছে। সে আর কিছু বোঝেনা!

—তোমরা বাকুকে বাঁচাও। তোমরা বাকুকে—পরাণ কথাটা শেষ করতে পারলনা।

পরাণের বুকে পাথর ভার নামছিল। তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। তার কানে

বাজছিল ছোটমার গলা, তুই থাকবি বাড়ির ছেলেরমত। মাধুর ছোটভাই। কতলোক তোকে চিনবে জানবে। কত সোনাদানা আনবি, তোর মা'র দুঃখু ঘোচাবি তুই—। উত্তেজনা ও কষ্টে পরাণ, বাদলের হাতের খানিকটা খামচে ধরেছিল। বলল, বাকুকে তোমরা ভগবানের হাতে ছেড়ে দিও না—

—তাহলে তোমারজন্যে আলাদা মন্দির চাই। ঘোড়া বারকরে আনা চাই। না হলে আমি আজীবন সন্ন্যাসী থাকবো, আর বাকু থাকবে তার মামার কাছে। একদিন বাকুও তোমার মত 'পরাণ ঠাকুর' হবে—

—বাকুরজন্যে আমায় ঘোড়া চুরি করতে হবে?

—হ্যাঁ।

—কি করে করবো?

বাদল পরাণের রোগা পিঠের ওপর তার শক্ত ও বলশালী পাঞ্জা রাখল। এরপর, ওরা দুজনে অনেক কথা বলবে।

২০

॥ মানুষ ও জন্তুর মধ্যে তফাৎ ॥

বাকু শুয়ে আছে মা আর দিদিমার মাঝখানে।

—পরাণ কখন ফিরবে? মাধবমাস্টারের মা বলল।

—আগে মানুষটাকে ফিরতে দাও।

—পাঠালি কেন ওকে?

—পরে বলবো।

—এখুনি বল।

—চুপকরো মা। কথাবলতে ইচ্ছে করে না—, এই বলে স্মৃতি ঘুমন্ত বাকুকে অনেককাছে টেনে নিল।

দুজনের কারও চোখে ঘুমনেই। রাত আরও গড়িয়ে গেল। এখন কতরাত কে জানে।

উঠে বসল মাধবমাস্টারের মা। প্রয়োজন প্রাকৃতিক। ঘরথেকে বাইরে এসে খিড়কির দরজাদিয়ে পুকুরে গেল। আকাশে ভিজে চাঁদ। চারপাশের গাছ-পালা আর মাটির ঘর-বাড়ির গায়ে যেন ছাই মাখানো। এই নির্জনরাত্রে আকাশে চাঁদ, কুয়াশা আর ছাইমাখা ঘরবাড়ি দেখে মাধবের মা'র মন আরও ভারী ও খারাপ হয়ে গেল। বহুদিনপর তার নিজের ছেলেবেলা আর পিতৃগৃহ মনে পড়ে গেল। তার বাপের বাড়ি ছিল কোন্নগরে। কোন্নগরের মেয়ে, তখনকারদিনে ক্লাস সিকস্ পর্যন্ত পড়েছিল। তার স্কুলবাড়ি মনে পড়ল না। স্কুলের একজনও বন্ধুর নাম, মুখ, কিছুই মনেপড়ল না। শুধু থেকেথেকে একরাশ কচিমেয়ের গলা আর স্কুলের ঘণ্টা শুনতে পেল সে। তার বিয়ে হয়েছিল চোদ্দবছর বয়সে। সে তার বিয়ের দৃশ্য পুরো দেখতে পেল। আর তার মনেহল, সে জীবনে কোথাও পৌঁছুতে পারেনি! তার ভাষায়, ভগবান কোথাও নিলেন না আমায়। কেন নিলে না ঠাকুর?

এই বিধবা, না তার ছেলেরকাছে, না তার মেয়েরকাছে। ছোট বেলায় তার গায়ের-চামড়া ছিল যে নাতি-নাতনীরা, তারাও অনেক দূরে। কেউ কাছে আসে না। মা আর তার মেয়ের মধ্যে যেন মাইলের পর মাইল জমি পড়ে আছে। কথা বললেই খটাখটি হয়। দুজনে কাছেএসেও, কাছে আসতে পারে না। বড়ই দূরেদূরে থাকে।

—মাধু তোর ছেলের পৈতেদেবে, তুই সেকথায় অমন করলি কেন?

স্মৃতি উত্তর দিল না।

—মামাকে মামার কাজ করতে দে। নাহলে লোকে বলবে কি?

—লোকের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই।

—পাঁচকথা বলবেই তো। তোর আপত্তি কিসের!

—আমার কথা বলতে ভাল্ লাগছেনা মা।

—ছেলের পৈতে দিবি না, একি তোর মনেরকথা?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—দাদার ছেলেদের তো পৈতে হয়েছে। ওরা কি বামুন? পৈতের কোন মানে নেই। দরকারও নেই। দেখতে পাওনা তুমি?

—কি অলুক্ষুণে কথা! তোর ছেলে কি পৈতে ছাড়া বামুন হবে?

স্মৃতি চুপ করে থাকল।

—আমি কাল সকালেই মাধুকে বলবো, সে যেমন ভেবেছে, বাকুর পৈতের ব্যবস্থা করুক।

—তারপর বাকুকে আরএকটা 'পরাণদা' বানাবে, তাই তো? তা হচ্ছে না। সামনের বছর দাদার কাছে আমরা থাকব না।

—এখন আছিস কেন? চলেযা

—যাব।

—এখুনি যা

—সময় হলেই যাব।

—তোর দাদারওপর তোর অত রোখ কিসের। তোর কপালের জন্য কি ও দায়ী। তোর বাড়াভাতে ছাই দিয়েছিস তুই নিজে, আর ওই বাদলা। মরণ—

—দাদার ঘরে আমি আর বাকু বসে খাইনা মা।

—এককথা কতোবার শোনাবি! তোর বড় টাকার দেমাক—

—আমি তোমাকেও দেখি মা।

—থাক। তোকে আর দেখতে হবে না। আমি ছেলে বৌর লাথি ঝাঁটা খাবো। তোর কথা আর শুনতে পারবো না। যা মুখ তোর—

—আমি যখন যাব তোমাকেও নিয়ে যাব মা।

—কোথায়?

—আমাদের সঙ্গে।

—তোর নতুনসংসারে আবার তোর হাঁড়ির ভাত খাব আমি? মলেও না। নষ্ট মেয়ে কোথাকার।

—ঘরে একটা বৌ থাকতে, আর একটা মেয়েকে পেটে বাচ্চাসমেত বিয়ে-করলে দাদা নষ্ট হয় না?

—ও ব্যাটাছেলে। ওর সঙ্গে তোর তুলনা? 'পুতের মুতে কড়ি—'

—তাইনাকি? এই বলে ফুঁসে উঠেও স্মৃতি চুপ করে গেল। নষ্টা ভ্রষ্টা যা কিছু মেয়েরা। নষ্ট ভ্রষ্ট বলে কিছু নেই। স্মৃতি মা'র মুখের ওপর, আঁতে ঘা দিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু নিজেকে গুটিয়ে নিল সে। নিরস্ত করল। তর্কে বা কথারহুল ফোটানোয় তার কোন উৎসাহ হল না। তার অন্য ও অনেক কাজ আছে। সে একেবারেই অন্যকথায় চলে গেল। বলল, মানুষ আর জানোয়ারের মধ্যে কি তফাৎ, তুমি জানো মা?

মা উত্তর দিল না।
—যে মুরগিটা ডিমথেকে বাচ্চাফোটানোর জন্যে তা দিতে বসে, তারকাছে যাওয়া যায়না। খ্যাঁখ্যা করে তেড়ে ওঠে। সে কি তেজ।
মা চুপ করেই থাকল।
—তারপর ছানাগুলো যখন একটু বড় হয়; তখন যদি চাল দাও, তাহলে মা মুরগি ঠোঁটেকরে চালগুলো ভেঙে দেয়। দেখেছ?
—তুই দ্যাখ।
—তারপর বাচ্চাগুলো যখন আর একটু বড় হয়, মা-ই ওদের সঙ্গেনিয়ে বাইরে আসে। আর চিলগুলো যেন ঠিক খোঁজ পায়। কিন্তু চিল নেমে আসার আগেই. মা-মুরগির ডানা টানটান শক্ত হয়ে যায়, আর কুচোগুলো চলে যায় ডানার তলায়। চিল নেমে এসেও তুলতে পারেনা। আমি দেখেছি।
—আরো ভালোকরে দ্যাখ, আর বোঝ তুই—
—কি বুঝবো?
—'মা হওয়া কি মুখের কতা, শুধু গভ্ভে ধরলে হয়না মাতা',
—কুকুর মা-কে দ্যাখো। বাচ্চা বড়হলে কেউকাউকে চেনেইনা। কিন্তু যতদিন ছোট, মার দুধখায়, ততদিন মার কি রোখ্—
—হলেই বা কুকুর। মা তো।
—আর বেড়াল-মা?
—সব এক। মা যে
—গাইগরু তার বাচ্চারজন্যে কেমন লুকিয়ে দুধ তুলেরাখে, বলো মা!
—মা যে
কিন্তু মা, মুরগি-মা, বেডাল-মা, কুকুর-মা, এরা সবাই শুধু নিজেরপেটের বাচ্চাকে ভালবাসে। শুধু নিজেরপেটের বাচ্চাকে। অন্যের বাচ্চার জন্যে তার মায়া, মমতা, দয়া, ভালবাসা কিছু নেই। কিন্তু মানুষ-মা? মানুষ মা নিজেরবাচ্চাকে ভালবেসে জানতে পারে, বাচ্চা কি জিনিস। তাই সে নিজের পেটেরবাচ্চাকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়েবেশী, ভীষণ ভালবাসলেও অন্যবাচ্চার মন্দ করেনা, মন্দ চায়না। মন্দ শুনলে কষ্ট হয়। পারলে ভালো করতে চেষ্টা করে। তাই না মা?
—আমাকে এসব কথা বলার মানে?
মানুষ আর জানোয়ারের তফাৎটা কোথায়, তফাৎটা কেমন, তা বুঝতে হবে

না? আমরা মানুষ যে—। মা-

মা কোন শব্দ করল না।

—মা, তুমি কি রাগ করলে? রাগ করোনা। বুঝে দেখো। আমি তোমায় বুঝতে বলছি।

২১

॥ মা ॥

সারাজীবনে যে কতমাইল পায়েহেঁটেছে মাধবেরমা, তার কোন হিসেব নেই। তার পায়েরশিরা কোনকোন জায়গায় দড়িরমত ফোলা আর জড়ানো। বিয়ের চারদিন পর, চোদ্দবছরের নতুনকনে, তার স্বামীর মুখথেকে মদের গন্ধ পেয়েছিল। আর সেইদিনই সেই চোদ্দবছরের কিশোরীর মনেহয়েছিল সে একটা পুরানোবাড়ির কার্নিসবিহীন ন্যাড়াছাদের আলসেতে দাঁড়িয়ে আছে। যে কোন সময় নীচে পড়ে যেতে পারে। সেদিন থেকেই তার মনেমনে পায়ে হাঁটা শুরু। কেননা সে এসেছিল কোন্নগর থেকে। শুধারেরথেকে যা অনেক, অনেকবেশী অগ্রসর। জীবনেরছিরিছাঁদ, গতি আর স্বপ্ন যেখানে শুধারেথেকে অনেকটাই আলাদা ও অন্যরকমের। হৃদয়পুরুষের আর কোন দোষ ছিলনা। নেশা চাইই। কাঁদলে স্বামীর নেশা যায়না। আদর করলে কমেনা। রাগ করে মেঝেতে আলাদা শুলেও নেশা ছোটেনা। নেশার বরাদ্দ হাতের কাছে না পেলে চালেরকুমড়ো, এমনকি ভাতেরচাল চলেযায়। সুতরাং সে স্বামীর জন্য বরাদ্দ করে।

মাধবেরবয়স যখনমাত্র ১ বছর, তখন সে তার সংসারের দারিদ্র ও অসহয়তা বেশীকরে দেখতেপায়। দেবত্রথেকে যেখানে যতটুকু পাওয়াযায়, তা নিশ্চিত করার জন্য ও সবকিছু সামলাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়ে। সামান্যক'বিঘা দেবত্রজমির কৃষিকর্ম নিজে তদারক করার জন্য সে বর্ষাকালে গ্রামের পুরুষদের মত প্রয়োজনে নিজে মাঠে যাওয়া শুরুকরে। তার পায়েহাঁটার শুরু তখন থেকে।

আর একটা জিনিস অভ্যাস হয়েযায় তার। সেটা হাত পাতা। যেটা আসলে ভিক্ষে। তবু ভিক্ষে নয়। মাধবেরমা'র হাতপাতার ধরনই আলাদা।

—মাধবকে পাঠশালায় দিয়েছি ভাই। বই, খাতা, কাগজ, কলম, বাচ্চার জন্যে একটু বেশীদুধ। আমাদেরঅবস্থা তো জানো।

মাধবের মা হাত পাততো। প্রথমে শুধু মেয়েদের কাছে। ক্রমে পুরুষদের কাছেও। তখন চাষবাস, ধানকাটা, রবি ফসলের মরসুম আর বড় পালা-পার্বণে গ্রামের সেইসব লোক, যারা শহরে থাকত, তারা বাড়ি আসত। গ্রাম-সম্পর্কে তাদের কারো বামুনবৌদি, বামুনদিদি, বামুনমাসী, কিবা বামুনমা ছিল সে। গ্রামের লোক, যারা গ্রামে থাকত তাদেরকাছে কিছু পাওয়ার ছিলনা। কিন্তু যারা যাওয়াআসা করত, তাদের কাছে কিছু পাওয়া যেত। পেত।

সে কেবলই হাত পাততো। মাধবের উপনয়ণ হয়েছিল ছোটখাট উৎসবের মধ্যে দিয়ে। মাধবেরমা'র সাধ আহ্লাদ ছিল যে। এমনকি সিঁথিচেরা গ্রামের বড়মাস্টারের কাছে প্রাইভেট পড়তো মাধব। তার মা হাতপাততে পারত বলেই।

মাধব ম্যাট্রিক পাশকরার পর দুর্গাপুরে গিয়ে, মাধবের চাকরি জোগাড় করে-ছিল মাধবের মা-ই। তার মনেহয়েছিল, এতদিনে ভাগ্যের চাকা ঘুরছে। সামনেই ভগবানের দয়া! সুখের দিন। হয়তো সেইসুখেই পেটে এসেছিল স্মৃতি। এইসময় হঠাৎ মারাগেল হৃদয়পুরুত। ভাদ্রমাসের মেঘবৃষ্টি যেন ঘিরেধরল মাধবের মাকে।

বৃষ্টি আর ধরেনা। চারদিকে শুধু জল আরজল। তার ওপর বাজ চমকাচ্ছে। সমস্তফসল বুঝি ভেসেযায়। হাঁটা। হাঁটা। হাঁটা। বাবা বাগেশ্বরের দয়ায় পরাণ এসেগেল।

এরপর মাধবের বিয়েদিল মাধবের মা। তাও উৎসব করে।

—ওর বাপ নেই। আমার তো সাধআহ্লাদ আছে। তোমরা না দিলে কে দেবে। তোমাদের সুখ উথলে উঠবে ভাই।

তবু কি থিতু হতে পারল মাধবেরমা? নিশ্চিন্ত? দুর্গাপুরে একটা কেলে-ঙ্কারী করল মাধব। সেখানকার চাকরি ছাড়তে বাধ্য হল। সব সামাজিক নিন্দার সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়াল মাধবেরমা। মাধবের দ্বিতীয়স্ত্রীকে সে

কোল তো দিলই, এমনকি একটু না দমে সে বর্দ্ধমান যাওয়াআসা করতে লাগল। একেধরে, তারমাধ্যমে ওকেধরে, ঘুরেঘুরে, মাধবেরমা, মাধবের জন্যে গুধারে গ্রামের প্রাইমারিস্কুলে কাজ জোগাড় করে ফেলল। তার মাধু হল, মাধব মাস্টার। হলো তো ?

হাঁটা। হাঁটা। অবিশ্রান্ত হাঁটা। চাই ছেলের সুখ। ছেলের ভালো। ছেলের বাড়বাড়ন্ত। ছেলের দুই স্ত্রীর আটটি সন্তানের আঁতুর ঘর থেকে ডাঁটো হওয়া পর্য্যন্ত সব করছে এই মানুষটা। কাঁথা করার জন্য কেবলই পুরনো ছেঁড়া কাপড চেয়ে এনেছে।

—এবার যখন বাড়ি আসবে, তখন মনেকরে পুরনো ছেঁড়া যাআছে এনো ভাই।

আমায় কিছু মুদ্রা দাও। আমায় কিছু দ্রব্য দাও। দাও ভাই। আমার চাইবার কপাল।

মাধবের আটটি সন্তানের ডাঁইডাঁই গু-মুত কেচেছে। পায়েরমত, তার হাতের গুলি, আঙ্গুল, এই সবই শক্ত। তার শরীর, তার হাত, পা, এসবই তার ছেলে আর ঘরসংসার ঘিরে তার স্বপ্নের দলিল।

তার বড়নাতির গোঁফেররেখা যখন ঘন হল, দাড়িতে ক্ষুর চালানোর অবস্থা, তখন একদিন এক ঝটকায় সে ছেলের সংসারে চলেগেল বাতিলের দলে। আগে তার দুইবৌ হেঁসেলে কাটাত আর সংসারের নানা কায়িক কাজে। কতৃত্ব ছিল তার। ছেলেরভাত সে দুবেলা নিজে বাড়ত। খাওয়ার সময় বসে থাকতো সামনে। যেন এই সুখের জন্যই তার জন্ম। জ্বালেরউনুনে, মাটির হাঁড়িতে, ঢিমেআঁচে মাধুবজন্য আলাদাকরে রাখা দুধে, যথেষ্ট পুরু সর না পড়লে সে দু'বৌর ওপর মুখ করত। এই মুখ করতে পারারমত সুখ, তার আর পৃথিবীতে কিছু ছিলনা।

একঝটকায় তার আঁচলেরচাবি চলেগেল, বৌ'দের আঁচলে। সে হল দুবেলার রাঁধুনী। ছেলেকে ভাতবেড়ে দেবার দরকার নেই। মাধবের খাওয়ার সময় সামনে বসে না থেকে, সে নাহয় সে সময় অন্য কাজ সারুক। সে শুধু কাজ সারুক।

আহারে ভাগ্য। সারাজীবন জনেজনে তার মাধুর এতই প্রশংসা করেছে তার মা, যে সে তার দুঃখেরকথা কাউকে বলতে পারল না।

পরাণকে ডেকে মাধব বলল, এখন থেকে পুজোয় যাকিছু পাবে, পয়সাকড়ি,

সবকিছু বৌদিদের দেবে।
—ছোটমাকে ?
—না। মাকে নয়। বুঝলে ?
—আর অন্যসব পুজোর ?
—ইতু, শনি, সত্যনারায়ণ, মনসা, শীতলা, সব। মা, তুমিও শুনে রাখো। শুনলে তো ? যেন কোন অশান্তি না হয়—
শুনেছে। সব শুনছে। বুক ফেটে যাচ্ছে তার। পাড়াপ্রতিবেশী সবাইকে বলেছে মাধবেরমা, আমি আর হাতে রাখিনি, দিয়ে দিয়েছি। যাদের জিনিস, তারা বুঝে নিক। আমি আর কদ্দিন ?
একদিন পুজোথেকে ফিরে ভেতরের উঠোনে দাঁড়িয়ে, আগেরমতই পরাণ ডেকেছিল, 'ছোটমা'। শুনে দু'বৌর কি রাগ।
—উনি ওনার ছোটমাকে ডাকছেন গো। আমাদের নয়।
—ঠিকআছে। তাহলে তিনিই আসুন। আমরা কে ?
—ভুল হয়ে গেছে বড়বৌদি। ভুল হয়ে গেছে ছোটবৌদি
—দাঁড়িয়ে থাকো ঠাকুরপো। যাঁকে ডাকছো তিনি কিংবা তাঁর ছেলে এসে নিক।
—আর ভুল হবে না। এগুলো নাও।
হাসতে হাসতে দু'বৌ এগিয়ে গেল পরাণের কাছে। নৈবেদ্যর থালা থেকে খেজুর তুলে একজন বলল, এ খেঁজুর গাঁয়েরগাছের নয় না। এইবলে নিজে মুখেদিয়ে, অন্য একটা পুরেদিল সতীনের মুখে।
—খুব মিষ্টিরে। আগে এসব ভালোভালো ফল কার গভ্ভে যেতো না ?
আগে এসব ফল, খেঁজুর, কিসমিস ইত্যাদি যা শাঁখরে নৈবেদ্যে কদাচিৎ দেওয়া হয়, তা বাড়িএলে মাধবের মা নাতিনাতনীদের ভাগ করে দিত। কখনোই বৌদের দিত না। নিজেও দাঁতে কাটত না। কিন্তু এরা বলছে কি ? এসব এতকাল তার গভ্ভে গেছে ?
নৈবেদ্য দেওয়া হয়েগেলে, পরাণ, প্রাপ্যপ্রণামী এগিয়ে দিল। খুচরো গুণে দেখল দু'বৌ। তারপর বলল, আর নেই ? এইবলে, তারা পরাণের কোমরের কষিতে আঙুল টিপেটিপে দেখতে লাগল। আর পরাণ বলতে লাগল, আর নেই ছোটবৌদি। বাগেশ্বরের দিব্যি।
পরাণ তার খাটোধুতি ঝেরে দেখাচ্ছিল।

তাকে সন্দেহ করলেই, এভাবে ধুতিঝেরে দেখানো, পরাণের ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস।
এভাবেই পরাণের কাছথেকে প্রতিদিন দক্ষিণা আর নৈবেদ্য নিয়েছে মাধবের মা। কোমরের কষিতে হাতদিয়ে দেখেছে। প্রয়োজনে পিছন দিকে গোঁজা কাছা খুলে তাতে সিকি আধুলি বেঁধে লুকিয়েছে কিনা দেখেছে। তবে মাধবের দু'বৌর মত অমন বেহায়া হাসি কোনদিন হাসেনি, মাধবেরমা।
সব পুরনো দৃশ্য। কেবল মাধবমাস্টারেরমা'র জায়গায় তার দু'বৌ।
দৃশ্যটা ভয়ঙ্কর। এত ভয়ঙ্কর তা মাধবেরমা কোনদিন বুঝতে পারেনি। পারেনি, তার কারণ এতদিন সে নিজে দৃশ্যের ভিতরে ছিল। নিজেকে আলাদা ও আলগাকরে নিয়ে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে না দেখলে, মানুষ, কোন দৃশ্যই ঠিকঠিক দেখতে পায়না। এতদিন মাধবেরমা দৃশ্যের ভিতরে ছিল। এ দৃশ্য যে এতটা করুণ আর নির্মম, তা তার কোনদিন মনে হয়নি। এখন তাকে ছুঁড়ে ফেলেদেওয়া হয়েছে দৃশ্যেরবাইরে। ছেলের সংসারে এখন সে রাঁধুনী বাঁদী। এখন সে নিজে নির্বাসিত ও দুঃখী। দুঃখই দুঃখকে চিনতে ও অনুভব করতে পারে। তাই অন্যচোখে ও অনুভূতিতে সে দেখতে পেল, প্রত্যক্ষ করল, এ সংসারে পরাণ কোনচেহারায়, আসলে ঠিক কোনখানটায়, কেমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এ দৃশ্য দেখে তার ভিতরে হায়হায় করছিল। টনটন করছিল। ছিঁড়ে খুঁড়ে যাচ্ছিল। আর পাশাপাশি তার খুব অগোছাল ভাবেও মনে হল, আমি যে এতদিন এইরকম করেছি, তা কি এই জন্যে? আমি যা করতাম, আমার ছেলের দু'বৌও তাই করছে। আরও ৩০/৩৫ বছর পর যখন এই দুইবৌ আমার মত বুড়িহয়ে সংসারের আঁস্তাকুড়ে যাবে, তখন কি মাধবের চারছেলের চারবৌ এমনি করবে? এক থেকে দুই, দুই থেকে চার, থেকে—, কত। কত। কিন্তু কেন? আমি জনেজনে ভিক্ষে করেছি আর এত বড় একটা ছেলেকে রোজই সন্দেহ করেছি, কোমরে হাত দিয়েছি, কাছা খুলিয়েছি, ওই যে ও লাফাচ্ছে—। সেই যে কথায় বলে, পিঁপড়ের পিছন টিপে চিনি বার করতে চেয়েছি, কার জন্যে? আমি কি তা পারিনি? আমি যদি পেরে থাকি, তাহলে এই দুইবৌ সেই একইকাজ এখনো করছে কেন? ওদের কি আরো চাই?
হ্যাঁ, আরও চাই মাধবের মা।
কি চাই?

যা তুমি চেয়েছিলে মাধবমাস্টারেরমা। অর্থাৎ একটু সুখ। নিরাপত্তা। শুধু তোমার ছেলের জন্য। সবাইকার জন্য নয়। শুধু তোমার ছেলের জন্য।
যেখানে পেটের জন্য, পরনের জন্য, মাথা গোঁজার জন্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিশ্চিন্তি আর নিরাপত্তার জন্য কোটিকোটিমানুষ হাঁস ফাঁস করছে, মাথা খুঁড়ছে, সেখানে নিজেকে সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে, কেবল নিজের জন্য সুখ খুঁজলে ও চেষ্টা করলে এমন অপরাধই জন্মে ওঠে। আর তাই সমাজের সর্বস্তরে এমন অপরাধীর সংখ্যা অজস্র। চিরকাল। কিন্তু মাধবের মা'র কোন তত্ত্বজ্ঞান নেই। শুধু নিজের ছেলের জন্য চেয়ে সে কেমন অনিবার্য-ভাবে নিজের অজান্তে অপরাধী হয়ে গেছে সে সম্পর্কে কোন ভাবনাচিন্তা তার মনে আসতে পারেনা। আসেও নি।
দৃশ্যটি তার কাছে কদর্য মনে হয়েছিল। তার মনে লেগেছিল। সে মনে মনে বলেছিল, ঢের হয়েছে। আর নয়। পরাণের জন্য কোন একটা ব্যবস্থা করতেই হবে, যাতে সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।
নিজের সন্তানের জন্য মা'র যেমন দুঃখ হয়, পরাণেরজন্য, মাধবমাস্টারের মার, তেমন কষ্ট হয়েছিল।

২২

।। মা, আমি কি আমার বাবার মেয়ে ?।।

পরাণের জন্য কিছু করতে হবে। অন্যব্যবস্থা। যা পরাণের নিজস্ব।
একটা কথা মনেহবে আর সেই মনেহওয়া নিয়ে বসে থাকবে, কোনদিন সে মানুষ নয় মাধবমাস্টারেরমা।
এবার সে হাঁটতে লাগল পরাণের জন্য।
—আমার পরাণের জন্য কোথাও কিছু করে দিতে পারেন আপনি ? ভগবান আপনার ভালো করবেন।
হাঁটা। হাঁটা। আবার হাঁটা। শুধু পরাণের জন্য।

হাঁটতে হাঁটতে, খুঁজতে খুঁজতে একজনকে পেয়ে গেল মাধবের মা। তাঁর বাড়ি বর্দ্ধমান। তিনি কাজ করেন ও থাকেন আগ্রায়। পুজোয় বাড়ি এসেছিলেন। একজনকে ধরে আর একজনের মধ্যস্থতায় আগ্রার চাকুরে অধিবাসী, সেখানকার বেঙ্গলি ক্লাবের একজন উৎসাহী সংগঠক, সেবার পুজোয় বর্দ্ধমানে বাড়ি আসা জ্ঞানেশচন্দ্র হালদারকে গিয়ে ধরল মাধবেরমা। ডালপালা ধরে ধরে বিশাল বিস্তৃত তার আনাগোনা ও পরিচিতির পরিধি।

—আপনাদের আগ্রার মন্দিরে পুরোহিত লাগবে বলছেন। আমি গরিব বিধবা। আমার পরাণকে নিয়ে যান। ও আমার পেটের ছেলের মত। দেবতার যত্ন হবে।

পরাণকে চাকরি দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পরাণ সেখানে থাকতে পারেনি।

এই গভীর, দীর্ঘ, ঘুমহীন, দিশেহারা রজনীতে ঠাকুরঘরের মেঝেয় পাতা বিছানায় নাতি আর মেয়ের সঙ্গে শুয়ে মাধবের মা এইসব ভাবছিল। কতদিন আগের কথা এই পরাণের চাকরি? ছ, সাত কিংবা আট বছর। অত দিন ক্ষণধরে সময়ের পাকা হিসেব মনে থাকে না বাপু। তখনওতো পরাণের বেলা বয়ে যায়নি। ছ সাত বছর সময়, অনেক সময়। এতদিনে পরাণ সেখানে দিব্যি থিতু হয়ে যেতে পারত। বিয়ে থা করে সংসারী হতে পারত। আমার যখন চোখ ফুটল, আমি যখন একটু দম দিতে পারলাম, তখন আমি করিনি ওর জন্যে?

পরাণের চাকরি হল। পরাণ রাখল না। স্মৃতির বিয়ে হল। থাকল না। সে কি করতে পারে? সে কিছু করেনি? কিছু না?

তবু তাকে শুনতে হবে যে নিজের পেটের ছেলের জন্যে পরাণকে খুন করেছে সে? আর তাই সে নষ্ট? তার পেটের মেয়ে বলবে এই কথা? কার কাছে তাহলে বুকের ভার নামাবে মাধবের মা? বোবা যন্ত্রনা। ছট ফট করে বিছানায় উঠে বসল বিধবা। স্মৃতি দেখল, মা বিছানায় বসে আছে। একটু পরে উঠে বসল সে-ও। মা কাঁদছে। স্মৃতি মার পিঠে হাত দিল। মা তবু কাঁদছে। স্মৃতি হাতে করে মার চোখেরজল মোছাতে লাগল।

—মা, আমি একটা কথা জানতে চাই।

—কি ?

—আমার কথা শুনে চিৎকার করো না।

—কি বলবি তুই ?

—দাদার থেকে আমি প্রায় আঠারো বছরের ছোট !

—হ্যাঁ।

তার পর স্মৃতি আর কিছুই বলল না। অন্ধকারে বাকু পাশ ফিরল। মা বলল, ছোট তো কি হল ? কি বলবি তুই ? স্মৃতি তবু চুপ করে থাকল। মা বলল, এই তোর আর এক ঢঙ। উসকে দিয়ে চুপ করে থাকা।

স্মৃতি খুব আলতো নরম স্বরে ডাকল, মা, তারপর একটু থেমে বলল, আমি কি আমার বাবার মেয়ে ?

কথাটা শুনে কেমন শীতল আর নিস্তেজ হয়ে গেল তার মা। দুজনে কেউ কোন কথা বলল না। তারপর মা বলল, যা বলবো বিশ্বাস করবি ?

—নিশ্চয়ই, স্মৃতি বলল।

—গরিব মেয়েদের কথা কেউ বিশ্বাস করে না। গরিবের শতেক জ্বালা—

—আমিও তো গরিব মা।

—সারা জীবন হাত পেতেছি। কেউ কেউ শরীর চেয়েছে। জীবনে আর সে মুখো হইনি। নিন্দে হয়েছে। কানে নিইনি। তবু আমার নামে কলঙ্ক। ভগবান জানেন, আমি খারাপ নই।

—তাহলেই তো দেখলে মা ! কলঙ্ক দিলেই কলঙ্ক হয় না যদিও, তবু তোমার কলঙ্ক হলো তো।

—আমার কপাল। আমি গরিব যে।

—তাহলে তুমি কেন মাথায় করে রাখবে সব কিছু ? কে কি বলল, ভাবলে তোমার কি যায় আসে ?

—কি করবো ?

—ভেঙে ফেলো। প্রায়শ্চিত্তি করো।

—কি করে ?

—পরাণদার নিজের আয় হোক, নিজের পায়ে দাঁড়াক, এ তুমি চাও ?

—চাই

—প্রাণ থেকে চাও ?

—চাই

—পরাণদাকে আলাদা ঠাকুর করে দাও। আলাদা পুজো।

—একি সংসারের হাঁড়ি হেঁসেল নাকি ? এ পুজো, ঠাকুর দেবতার ব্যাপার। ভাগ হয় না।

—সবই হাঁড়ি হেঁসেলের ব্যাপার। ঠাকুর দেবতাও। খুব ভাগ হয়।

—কি করতে বলিস তুই ?

—বাবা বাগেশ্বরের মন্দির থেকে ঘোড়া বার করে আনতে হবে তোমায়।

কথাটা শোনা মাত্রই মাধবের মা দুই হাতে কান চাপা দিল।

—তুমি পারো মা।

— সব্বোনাশ করবি তুই

—এই তোমার কাজ

—এ কোন পাগলামি পেয়ে বসেছে তোকে ? এ পাপ।

—এই পুণ্য।

—কোথয় থাকবে ঘোড়া ?

—নেপ পুকুর পাড়ে। পাকুড় তলায়। সেখানেও পুজো হবে।

—কে করবে পুজো ? পরাণ ?

—হ্যাঁ

—একা পরাণের দুঃখু ঘুচলেই কি পৃথিবীর দুঃখু ঘুচবে ?

এই একই কথা অন্যভাবে বাদলও বলেছে তার কাছে।

মা-ও বলছে।

—পৃথিবীর কথা বলছো কেন ? আমি পৃথিবীর কি বুঝি ?

—আমিও পৃথিবীর কথা বুঝি না। তাই বলছি।

— পৃথিবীর কথা পরে ভেবো মা। আগে নিজের কথা, ঘরের কথা ভাবো। সেটা তো বোঝ। আগে নিজে উচিৎ কাজটা করো, তারপর দেখো পৃথিবীর দুঃখু ঘোচে কিনা—

—তুই কি সবাইকার দুঃখু কষ্ট ঘোচানোর জন্যে জগোধাত্‌ত্রী হবি নাকি ?

—হলে হবো। তুমিও হবে।

—সব্বোনাশী তুই !

—তাই আমি। তুমি তোমার কাজ করো—

—কেন তোর মাথায় আসছে এসব ? এতদিনের নিয়ম ! এতদিনের ব্যবস্থা।

—কি হয় এতদিনের নিয়ম আর ব্যবস্থায় ! কি হল ? কি হচ্ছে ? এই

নিয়ম আর ব্যবস্থার সঙ্গে ভগবানের কোন সম্পর্ক নেই।

—নেই ?

—নিজেকে জিগ্যেস করো। বুকের ভেতরের ভগবানকে জিগ্যেস করো।

—কিন্তু কি হবে এই কাজ করে ?

—আনন্দ হবে। মুক্তি।

—কবে থেকে তোর মনে হল এসব ? কেন হল ?

—সব বলবো তোমায়।

—আমার ভীষণ ভয় করছে। ওরে, তুই আমায় কিছু বলিস না—

—চুপ। আস্তে। শোন, আমি তোমায় সব বলছি—

২৩

"আমার বুকের ভেতর পাথর আছে
আতব দিও না "

১০৮ শিবমন্দির থেকে ফেরার পথে পাশে পাশে গায়েগায়ে হেঁটে পরাণকে অনেকটা পথ এগিয়ে দিল বাদল। এইভাবে টানা প্রায় পৌনে একঘণ্টায় দুজনের পায়ে পায়ে পিচ রাস্তার অনেকটা ফুরিয়ে এল।

বাদলকে থামতেই হয় কোন জায়গায়।

-আজ এই পর্যন্ত, বাদল পরাণের কাঁধে হাত দিল।

—বেশ

—বেশ কি, তাহলে আমি আসি ?

—আচ্ছা

—ঠাকুর, একা ফিরতে তোমার ভয় করবে না তো ?

—না

বাদল পরাণের হাত ধরে বলল, তাহলে আবার দেখা হবে—

—হবে

পরাণ এগিয়ে গেল।

পরাণ এগিয়ে হাওয়ার পর রাস্তার ওপর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল বাদল। তারপর শ্লথ ও ধীর পায়ে সে পিচ রাস্তা ধরে পরাণ যেদিক এগিয়ে গেছে সেইপথে আরও খানিকটা এগোল। কিন্তু তাকে যে থামতেই হয়। স্রোতের টানের মুখেও অনেক সময় বিপরীতে ঘোরাতে হয় নাও।

অনেকদূর চলে এসেছে সে। জায়গাটা শুধারে ক্যানাল। এরপর ডাইনে বাঁক নিয়ে কাঁচারাস্তা। শুধারে যাবার পথ, এরপর মাঠে মাঠে, ডাঙায়। এই নির্জন নিশীথে ক্যানালের বহতা জলের, হাল্কা ও স্পষ্ট শব্দ হচ্ছে। চ্ছল্-চ্ছল্। চ্ছল্ চ্ছল্। এমন পরিবেশে এই জলের শব্দ, মনে হয় অলৌকিক। অনেকের স্নায়ু একা একা এই শব্দ সইতে পারে না। তারা এর থেকে পালাতে চায়। কিন্তু যে প্রেমিক নির্বাসিত, তার বুকের পাথর সরে যায়, আলগা হয় এমন জলের শব্দে। শুধু মাটির তলায় নয়, মানুষের বুকের ভিতরও নিহিত নিজস্ব জলধারা আছে। অনেকটা পাতাল-গঙ্গার মত। অনেকের জীবনে, সারাটা জীবন, এই আড়াল-গঙ্গা আড়ালেই থাকে। কেউ কেউ, যার আত্মার টানা পোড়েন, কাটা ছেঁড়া, রক্তপাত ও অনুভব আছে সে হঠাৎ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য নিজের ভিতরে বহতা জলের, হাল্কা অথচ স্পষ্ট শব্দ শুনতে পায়। কোন জনমে, কার জীবনে কখন কোথায় কোন মুহূর্ত্তে এই অলৌকিক, লহমার জন্য লৌকিক, বাস্তব ও সত্য হয়ে আবার অন্তর্হিত হবে তা কে জানে।

বাদল ঠিক বুঝতে পারল না কেন, অথচ ওই জলের শব্দে সে উৎকর্ণ হল। তার খুব ভাল লাগল। তার ভেতর কেমন ভরে যেতে লাগল। এমন তার আগে কোনদিন হয়নি। এমন হওয়ার কথাও নয়। সে, কোন অর্থেই ভাবুক নয়। কিন্তু হল। তার মনে হল, রাত ভোর হওয়া পর্যন্ত এইখানে একঠায় শুধু ওই জলের শব্দ শুনি। আঃ, ভিতর যেন শীতল হয়ে যাচ্ছে গো। কতদিন পর। কি আশ্চর্য শান্তি।

"-- আমার বুকের ভেতর পাথর আছে
আতর দিও না, ও আমার উদোম গায়ে
বেরঙের ফাগ রাঙায়ে, আতর দিও না—"

কে গায় ? কিছুটা চিকণ, তীক্ষ্ণ এবং ভাঙা ভাঙা গলায় গান আসে কোথা থেকে ?

কেউ গাইছে না। বাদলেয় হঠাৎ মনে পড়ে গেল পালানের গান। পালানের

চোখ মুখ আর নানা মেলায় অনর্গল গান। পালান কি? ঘোষ, বোস, মিত্র? মালাকার? পতিতুণ্ডী? মণ্ডল? তপাদার? চাকলাদার? কোনদিন জিজ্ঞাসা করা হয়নি। ও শুধু পালান।

মেলায় মেলায় দেখা। মেলায় মেলায় ভাব। মেলার স্যাঙাৎ। শেষের দিকে পালান, নানা মেলায়, বাদলের তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে গান গাইত। বেশ কয়েকবছর বাদল আর মেলায় যায় না। পালানের সঙ্গেও আর দেখা নেই। এখন আচমকা পালানকে মনে পড়ে গেল। চোখ, মুখ, সারা অবয়ব ও গান সমেত। জীবন্ত।

"—মানুষের অনেক বড়াই
কেন জানো?
আর সকলের একটা লড়াই
শুধু মানুষের দুইটা লড়াই
আগে মানো।
মিছার সাথে সাচার লড়াই
সববোহারার হকের লড়াই
দুনিয়া ভরে—
মানষের অনেক বড়াই
তার আছে আরেক লড়াই
নিজের সঙ্গে নিজের লড়াই
ভিতর ঘরে—
একটা লড়াই তীর ধনুকে
আরেক লড়াই নিজের বুকে
লড়াই থেকে নেই পালানো।

একটা গান থেকে আর একটা গান। সব পালানের গান। পালানের নিজের বাঁধা গান। তারই দেওয়া সুর। সব তার নিজের। একটার পর একটা। বাদলের সব কেমন এলোমেলো লাগল। সে জানত না পালানকে তার এতটাই মনে আছে। আসলে মানুষ, মানুষের কাছ থেকে কোথাও যায় না। থাকে। মনে না পড়লেও ভিতরে থাকে। ঠিক সময় মানুষের কাছে উঠে আসে মানুষ। হাজার বছর আগে থেকেও উঠে আসে। আসে বলেই মানুষ, শুধু মানুষ, মানুষের কাজ, অমর হয়।

অতশত বাদল বোঝে না। বুঝতে চায়ও না। এখনও নয়। গান হল গান। পালান গাইলে মেলায় বেশ জমে যেত। লোক টানত। অর্থাৎ বাণিজ্য। সেটাই তো আসল। যে যেমন ভাব পারে। সাপের নেশা, গানের নেশা, যে কোন নেশায় দম দেবে, পরমায়ু বাড়াবে কিসে, যদি লোক না আসে ? মেলায় শোনা পালানের গান সে কোনদিন মনে করে বয়ে বেড়ায় নি। গানের কথা, সুর, পালানের কণ্ঠস্বর, ভঙ্গী এসব যে তার এক মনে ছিল, তা সে জানতো না। যে কোন পুরানো কথাকেই সে ঝেরে ফেলতে চায়। তুলে রাখা তার স্বভাব নয়। অথচ পালান বড়ই জ্যান্ত হয়ে সামনে এসেছে।
জলের শব্দে তার ভিতর ঠাণ্ডা হচ্ছিল। মন চাইছিল দুদণ্ড সেখানে একঠায় দাঁড়িয়ে ওই শব্দ ভেতরে নেয়। মাখে। এটাও যে তার সজ্ঞানে হচ্ছিল তা-ও নয়। তার এই ধরণের কিছু ইচ্ছে হচ্ছিল। এখন পালানের এই সব গান তার ঠিক মনে ধরছে না--

"একটা লড়াই তীর ধনুকে
আরেক লড়াই নিজের বুকে"

কি ঝামেলা !
বিব্রত বাদল নিজেই নিজেকে একটা মৃদু ঝটকা দিয়ে ক্যানালের জলের শব্দ, পালানের গান ইত্যাদি সব কিছু থেকে নিজের কান ও মন সরিয়ে আবার হাঁটতে লাগল।
ফেরার পথে ক'পা গিয়েই ডাইনে ঝিমুটির শ্মশান। বাঁয়ে পীরের থান। মুখোমুখি।
শ্মশানে ঢোকার মুখে একটা গাছের গুঁড়ির নীচের থেকে মানুষ সমান লাল পেড়ে শাড়ি জড়িয়ে দিয়েছে কেউ। যে জায়গার মাথা থাকে, আন্দাজ মত সেই উচ্চতায় একটা হাঁড়ি রেখে উটকো মাথার মতন করে দিয়েছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় কে যেন গাছতলায় কপাল ঢাকা লালপেড়ে শাড়ির ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে আছে। আচমকা ভয় পাইয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। ভয়ে বোবা ধরে যেতে পারে অনেকের। খুব মজা লাগল বাদলের। বারে রঙ্গ। কতজনের মাথায় কত রঙ্গই না আসে। যারা এমন রাতবিরেতের পেত্নী খাড়া করে গেছে শ্মশানের গাছ তলায়, তারা তো আর দেখতে পাচ্ছে না ভয়টা কে এবং কতটা পেল। তবু করা চাই। মনে মনে অনুমান করে নেবে।
পিছন থেকে একটা ট্রাক হর্ণ দিচ্ছে। তার জোরালো আলো পড়েছে বাদলের

গায়ে। ফলতঃ বাদলের ছায়া নেমেছে রাস্তায়। হর্ণ দেওয়া ছাড়াও, গাড়ি স্পীড কমিয়েছিল একটু আগে থেকেই। এখন পুরো না থামলেও প্রায় থেমে যাওয়ার মুখে। বাদল রাস্তার আরও পাশে সরে যাবার আগে ঠং করে একটা শব্দ হল। ড্রাইভারের আসন থেকে পয়সা ফেলল কেউ। শব্দটা উঠে পুরো মিলিয়ে যাবার আগেই ট্রাক স্পীড বাড়িয়ে আবার ছুটতে লাগল।

বাদল বেশ বুঝতে পারল এখানে এই পীরের থানে, দিনে রাতে যে কোন সময় যে কোন ঋতুতে যাওয়া যাক, এখানে এভাবে থামা ও পয়সা ফেলা নিয়ম।

হ্যাঁ, নিয়ম। বর্দ্ধমান থেকে গুস্করা শিউরি রোডে সারাদিনে গাড়ি তো কম যায় না। সারাদিন রাখাল বাগালদের একটা ঝাঁক নিশ্চয়ই বসে থাকে ওখানে। তারা কাড়াকাড়ি করে কুড়োয়। পীরের থানের তো কোন সেবাইত নেই। রানীগঞ্জ থেকে দুর্গাপুর যাওয়ার পথে জিটিরোডের ওপর অণ্ডালমোড়ের ধারে কাছে এরকম একটা থানে এভাবেই পয়সা পড়ে। জি.টি. রোড বলে কথা। আগে নানা মেলায় যাওয়া আসা আর ঘোরাঘুরির পথে, জায়গাটা বাদলের চেনাজানা। কে যেন একবার বলেছিল রোজ ২, তিন, পাঁচ, দশ, আর কিছু বড় খুচরো পয়সা মিলিয়ে কম করে পাঁচশো টাকা হয়। সব খুচরো পয়সা। কেউ কখনো নোট ছোঁড়ে না! নোট দিতে হলে, গাড়ি থামিয়ে ঢাল বেয়ে নেমে প্রণামীর বাক্সে গুঁজে দিয়ে আসে। পাঁ—চ—শো? এত? বছরে কম সে কম আড়াইলাখ জমা! টঙ্কশালে কত মুদ্রা বানাবে? একজন হিসেব করে দেখিয়েছিল, এক বছরের জমা ব্যাংকে বারো বছর ফিকসড করলে, বারো বছর পর, প্রতি বছর ১০ লাখ হয়। এই ভাবে পর পর প্রতি বছর ১২ বছর ধরে, প্রতি বছরের টাকা ফিকসড করলে চব্বিশ বছরের মাথায় কত টাকা হয়? কত হয় মহাশয়? কোটি টাকা হয় কি? আলবাৎ হয়। কত কোটি হয়? সেটাই বড় জটিল হিসেব। মাথা গুলিয়ে যায়। ব্রহ্মতালুতে জ্বর বোধ হয়। টাকা পয়সা ও অগণিত মুদ্রার রঙ তামাসা ও হরির লুঠ হচ্ছে চারদিকে।

অথচ পরাণ যে পরাণ, পরাণ ঠাকুরের মত মানুষও কত সহজে বলে দিল, আমার একার হলে কি পৃথিবীর দুঃখ ঘুচে যাবে? বাদলও এই একই প্রশ্ন করেছিল স্মৃতিতে। কিন্তু স্বয়ং পরাণও যে একই কথা বলবে, তা বাদল

ভাবতে পারেনি। যাচ্চলে, আমি এই সব সাত পাঁচ কি ভাবছি! কেন এসব কথা ভাবছি আমি ?

"—ভালবাসার এমনি গুণ
পানের সাথে যেমন চুন
বেশী হলে পোড়ে গাল
কম হলে লাগে ঝাল।"

আবার পালানের গান! তার গায়ন নিয়ে গোটা পালান। মহা যন্ত্রণা। অথচ তার ভাবনা গুলি অনিয়ন্ত্রিত তো বটেই, একটার সঙ্গে আর একটার যোগসূত্রের কোন আভাসও নেই। একধরণের ছুটোপাট বিশৃঙ্খলা।

বাদল আরও দ্রুত হাঁটতে লাগল।

—'আমার একার হলে কি পৃথিবীর দুঃখ ঘুচে যাবে ?'

বাদলের চাকরি জীবনে একবার রেল হরতাল হয়েছিল। রেল রোকো নয়, চাকা বন্ধ। এই হরতাল যেদিন থেকে হল, তার বেশ কিছু দিন আগে থেকেই তার তাপ আসছিল শুধামডিতে। আগুন জ্বলে গনগনে হওয়ার আগে উনুন ধরানোর যেমন ব্যাপার থাকে। শুধামডির মত ছোট জায়গাতেও সভা হয়ে গেল দু' তিনটে। বাদল তার একটাতেও গেল না। কিন্তু আসল সভা আর জমায়েত আদ্রায়।

মামা বলল, তুই যাচ্ছিস না কেন ?

—তুমি যাচ্ছো না কেন ? বাদল পাল্টা জানতে চাইল।

—আমি স্ট্রাইক করতে পারি না।

—কেন পার না ?

—আমি এখানকার স্টেসন মাস্টার। আমার মাথার ওপর এখানে কেউ নেই। আমি এসব করলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।

—আমার এসব ছাই ভালুলাগে না। যত ফালতু ঝামেলা—

—তবু তুই আদ্রায় মিটিং-এ যা

—কেন যাব ?

—না হলে তুই সবাইকার শত্রু হয়ে যাবি।

—হলাম তো বয়েই গেল আমার।

—গোঁয়ার্তুমি করিস না। বাঁচতে হলে বুঝে সমঝে চলতে হয়। তোকে যেতে হবে।

আম জমায়েতে আদ্রায় গেল বাদল। শুধামডি সাফ করে রেলের সবাই গেল, শুধু তার মামা ছাড়া। সেই সভায় দিল্লী থেকেও নেতা এসেছিল আদ্রায়। শুধামডি স্টেসনে মামার পরই পদমর্যাদায় যে দুজন বাবু, তারাও ছিল সেই সভায়। দুজন যেন ফুটছিল। কি তেজ। সভায় ভাষণ শেষে, হরতালের সমর্থনে হাত তুলতে বলল নেতা। বাদল তার হাত তোলেনি। পাশের জন, যাকে বাদল চেনে না, সে বলল, এই—। বলে সে বাদলের হাত টেনে তুলে দিল।

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

—দুনিয়ার মজদুর এক হও।

তুমি যখন হরতাল করতে যাচ্ছ, তখন বলছো দুনিয়ার মজদুর এক হও। আর অন্যেরা যখন হরতাল-এ নেমে পড়েছে, তখন তুমি তার সঙ্গে আছ কি ? নেই। তোমার ডি. এ. তোমার ওভারটাইম, তোমার পে স্কেল এই সব বদলাতে হবে। তোমার সঙ্গে সব মজদুরের তা-ই হবে কি ? যা কিছু হবে সব রেল-জনতার, তার সঙ্গে দেশের বাকী শ্রমিকের সম্পর্ক কোথায় ? কেউ তো কারও পাশেই নেই, তা 'এক' হবে ? সবাই মিলে এমনভাবে করো শুধু রেলের চাকা কেন, সব চাকা বন্ধ হয়ে যাক। সারা দেশে রেল, ট্রাক লরির চাকাও বন্ধ। কোন কারখানার চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠছে না। কোথাও একটা হাতুড়ি ও যন্ত্রপাতির শব্দ নেই। সব চাকা, সব যন্ত্র, সব হাপর সব সব লাঙল স্থির।

'—শ্রমিক কৃষক ভাই ভাই,' সমবেত শ্লোগান উঠল আবার।

যদি হতে হয়, তবে তাই হোক। সব এক সঙ্গে বন্ধ হোক। ফয়সালা হয়ে যাক। হয় কই ? যদি না হয়, তাহলে এসবের কোন মানে নেই। দাবি দাওয়া, আরও ভাল ভাবে বাঁচার অধিকার তো সকলের। সকলে মিলে সকলের জন্য লড়াই কই ? যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন এ'সব খুচরো হরতাল মুলতুবি থাক। আগে সবাই তৈরী হোক। তারপর, ওড়াও পতাকা।

—তাও হবে।

—সে কবে ?

—এই ভাবে লড়তে লড়তে হবে।

—এতে খালি শ্রমিকে শ্রমিকে ফারাক বাড়বে।

—তা নয়, অন্যকে একজোট হয়ে লড়তে দেখলে আরও অনেকে সাহস পাবে। তারাও নিজের নিজের হক আদায়ের লড়াই'এ নামবে। আগে নিজের জায়গায় নিজেরটা মোকাবিলা করা চাই। সবাই নামেনি বলে, আমি, আমরা নামব না, তা হয় না। আমি নেমেছি, তুমিও নামো। তাহলেই আমরা পাশাপাশি হব। এভাবেই হয়। নিজের লড়াইটা শুধু তোমার, বা তোমাদের কয়েকজনের আলাদা বলে দেখো না। তারা না থাকলেও, এটা তাদেরও লড়াই। তাদেরও আঘাত করার, অধিকার ও জেহাদ ঘোষণা করার সাহস হবে। তারাও একহাট্টা হবে। একটা লড়াই সামনে থাকলে, আরও যুদ্ধ এগিয়ে আসবে।

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ

—দুনিয়ার মজদুর এক হও।

পরপর তিনদিন রেলের লাইনে টু শব্দ নেই। ঝকঝকে পাতা লাইনে চক চক করছে রোদ। রাতে অন্ধকার মোড়া। শুধমডি স্টেসনে মামা ছাড়া কাক পাখি নেই। হরতালের আগের রাতে এক ট্রাক বন্দুক ধারী এসেছে। তারা লাইনে ছড়িয়ে আছে। তারা পালা করে রাত ডিউটি দেয়। সাইকেল চালিয়ে, বাসে চেপে শুধামডি থেকে লোক যাচ্ছে আদ্রা। ওখানে রেলের বড় অফিস। লোকের মুখে মুখে আদ্রা থেকে শুধামডিতে হরতালের খবর আসছে। আদ্রার অফিসে রাত জাগছে কর্তারা। শুধামডি স্টেসনে চা গুমটিতে যেমন চা থেকে ভাত পর্যন্ত সব কিছু ফুটছে এখানে আসা বন্দুক ধারীদের জন্য, তেমনি আদ্রার বড় অফিসের ক্যান্টিনে দিনরাত চুল্লী জ্বলছে। চারদিকে পুলিশ আর মিলিটারি। যে কোন গাড়িতে একজন অফিসার থাকলে চারজন পাহারা।

অফিসার কালোনিতে মিলিটারি টহল।

কোথাও চাকা চলছে না। বোম্বে, কলকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী কোথাও না। সারা ভারতবর্ষের খবর আসছে শুধামডিতে। শুধামডি ভারতবর্ষের হয়ে গেছে।

হরতালের চারদিনের মাথায় রেলের লাইনের ওপর এগিয়ে আসা ইনজিনের শব্দ হল আবার। ইনজিনের পিছনে তিনটে বগি। প্রতি কামরায় যাত্রী।

এটা কোন গাড়ি? কোথায় যাবে? যাত্রীরা কারা? কোথায় চলেছে এই ট্রেন? কেন চলেছে? কারা চালাচ্ছে? শুধামড়ির রেললাইনের দুপাশে মানুষজন দাঁড়িয়ে গেল। কোন কোন বাড়ির মেয়ে বৌরাও। প্রতি কামরায় বন্দুকধারী। জানলা দিয়ে যাত্রীরা এদিকে চেয়ে আছে। হাসছে।

এই গাড়ি ভাঁওতা। সাজান। লোককে দেখানো হচ্ছে, চাকা চলছে। হরতাল ভাঙছে।

সেদিন অনেকের মত বাদলও ছুটেছিল আদ্রা। সত্যই কি স্ট্রাইক ভাঙছে? কৌতূহল। মানুষ কখনো তার ঘরবাড়ি, মানুষজন ও সরাসরি লেনদেন ও দেনাপাওনার জগৎ সম্পর্কে বিশুদ্ধ নিরপেক্ষ ও উদাসীন থাকতে পারেনা। বাদলও না। সে মনেমনে অনেকটাই জড়িয়ে এই হরতালের একজন হয়ে গিয়েছিল। আদ্রা গিয়ে বাদল দেখল, কোথায় ভাঙনের কোন লক্ষণ নেই। খড়্গপুরে রেল কলোনীতে কি হয়েছে, ওয়ালটেয়ারকে কজন এ্যারেস্ট হয়েছে, গয়াতে লোকো স্টাফের ওপর গুলি চলেছে, এই সব খবর সেখানে ফিরছে। হরতালে সামিল হয়েছে যারা, তারা স্টেসনের চারপাশে সজাগ। সেখানে শুধামড়ি স্টেসনে মামার এসিস্ট্যান্ট যে দুই বাবু, তারাও ছিল। সক্রিয়। ধুতি আর কামিজ পরা কাঁধে ঝোলা একজন নিরীহ মানুষকে ঘিরে হঠাৎই একটা জটলা হল। তারপর হৈ হৈ। সেই ঝোলার থেকে বার হয়ে পড়েছে খবরের কাগজে মোড়া সাদা প্যাণ্ট আর কালো কোট। একজন টিকিট চেকার। উনি লুকিয়ে ডিউটি যাচ্ছিলেন। লোকটা ভীতু। পাহারা নিয়ে রেলবাহাদুরের গাড়িতে আসেনি। চাইলেই যা পেত। তাহলে সবাই জেনে যেত। ওর জানাজানির ভয়।

—শালা দালাল

—হারামির বাচ্চা

—মার্ মার্

চুরি করে চাকরি করতে যাওয়া লোকটিকে যারা ধরেছিল, তাদের মধ্যে শুধামড়ির দুই সহকারী বাবুও ছিল। কি ভীষণ উৎসাহ আর ক্রোধ তাদের। একপাশে সাদা প্যাণ্ট, অন্য পাশে কালো কোট; লোকটা রাস্তায় লুটোচ্ছে। দৃশ্যটা মনে ভেসে উঠতে পথ চলতেচলতে হাসতে লাগল বাদল। তার খুব হাসি পাচ্ছে। হরতাল উঠে গেল ন'দিনের মাথায়। তার সাতদিন পর

রেলবাহাদুর ঘোষণা করল যে হরতালের সময় যেসব কর্মীরা নিষ্ঠা ও সাহসের সঙ্গে ঝুঁকি নিয়ে কাজে এসেছে, তারা নগদ টাকা পুরস্কার পাবে।

—হো-হো

খুব হাসতে লাগল বাদল।

ওই দুজন বাবুর হাজিরা খাতা থাকে গুধামডি স্টেসনে। তারা দুজনেই হরতালের প্রতিদিন হাজিরার প্রমাণ স্বরূপ খাতায় সই করল। মামা একটা কথাও বলল না। হরতালের দুই হরতন, নগদও পেল।

—এরা কেমন? এই দুজন বাবু?

—এরা বাবু। এরা বেজন্মা।

—দুনিয়ার মজদুর এক হও। এরা মজদুর নয়?

—এরাও থাকে।

পথ চলতেচলতে এতই অন্যমনস্ক ও নিজের ভেতর ডুবে ছিল বাদল যে সে টের পায়নি কখন থেকে একজন নারী, তাকে অনুসরণ করতে করতে তার পাশে চলে এসেছে। মেয়েটি তার হাত ধরতেই সে চমকে উঠল। বাদল টের পেল সে হাঁটতে হাঁটতে মেলার অনেক কাছে চলে এসেছে।

—কি গো, মেয়েটি হাত ধরে টানল বাদলেব।

মেলায় সিনেমার স্টিলের কাছে যে তিনজন ছিল, এ তাদের একজন।

এই মেয়েটিই পরাণকে—

- আমার গাড়ি আছে, এই বলে দুই চাকা গাড়ি দেখাল সে।

সেই শরীরিনী ইতিমধ্যে বাদলের হাত নিজের বুকের ওপর চেপে ধরেছে।

মাংস। মাংসের মন্ত্রনা। মাংস। শরীর। মাংসল ক্ষুধা। ভয়ঙ্কর।

কত টাকা?

—আগে এসোত, বাদলকে দু'হাতে প্রায় জড়িয়ে ধরল নারী। বেশ্যার ভঙ্গী ও তৎপরতাই আলাদা।

বাদলের ভিতর ভূমিকম্প হচ্ছে।

—কত?

—তুমি সাতদিন থেক আমার ঘরে

—কত?

বাদলের ঠোঁট কাঁপছে। শরীর আর শরীরের ইচ্ছা কি ভীষণ। বাদল তার নিজের ক্ষিধে তেষ্টা দেখে ভেতরে বোবা হয়ে গেছে। তার জিহ্বা ও তালু

শুষ্ক। তবু লক লকে।
—পঞ্চাশ। তোমার যা ইচ্ছে—এসো না বাপু।
স্মৃতি তুমি কোথায়? বৌ তুমি কোথায় গেলে? এই কি তার ঈশ্বরীর বিকল্প! তার ঈশ্বরী তাকে এ কোন পাতালে টানছে!
—তোমার নাম কি গো?
- রেবা।
—কোথায় থাকো?
—বদ্ধমানে গো। মহাজন টুলি। মহাজন টুলির রেবা।
—এসো রেবা, আমরা এখানে একটু বসবো।
—রাস্তায়?
—হঁ্যা
—গাড়িতে যাবে না?
বাদল রাস্তার পাশে বসে পড়ল। বনিতা তার পাশে বসে বলল, আমার যে আর তর সইছে না। তোমাকে দেখেই আমি মরেছি—
বাদল পদ্মাসনে।
—তুমি কি জপ করবে নাকি গো
বাদল কথা বলল না।
রেবা বলল, চলো না যাই। তার মুখের সস্তা সিগারেটের কটু গন্ধ বাদলের মুখে ঝাপটা মারল।
—এই নাও, বাদল টাকা বাড়িয়ে দিল।
—টাকা? নগদের আগেই নগদ? হাসতে হাসতে হাত বাড়াল সে, এতো পঞ্চাশ টাকা।
—নাও।
-গাড়িতে যাবে না? কখন যাবে?
—তুমি চলে যাও
—চলে যাব?
—যাও
—আমি সব সাজিয়ে, হাঁ করে বসে থাকব নাকি?
—যা, চলে যা এখান থেকে; চিৎকার করে উঠল বাদল। তীব্র। কর্কশ। অমার্জিত। এক ধরনের গোঙানি অথবা আর্তনাদ।

বেশ্যা বিস্মিত।

—গেলি তুই ?

মহাজনটুলির রেবা সরে গেল। চলে গেল।

বাদল একা। মাথার ওপর আকাশে তারা ফুটেছে। চাঁদ উঠে এসেছে অনেকখানি।

মানুষের দুইটা লড়াই
একটা লড়াই তীর ধনুকে
আর এক লড়াই নিজের বুকে
নিজের সঙ্গে নিজেই লড়াই
মানুষের সেইটে বড়াই
ভুজিয়া ফোটে, তপ্ত কড়াই
এনে দে শেতল পাটি, অল্প গড়াই--

পালান গাইছে। গাও পালান। সারারাত গাও।

একটা গান থেকে আর একটা গানে সরে যাচ্ছে পালান। যেমন সে মেলায় যেত। নিজের বাঁধা গান আর সুর যেন পালানের কাছে খেলা।

"—আমার বুকের ভেতর পাথর আছে
আতর দিও না, ও আমার উদোম গায়ে
বেরঙের ফাগ লাগায়ে আতর দিও না—"

টুপ টাপ করে দুটি একটি পাতা কাছের বৃক্ষ থেকে খসে পড়ছে মাটিতে। এই ঋতুর যা নিয়ম। টুপ টুপ করে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্তক্ষরণ হচ্ছে বাদলের ভেতর। ফোঁটায় ফোঁটায় শিশির যেন বরফ হয়ে যাচ্ছে তার ভেতর। কিমবা উইঢিবি তৈরী হচ্ছে তার ভিতরে। গুঁড়ো গুঁড়ো বালির মত ভিতরে জমছে যেন। উইঢিবি। ভিতরে। বাইরে।

২৪

॥ পরাণের প্রত্যাবর্তন ॥

মাঠে মাঠে ফিরছে পরাণ। কান মাথা মোড়া। বাঁদিকে ঝোলা পকেটে বাঁশি, একটা ছুরি। ওগুলো ও বাকুর জন্য কিনেছে।

পরাণের হাতে একটা ঘোড়া। কালো। কাঠের। এটাও বাকুর! মেলায় অনেক খুঁজে বাদল কিনেছে। নিয়ে যাচ্ছে পরাণ।

আমি এ গাঁয়ের কে হে?

পরাণ যেন নিজেই নিজেকে বলল। আমার বাপ-চোদ্দপুরুষ এই গ্রামে কোন দিন আসেনি। এ গ্রাম কেমন আর কোথায়, তা আমার মা জানল না কোনদিন। এখানের কিছুই আমার নয়। একটুও নয়। তাহলেও চাকরি পেয়েও আমি এই গ্রাম ছেড়ে আগ্রা গিয়েও থাকতে পারলাম না। চলে এলাম। কেন এলাম? কেন আছি? তা কি আজ রাতে এই কাঠের ঘোড়া বয়ে নিয়ে যাব বলে? একটা উঁচু ঢিবিতে হোঁচট খেল পরাণ। অন্ধকারে ও অন্যমনস্কতায়, ও, পায়েচলাপথ থেকে অনেকটাই সরে এসেছে। সামনেই রাধাচূড়া গাছ। গাছ ঘিরে মুসলমানদের পুরনো কবর ছড়ানো। তাই ঢিবি। অন্ধকারে ঠাহর করে, পরাণ আবার পায়ে চলা পথ ধরল।

পরাণের চাকরি হয়েছিল দুটি কারণে। এক তার ছোটমা। জ্ঞানবাবুকে তিনিই খুঁজে বার করেছিলেন। আর দ্বিতীয় কারণ পরাণের অভিজ্ঞতা।

কাজের অভিজ্ঞতা এক অদ্ভুত জিনিষ। এই দুনিয়ার হাটে কত কাজ। কিন্তু কাজ শুরু করার সময় যে যেখানে কাঁধ দিল, সেই তার অভিজ্ঞতা সিঁড়ি। ওপরে কি পাতালে, চোরা কিংবা ঘোরা সিঁড়ি—যার যেমন কপাল। তার থেকে আর ছাড়ান নেই। সারাজীবন, এমনকি অনেক সময় বংশপরম্পরায়, তাই করে খাও। মড়াকাটা কিংবা লাশ রাখার হিমঘরে যারা কাজ করে, শুধু তারা নয়, তাদের মেয়েবৌ, নাতি নাতনীরাও নাকি এই কাজে অভিজ্ঞ

হয়। এই কাজে তাদেরই অগ্রাধিকার ও আদর। বোধহয় রাজা হরিশ্চন্দ্রের আমল থেকে ওরা এ ব্যাপারে কাজ-জানা লোক। অর্থাৎ অভিজ্ঞ। সুতরাং ওরা বাঁধা থাক, এরই মধ্যে। অভিজ্ঞতাই অবলম্বন। ক্রমে তা-ই অতলান্ত অধীনতা। মুক্তি যতটুকু, ক্ষেত্রবিশেষে দাসত্ব তার চেয়ে অনেক বেশী।

—পরাণের হাতে ঠাকুরের সেবা যত্ন হবে। পরাণ আমার সব কাজ জানে। অর্থাৎ পরাণ অভিজ্ঞ পুরোহিত।

সাবাস অভিজ্ঞতা। পরাণ যে বহাল হল তা শুধুই তার কপাল জোর নয়। অর্দ্ধেক মাধবমাস্টারের মার তদ্বির আর বাকী পরাণের অভিজ্ঞতা।

আগ্রার মন্দিরের ব্যবস্থা ভাল। বাঁধা মাস মাইনে ১৭০ টাকা। মন্দিরের অতিথি ভবন আছে। তারই একপাশে পুরোহিতের কোয়ার্টার। শোয়ার ঘর, একটি একচিলতে বারান্দা, একটি ছোট্ট রান্না আর ভাঁড়ার ঘর। কলঘরও। এতো স্বপ্ন পরাণের কাছে। মাসমাইনে ছাড়া ভক্ত আর যজমানরা যে সব প্রণামী দেবে তারও এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্য পুরোহিতের। ভাবা যায়! সব কিছু দেখাশোনার জন্য কমিটি আছে। প্রবাসী বাঙ্গালীদের সংগঠনের চরিত্রই আলাদা। জ্ঞানবাবু, অর্থাৎ জ্ঞানেশ চন্দ্র হালদার সেই কমিটির একজন।

জ্ঞানেশ চন্দ্র হালদার পরাণের চেয়ে বয়সে বছর পাঁচ ছোট। অর্থাৎ সাত বছর আগে তাঁর বয়স ছিল—। রোগা, ছিপছিপে, মেদহীন, লম্বা শরীর। মাথার সামনের দিকটা সামান্য টাক। চওড়া কব্জা। ছাঁটা, চওড়া গোঁফ। ডান হাতে ঘড়ি। বাঁ হাতে একটা স্টিলের বালা। সব মিলিয়ে সেই ধরনের চেহারা, যার ওপর নির্ভর করা যায়।

শুধারে গ্রাম থেকে পরাণের আগ্রা যাত্রার আগের দিন রাত্রে মাধব বলল, শোন পরাণ, আমি না হয় তোমায় কিছু বাড়িয়ে দোব।

তখন পরাণ দুইবেলা ভর পেট খাওয়া, চা-মুড়ি, কাপড় গামছা ছাড়া মাসে ১৫্ টাকা পেত।

মাধবের মা বলল, তুই আর কত বাড়াবি বাবা। তুই পাবিই বা কোথায়?

—তোমায় মাসে ৪০্ টাকা করে দোব পরাণ। কোথায় যাবে?

—৪০্ টাকা কি বলছিস? ওখানে মাইনে ১৭০্ টাকা, কোয়াটার, তার ওপর যজমানদের কাছ থেকে পাওনা। ওকে যেতে দে বাপু। ওর ভবিষ্যত তো দেখতে হবে।

মাধব আর কিছু বলেনি। মনে মনে যা বোঝবার বুঝেছিল। সে রাত্রে মাধব তার দুই স্ত্রীকে অনেক কথা বলেছিল ক্রুদ্ধ স্বরে। কিছু কিছু ভাষাও ছিল, যা গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের প্রধানশিক্ষকের পক্ষে সংবিধানসম্মত নয়। আসলে মাধব বুঝেছিল, পরাণ চলে গেলে ঠ্যালা যে টের পাবে, সে মাধব। অন্য কেউ নয়। তাই চোটপাট পরিবারের ওপর। আগ্রা যাত্রার জন্য পরাণ যখন তৈরী, তখন পরাণের বাড়ি থেকে বার হবার মুখে, কি আশ্চর্য, মাধব বলল পরাণকে, হেঁটে নয়, গাড়িতে যাও। এতদূর হেঁটে স্টেশন গেলে আমার কষ্ট হবে। দু'বৌদি বলল, চিঠি দিও। গিয়ে হলে আমরা যেন খবর পাই। আমরা যাব কিন্তু।
সত্যিই যাত্রা করছে পরাণ। গোলাপ আঁকা টিনের বাক্সে পরাণের টুকিটাকি সব জিনিস ভরা। একটা ছোট পোঁটলাও আছে। সঙ্গে ছোট মা যাচ্ছে। ছোটমা অবশ্য আগ্রা যাবে না, পরাণকে জ্ঞানেশ চন্দ্র হালদারের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসবে। ওখান থেকে তাঁর সঙ্গে পরাণ চলে যাবে আগ্রা। মাধবের দু'পক্ষের ছেলে মেয়েরা, সার দিয়ে প্রণাম করল পরাণকে। দুজন উঠে বসল গাড়ির ছই-এর ভেতর। তাদের কাকাকে পৌঁছে দিতে যাবে। চলে যাওয়া গাড়ির দিকে গলা তুলে অনেকে বলল, পরাণ ঠাকুর, সত্যিই চললে গা!
--আ-গ্-রা? সে কতদূর গা?

কোথায় চলেছে গাড়ি? কতদূর? ট্রেন চলছে তো চলছেই। গাড়ি থামে। আবার চলে। চলে। চলে। পরাণকে টিকিট কাটতে হয়নি। পথে কোন খরচা হয়নি তার। সবই জ্ঞান বাবুর ব্যবস্থা। ছুটি শেষে সপরিবারে ফিরছেন। সঙ্গে পরাণ। ট্রেন যত এগোয়, তার চারপাশে মানুষজনের মুখের ভাষা, পোষাক, বাইরে ক্ষেত খামার, ঘর বাড়ি, হাওয়ার গন্ধ বদলাতে আরম্ভ করল। চলেছে তো চলেছেই। থামে। আবার চলে। রাত্রি হলে, ট্রেনে নিজ নিজ বার্থে জ্ঞান বাবু ও সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। পরাণ ঘুমোতে পারল না। জেগেও থাকল না। সারা রাত তার মাথার মধ্যে দিয়ে গুধারে গ্রাম, বাগেশ্বরের মন্দির, বোসেদের ভাঙা বাড়ির বাইরে বুড়ো শিব মন্দিরের ভেতরটা তকতকে করে নিকিয়ে রাখে যে ক্ষান্ত মাসী, তার গলা বাজতে

লাগল। মাধব মাস্টারের বাড়ির উঠোনের একপাল হাঁস ডেকে উঠল প্যাঁক প্যাঁক করে। সকালে যে ফুল তোলে পরাণ, সেই জবা, কলকে, গৃহস্থের উঠোন, চোখের সামনে দুলতে লাগল।

মন্দিরের কোয়ার্টারে তাকে পেঁ ৗছে দিল জ্ঞান বাবু। জায়গাটা আগ্রা থেকে ৫/৬ মাইল দূরে। এখানে জল ও ভাতের স্বাদ আলাদা। ভাষা অন্য। হু হু করতে লাগল পরাণের বুকের মধ্যে। জল ছাড়া মাছের মত লাগল পরাণের। পরাণের ক্ষিধে গেল। ঘুম গেল। যে ৮ দিন ছিল, তার মধ্যে তিনবার ডেকে আনা হল জ্ঞান বাবুকে। জ্ঞান বাবুর ভাল কথা, যুক্তি বুদ্ধির কথা, ২/৩ মাস পরে তাকে শুধারেতে পেঁ ৗছে দেবার আশ্বাস, কিছুই পরাণকে স্থির করতে পারল না।

চেষ্টা করল পরাণ। থেকে যাওয়ার চেষ্টা করল। নিজের সঙ্গে নিজের মত বোঝার চেষ্টা করল। কিন্তু শুধারে গ্রামের ঘরবাড়ি, পথঘাট, গাছপালা, ধুলোমাটি, মানুষজনের জন্যে তার রক্তে সে কি ঝিম্ ধরানো কান্না! বেড়াল ছানা যেমন মাকে খুঁজে খুঁজে কাঁদে, রাত্রে শুয়ে শুয়ে তেমন শব্দ করত পরাণ।

জ্ঞান বাবু বলে দিল, তাকে যেন আর ডেকে পাঠানো না হয়। পরাণের কোন ব্যাপারে সে আর নেই।

পরাণের একটি পুরানো হাতঘড়ি ছিল। বেচে দিল সেটা। টর্চও। আরও ২'একটা টুকিটাকি।

ভারতবর্ষের একজন নিরীহ গ্রামবাসী যতরকম নিগ্রহ আর অত্যাচার সহ্য করে দূর পাল্লার ট্রেনে ভ্রমণ করে থাকে, তার সব সহ্য করে আগ্রা থেকে বর্দ্ধমান ফিরল পরাণ। সেখান থেকে শুধারে। খটখটে শুকনো চোখ। রুক্ষ চুল। মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি। আরও রোগা। আরও খর্বকায়। আরও কাহিল। দু'চোখের কোলে মনসা পাতার কাজল।

মাধব থাকতে দিল। তবে সর্ত অনেক। মুচলেকা মেনে নিল পরাণ। মেনে নিল, যে কাজই তাকে দেওয়া হোক, সে কাজই সে করবে। কোনদিন সন্ধ্যা আটটার পর বাইরে থাকবে না। এখন থেকে মাধব স্পষ্ট জানাল, তার মাইনে বলে কিছু নেই। পেট-ভাতায় থাকবে। যে কোন মানুষের টুকটাক যা লাগে মাঝে মধ্যে, এমনকি প্রতিদিনের ক'টি গোনা বিড়িও তাকে রোজ হাত পেতে চেয়ে নিতে হবে। না পোষালে পরাণ অন্যত্র যেতে পারে।

কলাই করা থালা গেলাসে ভাত তরকারি জল দেওয়া হল তাকে। ছ'বৌদির হুকুম হল, নিজের বাসন নিজে মাজো। বৌদিরা ওর চোখে চোখে তাকাতে, তার হাতেধরা থালার ওপর গেলাস কাঁপার শব্দ হচ্ছিল। সেই প্রথম।
আগ্রা থেকে ফেরার পর একদিনও গ্রামের বাইরে যায়নি পরাণ। আজ গিয়েছিল।

আগ্রা থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিল পরাণ। আজও সে ফিরছে। তার একটুও ভয় করছে না! কেবল কাঠের ঘোড়া বয়ে আনার ফলে হাতে ব্যথা করছে। যে মানুষ তার নিজের জন্য নয়, অন্যের জন্য তার যথাসর্বস্ব বাজি রাখতে পারে, সে ধীরে ধীরে যথার্থ ভয়হীন ও নির্ভয় হয়ে যায়।
এই মুহূর্তে পরাণ যেমন হচ্ছে।

২৫

॥ খুলে যায় রেশমের গুটি : স্মৃতির নবজন্ম ॥

স্মৃতি বলল, আমার মনে কোনদিন সুখ ছিল না মা
তুই তো নিজেই অসুখ বাধাস, সুখ পাবি কোথায়?
- সেই লোকটা, সেই কবি, কেন এসেছিল আমাদের বাড়ি?
—তুইতো নিজেই মজেছিলি বাপু
—তুমি আমায় হাত-পা বেঁধে আটকে রাখোনি কেন?
- তার কথায় আর কি হবে! এখনো তাকে তোর মনে আছে নাকি?
- মনে ছিল। আর নেই। আমার বরের পাশে তাকে খুব ছোট মনে হয়।
—ফের বর বলছিস কাকে?
—বাদল।
—তাহলে আর তোর অসুখ কিসের?

—তাকে কিন্তু আমার বহুদিন মনে ছিল। বিয়ের পরও—। আমার স্বামী, আমার সংসার, সব কিছুর ওপর আমার যে আক্রোশ, তার মূলে ছিল সে। আমার উঠতে বসতে শুতে নাইতে যন্ত্রণা-

—হে হরি,

—তোমার জামাই, আমার ছেলের বাবার পাশে শুয়ে ভেবেছি, অন্য একজন পুরুষ আমায় নিচ্ছে। ওহ্-হো, আমি কত বড় নিষ্ঠুর। তুমি বুঝতে পারছ মা? মনে হত আমি একটা—। এমনকি বাকু যখন পেটে এলো, তখনো ভাবতে চাইলাম—

—চুপ কর। তোর কষ্ট হচ্ছে।

—হোক। সব সত্য প্রকাশ করে দিচ্ছি। তুমি বোঝ—

—আমি বুঝতে পারছি।

—এখনো বোঝনি। তোমায় সবটা, পুরো, ঠিকঠাক বুঝতে হবে।

স্বামীর মৃত্যুর পর ওপরে বেশ বদলালো স্মৃতি। কিন্তু ভেতরে তার বিশেষ বদল হল না। সুখহীন। অতৃপ্ত। তার বিষণ্ণতা আগের থেকে আরও ঘন হয়ে তার মনের ভেতরের চোরা কুঠরিতে থিতু হল। কোন কোন ক্ষেত্রে জীবিতের চেয়ে মৃত মানুষ বেশী জীবন্ত হয়। হঠাৎ, না চাইতেই মৃত স্বামীর মুখ স্পষ্ট দেখতে পায় স্মৃতি। ঈষৎ ফাঁক করা ঠোঁট। বিবর্ণ কপাল। খসখসে কাঁচা পাকা চুল। কপালে চন্দনের ফোঁটা। সে স্মৃতির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। যে বেঁচে আছে তাকে ফাঁকি দেওয়া যায়। মৃতকে যায় না। স্বামীর মৃত্যুর পর 'ফাঁকি' শব্দটা মনে হয় স্মৃতির। আগে হতো না।

মৃত রাখোহরি যেন স্মৃতির মুখের দিকে চেয়ে বলে, আমার সারা জীবনের সঞ্চয়, ইনসিওর, পি. এফ. পেনসন—, এইসব ঠিকঠাক বুঝে নিচ্ছ তো? নাও। সুখে থাকো। ভোগে থাকো। ভালো থাকো।

রাখোহরি চট্টোপাধ্যায়, তার স্ত্রীর প্রতি কোন অবিশ্বাসের কাজ করেনি। ইনসিওর, পি. এফ. পেনসন—যা কিছু তার সঞ্চয়, সে সবেরই ওয়ারিস করে গেছে স্মৃতিকে। মানুষটা বেঁচে থাকতে, স্মৃতি জানে, তাকে সে কিছু দিতে পারেনি। অথচ মরে যাবার পরও স্মৃতি তার কাছ থেকে নিচ্ছে।

মাঝে মাঝে ওই মৃতের মুখ যেন পাহাড়ের আড়াল হয়ে বাদল ও সমগ্র চরাচরকে ঢেকে ফেলে। এবং তার এক ধরনের ভয় হয়। এই ভয় কখনো কখনো তার পিছু পিছু যায়। তখন, স্মৃতির কেবলই মনে হয়, আমার বাকুর কোন ক্ষতি হবে না তো? এই সব মিলিয়ে সে বড়ই বিপন্ন বোধ করে। কাউকে বলতে পারে না। বাদলকেও না। তার মাঝে মাঝে মনে হয়, এসব থেকে ছুটে বার হয়ে যায়। কিন্তু কোথায় যাবে, তা বুঝতে পারে না। ভগবানে বা যে কোন পুজোয় তার মন বসে না। ভয় থেকেও সে ছাড়া পায় না। ভয় ক্রমশঃ দীর্ঘস্থায়ী হয়। এ এক অদ্ভুত ও কঠিন নির্বাসন ও কষ্ট যা স্মৃতি একা বহন করে।

স্বামীর মৃত্যুর দেড়বছরের মধ্যে পাঁচবার শুধামডি যেতে হয়েছিল স্মৃতিকে, স্বামীর সূত্রে প্রাপ্য বুঝে নেওয়ার জন্য। রেল বিভাগের টাকা। পাওয়া যাবেই। তবু ঘোরাঘুরি অনেক। শুধামডি।. আগ্রা। একবার কলকাতার বড় অফিস, খিদিরপুরে। শুধামডি থেকে একা আসত স্মৃতি। উঠত বাদলের কোয়ার্টারে। সঙ্গে থাকত বাদল। শুধামডি। আগ্রা। কলকাতা। সর্বত্র। গর্ভ নিরোধক প্রস্তুত থাকত বাদলের ঘরে। শুধামডি। আগ্রা। কলকাতা। সর্বত্র। বাদলকে সে ভালবাসে। ভালবাসা বলতে যা বোঝায়। অর্থাৎ এই মানুষটাকে ছাড়া, এই নারী তার পৃথিবী কল্পনা করতে পারে না। আর তাই বাকুকে নিয়ে যেমন, তেমনি আজকাল স্মৃতির ভয় হয়, বাদলের কিছু হয়ে যাবে না তো? যদি হয়? ভয়। ভিতরে গুঁড়ি মারে। ঘনায়। তবু কাজ হয়ে যাওয়ার পরও যখন শুধামডিতে তাকে দুদিন আটকে রাখে বাদল, স্মৃতি চলে যেতে চেয়েও থেকে যায়। শরীর আর মনে স্মৃতি অনেকগুলো টুকরো হয়ে গেছে। টুকরোগুলো জুড়ে নিজেকে সে গোটা করতে পারে না। রাখোহরির পেন্‌সন আর. পি. এফ. এর টাকা ইত্যাদি পাওয়া ও সেই সম্পর্কিত ব্যবস্থা করার জন্য শুধারেতে মা'র কাছে বাকুকে রেখে এসে, শুধামডিতে সে বাদলের পাশে শুয়ে, ছেলের জন্য কাঁদে। অথচ যখন শুধারেতে থাকে, তখন বাদল তাকে টানে। এ সেই মেয়ে যে তার সন্তানের পাশে শুয়ে গোপনে চোখের জল ফেলে তার প্রিয় পুরুষের জন্য। আবার সেই পুরুষের পাশে শুয়ে কাঁদে দূরে রেখে আসা সন্তানের জন্য। বাদল কিন্তু স্মৃতিকে বিয়ে করতে চায়। স্মৃতি চাইলে, এখুনি।

বাধা কোথায়? বাধা অদৃশ্য। তাই ভয়। এতে ভাল হবে তো? স্বামীর মৃত্যুর পর পঞ্চমবার যখন শুধামডি স্টেশনে ট্রেন থেকে নামল, তখন স্টেশনে প্রতিবারের মত বাদল দাঁড়িয়ে। আলগোছে ধরা ভরা কলসীর জল যেমন পা ফেলার সময় চলকে যায়, বাদলকে দেখে তেমন চলকে উঠল স্মৃতি। প্রতিবারের মত। ওরা দুজনে পরস্পরের দিকে তাকাল। ওরা দুজনেই জানে, একটু পরেই বাদলের ঘরে দুজনের জন্য কি অপেক্ষা করে আছে। একটা ক্ষ্যাপা উড়ন-তুবড়ির ফুলঝুরি জড়ান জ্বলন।

শুধামডি স্টেশন থেকে বাদলের কোয়ার্টারের দিকে দুজন হাঁটছিল। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থেমে গেল স্মৃতি। রাস্তার পাশে, স্মৃতির দু'হাত দূরে একটা ভিখিরী। তার কোমর থেকে দুই পা সরু, ভাঙা ভাঙা, তোবড়ানো। ওই ভিখিরীটা স্টেশনের কাছে গাছতলায় আগেও বসত। রাখোহরি যখন স্টেশন মাস্টার, তখনও বসত। তাকে আগেও দেখেছে স্মৃতি। কিন্তু আজ ওই ভিখিরীটার সামনে তার পা যেন মাটিতে গেঁথে গেল। তার ভয় করতে লাগল। তার মনে হল, তার ছেলে কচি বাকুকে যদি কেউ চুরি করে এমন করে দেয়! পরক্ষণেই সে মৃত রাখোহরির মুখ স্পষ্ট দেখতে পেল। কাঁচ-পাকা খসখসে চুল, কপালে চন্দন, ঈষৎ ফাঁক করা ঠোঁট, তাকে বলছে, ভালো আছো তো? ভালো থাকো। এবং ব্যাপারটা এখানেই শেষ হল না। সে পরাণদাকে দেখতে পেল। কাটা কাটা, ছেঁড়া সব ছবি। পরাণদা পলাশ গাছে উঠছে, পরাণদা রোদ মাথায় করে আশুতোষপুর যাচ্ছে, পরাণদা তাকে সিঁথিচেরা গ্রামে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসছে—। তার কাছে, ওই ভিখিরী, মৃত রাখোহরি চট্টোপাধ্যায় ও তার পরাণদা এক হয়ে গেল। একজন অসহায় মানুষের তিনটে আলাদা ভাগ। আসলে এক। কেন?

যেমন শোনা যায়, নিজেদের ভোগের সুখের আর কেবল নিজেদের লাভের জন্যে অনেকে যেমন ভিখিরী বানায়, ভিখিরী তৈরী করে, তেমনি আমিও কি আমার ভোগ আর সুখের জন্য একটু একটু করে আমার স্বামীকে মেরেছি? আর তার রেখে যাওয়া টাকার দিকে হাত বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি বাদলের ঘরে? পরাণদা কি শুধু আমার জন্য, পরাণদাকেও কি আমি—

এ আমি কি করেছি! কত সর্বনাশ করেছি আমি! কেন করেছি? শুধু নিজের জন্য! হে ভগবান, হে ঠাকুর এতো আমি জানতাম না—

ভয়ঙ্কর। এভাবে বেঁচে থাকা ভয়ঙ্কর।

শিকড় সমেত টান পড়ল স্মৃতির। হঠাৎ, হঠাৎই বাকুর ভবিষ্যৎ ভেবে তার ভিতরটা কাটা কই মাছের মত উথাল-পাথাল করতে লাগল। তার রক্তের পরতে পরতে, তার শ্বাস-প্রশ্বাসের ভিতরে ভিতরে যে বাকুর ভবিষ্যৎ আর নিশ্চয়তা নিয়ে এত গভীর তোলপাড় ছিল তা সে এরকম ভাবে জানত না। এই প্রথম সে মেয়ে নয়, প্রেম বা যৌন সঙ্গিনী নয়, একেবারেই অন্য চোখে তাকাল পৃথিবীর দিকে। শৈশব থেকে কঠিন, দরিদ্র জীবনের স্তরে স্তরে শুধারে গ্রামের বিস্তৃত বাস্তবের অনেক অজস্র সীমাহীন দুঃখ, এই যেন সে প্রথম অনুভব করতে পারল। তার যেন মনে হল, জীবনের যে কোন ঘটনাই আর সব ঘটনার থেকে আলাদা নয়, সব মানুষের ভালো না হলে কোন বাচ্চাই নিরাপদ নয়। তার বাকুও নয়। আর সেই মুহূর্তে স্মৃতির দুই চোখ আর দুই কান যেন আলাদা করে দুটি সম্পূর্ণ আলাদা দৃশ্য ও কথা শুনতে পেল। একটি দৃশ্যে শুধু তার স্বামী রাখোহরি চট্টোপাধ্যায়ের মৃত মুখ, হাঁ, কপালে চন্দন নয়, জীবন্ত পরাণদাও তার দিকে তাকিয়ে আছে! বলছে: ভালো আছো তো স্মৃতি? সুখে থাকো তুমি।' রাখোহরির গলা অদ্ভুতভাবে পরাণের কণ্ঠস্বর হয়ে যাচ্ছে। অন্য দৃশ্যে একটি কালো মেয়ে হুবহু স্মৃতির মত দেখতে, তার এলো চুল, আঁচল লুটোচ্ছে, সেই মেয়েটি স্মৃতিকে বলছে, লাথি মার্। ভেঙে ফেল। এমনি করে বাঁচবি? সুখের আর প্রেমের পোকা হয়ে? কি জবাব দিবি ভগবানের কাছে? নিজের কাছে? তোর ছেলের কি হবে? ভেঙে ফেল্। বেরিয়ে আয়। পবিত্র হ। পবিত্র হ। তাহলে তোর আর কোন ভয় থাকবে না।

স্মৃতি মাথা ঘুরে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল।

সেই রাত্রে বাদল বলল, কাল তো আমরা আগ্রা যাব। সেখানে একজন বড় ডাক্তার দেখাও। হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেলে কেন?

স্মৃতি কিছু বলল না।

বাদল একটু অন্য চোখে স্মৃতির দিকে তাকাল। তারপর বলল, তোমার দিন ছিল কবে? কোন গোলমাল নেই তো? হয়েছে?

তবু কোন কথাই বলল না স্মৃতি।

—আমি কি বলছি বুঝতে পারছ? কোন মেয়ে ডাক্তারের কাছে যাবে?

স্মৃতি দুই হাতে নিজের কান চাপা দিল।

—হলো কি তোমার?

—এসব ভাল্‌লাগছে না ! অন্য কথা বলো ।
—তুমি বলো ।
—ইনসিওরের টাকাটা আমি কাজু আর টিকুকে দোব ঠিক করেছি ।
রাখোহরির প্রথম বিবাহের দুই পুত্র সন্তানের ডাক নাম কাজু আর টিকু । স্মৃতির সঙ্গে তাদের কোনই যোগাযোগ নেই । পিতৃ বিয়োগের পর তারা মাত্র অশৌচের শেষ তিন দিন শুধামডিতে ছিল বাবার পারলৌকিক কাজ করার জন্য ।
—ওরা কি তোমার কাছে চেয়েছে ?
—না । পি. এফের টাকাও ওদের দিয়ে দোব ভেবেছি ।
—আগে তো এসব কোনদিন বলোনি । ওই ভিখিরীটাকে দেখে তোমার এই সব মনে হল ?
—হ্যাঁ । তাছাড়া টাকাটা ওদের বাবার । ওদেরই ।
—বাকুকে দেবেনা ?
—তার জন্যে তো আমিই আছি । মা ।
—আর পেন্‌সন ?
—সে তো পাওনাই থাকবে না আমার ।
—কেন ?
—তোমার বৌ হবার পরও সে টাকা……, কথাটা শেষ না করে স্মৃতি পাথরের মত চেয়ে থাকল । তারপর বলল, একটা পয়সাও আমি নোব না । ভগবানের কি দয়া ! আমার বুকের ভার নেমে যাচ্ছে ।
বাদল স্মৃতিকে বুঝতে পারছিল না ।
স্মৃতি বলল, ওদেরকে সব টাকা দিয়ে দেবার পরও তুমি বাকুকে নেবে ? ওকে মানুষ করবে ?
—নিশ্চয়ই ।
—তুমি বাকুকে নাও বাদল । আমায় ছেড়ে দাও ।
—কোথায় যাবে তুমি ?
—দাদার কাছে না । তোমার কাছেও না । কোথাও চলে যাব ।
—বাকুকে ছেড়ে থাকতে পারবে ?
—থাকতেই হবে ।
—কেন ?

—আমি জানি না। কিছু জানি না।

—কি হয়েছে তোমার?

—তোমরা সবাই আমায় ছেড়ে দাও। আমি চলে যাব।

—কেন যাবে?

—আমি বাঁচতে চাই।

—বৌ, তুমি আমার ঘরে এসো।

—সে বাঁচা নয়।

—তো কেমন বাঁচা?

—আমি বলতে পারব না।

—তোমার ভয় কিসের? তুমি কি জানো মামা আমার ও তোমার…, মামা আমায় কি বলেছিলেন জানো?

—তাতেই তোমার মন সাফা হয়ে গেল?

—তোমার মন সাফা নয়?

—না।

—বলো কি? এতদিন তাহলে এসব বলোনি কেন?

—আগে কখনো মনে হয়নি। আজ প্রথম মনে হল—

—ওই ভিখিরীটা কোন মহাপুরুষ, যে তোমার সবকিছু এমনভাবে বদলে দিল?

—ও ভিখিরী নয়। ও একজন সাক্ষী।

—সাক্ষী?

—হ্যাঁ!

—কোন মামলার?

—আমার জীবনের। তোমার মামা। আমার পরাণদা। আমার মা। আমার দাদা। আমার বাকু। আমাদের জীবন। উঃ! কি ভয়ঙ্কর—,

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। বাদল বলল, আমি ওসব জানিনা। তোমায় ছেড়ে আমি বাঁচব না। আমি তোমায় ভালবাসি—

—প্রমাণ দাও।

—প্রমাণ? আগে তো চাওনি।

—এখন চাইছি। চাইব।

—দিচ্ছি প্রমাণ, এই বলে বাদল উঠে দাঁড়াল। এবং ক' মুহূর্ত পরেই তার

চাহনি বদলে গেল। এ দৃষ্টি স্মৃতি চেনে। আজ সকালে গুধামডি পৌঁছুনোর পর, ওই ভিখিরী দেখে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার জন্য ওরা এখনও মিলিত হয়নি। সারা দুপুর স্মৃতি একলা ছিল। সে নিজেই বলেছিল, আমায় একা থাকতে দাও। আমি ঘুমোব।

এখন বাদলের চোখ, নাকের পাটা, গলার শিরা, হাতের আঙুল সব কিছু কলমীর দলার ষড়যন্ত্রের মত হিল-হিল করছে।

—তুমি ছুঁয়ো না আমায়, এই বলে স্মৃতি ছটফট করে উঠল।

—আমার বুক জ্বলে যাচ্ছে, এই বলে বাদল ওকে বুকে টানতে গেল।

—আমার ভীষণ নোংরা লাগছে নিজেকে। আমায় ছেড়ে দাও, এই বলে স্মৃতি প্রায় ডুকরে উঠল।

তবু ছাড়ল না বাদল। আরও জোর খাটাতে গেল।

হাউ হাউ করে এক অবোধ বালিকার মত কেঁদে উঠল স্মৃতি।

বাদল তাকে ছেড়ে দিল।

সে বড় কঠিন রাত্রি ছিল। নিরবয়ব।

বর্দ্ধমানের শিবতলার মেলা থেকে গভীর রাতে ফিরে, মাধব মাস্টারের বাড়ির মাঝ-দুয়োরে গিয়ে দাঁড়াতেই দরজা খুলে দিল ছোটমা। পাশে স্মৃতি। পরাণকে ডাকতেও হয়নি। ওরা পায়ের শব্দে বুঝেছে।

—ঘোড়া এনেছো? স্মৃতি বলল।

—হ্যাঁ।

—দাও।

২৬

॥ টানা ৫১ দিন ॥

শিবরাত্রির পর দিন থেকে বাংলা বছরের শেষ দিন পর্যন্ত টানা ৫১ দিন। যে ঘোড়াটা, পরাণ মেলা থেকে এনেছিল, এই ৫১ দিনে সেটা প্রায়ই দেখা যেতে লাগল। ঘোড়াটা বাকুর চেয়ে তার মা আর দিদিমার হাতেই দেখা গেল বেশী। সকালে বাগেশ্বরের পুজোর সময় হয়তো মাধবমাস্টারের মা বা স্মৃতি মন্দিরে এলো। সঙ্গে বাকু। এবং ঘোড়া। বাকু হয়তো দিদিমা বা মা'র সঙ্গে কোথাও যাচ্ছে। যার সঙ্গে যাচ্ছে, ঘোড়া তার হাতে। কিন্তু আছেই। কেউ জিজ্ঞাসা করলে দিদিমা বলছে, আর বোলো না ভাই, ঘোড়া ছেড়ে, ছেলে এক পা-ও নড়বে না। কখনো দেখা গেল মন্দিরের চাতালে বাকুর ঘোড়া পড়ে আছে। সেখান থেকে বাকু সরে গেছে। সুতরাং তার মা বা দিদিমা ঘোড়া কোলে বসল। গ্রামের ভিতর সকালে বা বিকেলে কারও বাড়ি গেলে, সঙ্গে যদি বাকু থাকে, তাহলে ঘোড়াও আছেই। মা ও দিদিমা, দুজনের কারোই ভুল হয়না।

—এ কোথ্ থেকে এলো গো ?

—ওর পরাণ মামা কিনে এনেছে।

মোট কথা, বাকুর কাঠের কালো ঘোড়াটা, স্মৃতি কিংবা তার মা'র হাতে দেখা একটা মোটামুটি খুব চেনা অভ্যস্ত দৃশ্য হয়ে গেল এই ৫১ দিনে।

এই ৫১ দিনের অন্য খবর হল, নেপ পুকুর পাড়ে পাকুড় গাছ ঘিরে যে ছোট্ট চালা হয়েছিল, সেই চালাকে আরও বড় আর মজবুত করে ফেলেছে তেঁতুলে পাড়া, নোয়ার পাড়া ইত্যাদির সিডিউলরা। সেখানে বিগ্রহ, দেবতার ছবি, পুজো পাঠ, কিছুই নেই। তবে ভারী পরিস্কার আর তকতকে। সন্ধ্যেবেলায় কেরোসিনের কুপি জ্বলে। আর মাঝে মাঝে দেখা যায় পিতলের থালায় কেউ দুটো কলা, শশা, মণ্ডা নামিয়ে গেছে। আসতে যেতে এ পাড়ার

পুরুষেরা এখানে দণ্ডবৎ করে। এইভাবে চলতে চলতে এই পাড়ারই কোন পুরুষেরা মাথায় এলো যে এখানে হাড়িকাঠ পাতবে। পার্বণে যেসব পাঁঠা, পায়রা বলি দেয় ওরা, তা এখানেই ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করে, এক কোপে কেটে প্রসাদ করে নেবে।

কথাটা চারদিকে রটনাও হল। একদিন মাধবমাস্টারেরমা নিজে থেকে এসে বলল, হাডিকাঠ পাতবি না। বাগেশ্বরের পুজোয় বলি নেই। জানিস না তোরা ?

—আপনি মানা করছেন বামুন মা।

—ওরে সাধে কি আর করছি! বাবা আমায় স্বপ্ন দিলে। স্বপ্নে বললো, তাই ছুটে এসেছি।

তেঁতুলে পাড়ায় গিয়ে মা'র এহেন নির্দেশ ইত্যাদি মাধবমাস্টারের কানে গেল সেদিন দুপুরেই।

মাতৃআজ্ঞা পালন, মা'র পিছু পিছু যাওয়া ছাড়া মাধব দীর্ঘদিন কিছু করেনি। এমনকি মা'র হাত পাতার অভ্যাসটিও সে নিখুঁত তুলে নিয়েছিল। যদিও এখন আর সে হাত পাতে না। হাত চালায়। গ্রামের কো-অপারেটিভের প্রায় পাকা-পোক্ত হিসেবরক্ষক সে। বীজধান, সার, কখনো-সখনো চিনি, কেরোসিন, নানা খয়রাতিতে তার দুই হাত, দু'শো হয়েই আছে। সারা দেশে রাজনৈতিক পালা বদলের সঙ্গে গ্রামের ডামা ডোলে সে তো আছেই। নির্দল। দক্ষিণপন্থী। দক্ষিণপন্থী শিবির থেকে ছুটে আসা বামপন্থী। আবার বামপন্থী সমালোচক। হাজারটা মুখ। তবু পুরোহিত। তবু শিক্ষক। ধরি মাছ, না ছুঁই পানি। যাকে বলে 'মাইরি মধ্যবিত্ত'।

—মা, তুমি নাকি সকালে নেপ পুকুরে গিয়েছিলে ?

—হ্যাঁ।

—ওদের নাকি 'বলি' দিতে মানা করেছো ?

—বাবা বাগেশ্বরের বলি নেই। ওরা দেবে ?

—বাবা বাগেশ্বরের সঙ্গে ওখানে কি ? ওটা কি বাগেশ্বরের মন্দির নাকি ?

—সবই দেবতার নামে করছে তো!

—করলেই কিছু হয় নাকি ?

—দেবতা নিয়ে খেলা নয়।

—তুমি নাকি স্বপ্ন দেখেছো ?

—দেখেছি তো!

—বাবা বাগেশ্বর তোমায় স্বপ্নে সত্যি বলেছে, যা তুমি ওদের বলেছো?

—না হলে কি আমি মিথ্যে বলছি?

মাধবমাস্টার তার মা'র মুখের দিকে তাকিয়েছিল। এই প্রথম সে তার মা'র মুখ দেখে সত্য-মিথ্যা বুঝতে পারল না। অথচ দারিদ্র থেকে অজস্র আকাঙ্খা নিয়ে মাধব যে ভূমি থেকে উঠে এসেছে, সে তার মা।

এমনিই হয়। একদিন যে নিজেই শোষিত থেকেছে, সে নিজেই শোষণ করতে শুরু করে। ব্যবস্থার মধ্যেই এমন বীজ ভরা আছে। আর তাই শোষণ এমন বহুবর্ণ, বিচিত্র, ব্যাপক ও বহুস্তর। কি ছিল, কি হয়েছে, কি হতে যাচ্ছে, মনেই থাকে না মানুষের। যা খুব চেনা, তা-ই আর চিনতে পারে না। আর তাই যে মা থেকে মাধবের শুরু, যে মা তার চিরদিনের সহায়, আজ সেই মা'র মুখে সে এই প্রথম অনেক অচেনা দাগ দেখল, যা সে চেনে না। দাগ-গুলিকে ভালো করে খেয়ালও করল না মাধব। আসলে যেখান থেকে সে উঠে এসেছে—তার মা--সেই জায়গাটা যে এমনভাবে ফাঁকা হতে পারে, তা সে ভাবতেও পারেনি। ভাবলও না।

গত ৫১ দিনে, উল্লেখযোগ্য আর কিছু নেই।

২৭

॥ সতীর স্বগৃহ যাত্রা ॥

আজ বছরের শেষ দিন। আজ চড়ক। আজ অনেক কিছু। আজ যাত্রা হবে। তার আগে মিউজিক পার্টি। ডান্স। পালায় গাইবে বলে, ফিমেল আসবে বর্দ্ধমান থেকে।

সন্ধ্যা লেগে যাবার আগে থেকেই একটি দুটি করে সারসার কার্বাইডের আলো জ্বলবে মেলাতলায়। কোন কোন দোকানে পেট্রোম্যাক্স। একেবারে

ফটফট করবে আলো। এই এতগুলো আলো জ্বলে ওঠাই একটা ব্যাপার গুধারে গাঁয়ে। মেলাতলায় অনেক বাচ্চা নতুন জামা কাপড় পরে ঘুরবে। আজকাল বাবুদের দেখাদেখি গয়লা আর শুঁড়িদের পরিবারের ছেলে-মেয়েরাও চড়কের দিন নব্যবস্ত্র পরে মেলাতলায় ঘোরে।

অনেকের, অনেকেরই শুধু দেখার কপাল। কোমরে শুধু টেনি বাঁধা অনেক ১০/১১ বছরের ছেলেকেও, ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখা যায়। তাদের হাতে কোন জিনিস নেই। হাসি নেই। কান্নাও নেই। তারা শুধু দেখে।

আজ সকাল থেকে একের পর এক নানা ভাগে নানা কিছু। সকালে বাগেশ্বরের পূজা শেষে 'ফুল পড়ে'। বছরে এই মাত্র একদিন। বাবার মাথার থেকে পূজার অন্ততঃ একটি ফুল পুরোহিতের হাতে আপনি এসে না পড়া পর্যন্ত, আজ সকালে পুজোর শেষ নেই। এই দেবতা যে কত জাগ্রত, এই ফুল পড়া যেন তার প্রমাণ। বহু মহিলা, অনেক পুরুষ মানুষও, এবং পট্টবস্ত্র পরিহিত ফটো বাবুও গরদ পরে নির্জলা উপবাস করে বসে থাকে, যতক্ষণ না 'ফুল পড়ে'। যেন পুরোহিতের হাতে এসে পড়া ওই ফুল, বাবা বাগেশ্বরের দয়ার ইসারা। আগামী যে নতুন বছর আসছে, রাত পোহালেই সেই নতুন বছরের অজানা প্রতিটি দিনের জন্য, বাবার অভয়।

দয়া চাই। অভয় চাই।

"—বাবা—বাগে-এ-এ—শ্ব-রে-র—দ-আ-আ—লাগে-এ-এ-ও শিব—অ-অ—মহে-শ্-শ-শ-র-অঃ—" থেকেথেকে গলা মিলিয়ে ডেকেওঠে গাজনের সন্ন্যাসীরা। 'ফুল পড়া' বড কম কথা নয়। সহজ কথা তো নয়ই।

প্রতি বছর এই পুজো মাধব নিজে করে। দেবতার ফুল আসে তার পাতা হাতে। এক পাশে থাকে পরাণ। অন্য পাশে মাধবের মা মেঝেতে পাতা হাঁটুর ওপর শরীরের ভর ও গলায় আঁচল দিয়ে যুক্তকরে বসে থাকে। বাবার মাথার থেকে ফুল তার ছেলে মাধবের হাতে এলেই ডুকরে কেঁদে ওঠে বিধবা। কাঁদতে কাঁদতে প্রণাম করে। মাথা ঠোকে। প্রতিবার।

'ফুল পড়া' হলেই পুজো শেষ। যেন সারা বছরের জন্য যতি পাতন। আসলে আবার পরদিন সূর্য উঠলেই সেই চাকা। তবু মনে হয়, মাঝখানে লম্বা একটা ছুটি গড়িয়ে থাকল।

ফুল পড়া হলে তবেই গাজনের সন্ন্যাসীদের নিয়মভঙ্গ। আবার তারা ফিরে যায় সাংসারিক পোষাকে। আহারে। ব্যবহারে। কিন্তু চড়কের দিন

রাত না হলে তাদের কারোরই বড় একটা ফেরা হয় না ঘরে। কারণ গাজনের সন্ন্যাসী—যাদের 'ভকতে' বলা হয়—কেউ কেউ কোন কোন বার সেই ভকতেদের নতুন বস্ত্র দেয়। প্রতি সন্ন্যাসীকে নবীন বস্ত্র দেবার মত সমর্থ ভক্ত অবশ্য প্রতিবার উপস্থিত থাকে না। তবে প্রতিবারই কেউ না কেউ ভকতেদের সেবা করে, অর্থাৎ খাওয়ায়। সেই ভোজে ভোজ্য পদ বেশী লাগে না। যদিও ২০/২২ জন ভকতে, অর্থাৎ সন্ন্যাসীর জন্য আহারের পরিমাণ লাগে প্রচুর। ভাত, বিউলির ডাল, কুমড়ো ও শাক পাতার তরকারি, মাছ আর আলুর তরকারি। আমিষে কোন নিষেধ নেই। আজ নিয়মভঙ্গ। এ ছাড়া যদি একটু চাটনি হয়, যে কোন কিছুর, শুধারের ভাষায় 'টক', তাহলে তো কথাই নেই। পুরু রুই কাতলার মাথা গুঁড়িয়ে তার 'টক' ভকতেদের পাতে দেওয়া হয় কোন কোন বার। সে অবশ্য যজমান যদি তেমন শাঁসালো হয়, তবেই। ভকতে খাওয়ানোর ব্যাপারে তেমন শাঁসালো বলবান সহসা মেলে না। এ ছাড়া মেলার দোকানের ময়রার হাতেপাক, গরম বোঁদে শেষ পাতে তো আছেই। ঘরের চাল, ঘরের ডাল, ঘরের ক্ষেতের কুমড়ো আলু, পুকুরের মাছ—যাদের আছে, তারা দিব্যি এমন ভোজ দিতে পারে ২০/২২ জন সন্ন্যাসীকে। নগদ বলতে বোঁদের দাম, যা ভকতেরা গ্রহণ করছে বলে মেলার বাজার দর থেকে অবশ্যই কমে দেওয়া হয়। আর জ্বালানির জন্য কয়লা আর কেরোসিনের দাম। এগুলি নগদে আনতে হয়। কাঠকুটো শুকনো পাতা অবশ্য কিনতে হয় না। তাহলেও যদি চাল, ডাল সব কিছুর দাম ধরা যায়, তাহলে মাথা পিছু খরচ ১২ টাকার কম নয় কিছুতেই। যারা ভকতে, অর্থাৎ গাজনের সন্ন্যাসী, তারা তো সবাই গ্রামেরই খেটে খাওয়া মানুষ। এক একজনের আহার যে অনেক।

চড়কের দিন সকালে মাধবমাস্টারের মা মাধবকে বলল, তোর কাছে একটা জিনিস চাইবো। তোকে দিতে হবে বাবা—

—কি চাইবে?

—আধমণ চাল।

মাধব তার মার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকল।

মা বলল, ষোল সতেরো সের তো লাগবেই।

—কেন?

মাধবের মা বলল, আরও লাগবে। এই বলে সে বিউলির ডাল, কুমড়ো ইত্যাদি পর পর বলে গেল।
মাধব মার কথা পুরোটা খেয়াল করল না। করতে চাইল না। সে আবার বলল, কিন্তু কেন ?
—আমি ভকতেদের সেবা করবো আজ।
—তুমি সেবা করবে কেন ? 'তুমি' উচ্চারণে বিস্ময় সূচক জোর দিল মাধব।
—আমার মন চাইছে।
—তুমি আমার মা. তোমাকে ওরা প্রণাম করে, আর তুমি ওদের সেবা করবে মানে ?
—করতে নেই ? সবাই তো পারলে ভকতেদের সেবা করে।
—সবাই আর আমরা যে আলাদা, তা বোঝ না ?
—কোথায় আর আলাদা বাবা! আসলে সব এক—
—তাহলে যাও, হারাকে বল পুজো করতে, পুরোহিত হোক—
—সে কথা আলাদা
—আমিও তো বলছি আমরা আলাদা
—হারা চাষ করে খায়, সেটাই ওর ভাত। আমরা পুজো করে খাই, এটাই আমাদের ভাত। যার যেখানে, যা করে অন্ন—সে তো আলাদা হবেই। এক এক জনের এক এক রকম। আমার ভকতে খাওয়াতে মন চাইছে। তুই আমায় ব্যবস্থা করে দে বাবা—
—তোমার কি হয়েছে বলোত !
—কি আবার হবে।
—তাহলে মাথা খারাপের মত এ'সব বলছো কেন ?
—দে বাবা
—তুমি ভূত ভোজন করাবে বলে ঘরের জিনিস বার করতে হবে ?
—তাহলে আড়াইশো টাকা দে।
—কত টাকা ?
—আড়াইশো।
—আমার টাকার গাছ আছে ?
—এটুকু টাকা ভগবানের দয়ায় তোর আছে বাবা। দিতে পারিস—
—তুমি কি ভেবেছো বলোত ?

—মায়ের একটা সাধ মেটাবি না।

—এর নাম সাধ ? এতো ক্ষ্যাপামি

—যদি বলতুম গঙ্গাসাগর যাব, কাশী যাব, পাঠাতিস ?

—সে সব তীর্থ। মানে আছে।

—এই আমার কাছে তীর্থ।

—এই ভকতে খাওয়ানো ?

—হ্যাঁ। দিবি না ?

—তোমার লজ্জা করছে না ?

—সারা জীবন ধরে জনেজনে শুধু হাত পেতেছি, তোর কাছে হাত পাতছি, এতে আবার লজ্জা কি ?

—আমার এসব বাজে কথা শোনার ইচ্ছে নেই। তুমি এখন যাও এখান থেকে।

—আর কার কাছে চাইবো বল—

—কেন ? তোমার মেয়ের কাছে। তোমার মাথায় পোকা তো সে-ই জোগাচ্ছে

—সে কিছুই বলেনি। আমার মন চাইছে। দে বাবা—

—মা তুমি আমাকে রাগিও না বলছি।

মা আর ছেলের এইসব কথা হচ্ছিল বার-বাইরে, মাধবের ঘরে। সেখানে তৃতীয়জন কেউ ছিল না। শুধু ছেলে আর মা।

ছেলেরঘর থেকে মা বাইরে এল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, কিছু ভেবে, মা আবার তার ছেলের ঘরে গেল।

মাধব তাকাল। তার কপালে অজস্র বিরক্তি।

—আমি তাহলে লোকের কাছে হাত পাতবো, মা বলল।

—মানে

—তোকে বললাম যে

—মা, তুমি কি আমার মাথা নিচু করে দিতে চাও !

—তাহলে তুই দে

—আমি না দিলে তুমি ভিক্ষে করবে ?

—না হলে কোথায় পাব

—কেন করবে ?

—বললাম তো ভকতেদের সেবা করতে মন চাইছে

—যা খুশি মন চাইলেই হলো !

—আমি ঘরে ঘরে চাইব। তুই তো জানিস আমি ভিক্ষে করতে পারি

—খালি ভিক্ষে ভিক্ষে করছো কেন বলোত !

—তাই-তো করেছি।

—না করোনি।

—তুই বললে কি হবে। আমি জানি অনেক ভিক্ষে করেছি জীবনে—

—সে যা করেছ, উপায় ছিল না বলে করেছ। নিজের আর সংসারের জন্য করেছ। এখন তার কি ?

—আবার করবো আজ।

ছেলে তার মার দিকে তাকাল। তার পর মাধব তার দুই হাতে মার দু বাহু ধরে বলল, এই তোমায় ছুঁয়ে বলছি, তুমি যদি কারও কাছে একদানা চাল কিংবা একটা পয়সাও চাও, আমার দিব্যি রইল।

এই বলে মাধব তার মার শরীর থেকে নিজের হাত তুলে নিল। বলল, করো তোমার যা খুশি।

মাধবের ঘর থেকে বার হয়ে ধানের গোলার কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল বিধবা। সেখান থেকে ভিতরে অন্দরের দিকে তাকাল। তারপর ভিতরে না গিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

মাধবেরমা রাস্তা ধরে পায়ে পায়ে এগোতে লাগল। সে গ্রামের মধ্যে হাঁটছে। আপাত উদ্দেশ্যহীন।

কোথাও কোন তাড়া নেই। গ্রামের পথে লোকজনও বিশেষ নেই বড় একটা। মাঝে মাঝে দু'চার জন। কখনো কোন মোষ বা গরুর গাড়ি। ছই বিহীন। সারকুর থেকে সার নিয়ে মাঠে যাচ্ছে। নিজের মনে হাঁটতে হাঁটতে ব্রাহ্মণী মুসলমান পাড়ার কাছাকাছি চলে এল। এখানে মাঝে মাঝে দুটি একটি বাড়ির দেওয়ালে, কোনটায় হাত ও কোনটায় কাস্তে হাতুড়ি তারা আঁকা রয়েছে। তার মানে ভোট আসছে। মুসলমান পাড়ায় ভোট ভাগ আর ভোটের হাওয়া যেন প্রতিবার সবার আগে আসে।

মুসলমান পাড়ায় মস্ত পুকুরের নাম বিবি সায়ের। তার পাড়ে দাঁড়িয়ে এক দঙ্গল ছেলের কয়েকজন হাত থেকে গোবরের তাল ফেলছে একটা জায়গায়। অন্যগুলো দেখছে। মাধবের মা পায়ে পায়ে তাদের কাছে এগিয়ে গেল।

—কি করছিস রে তোরা।

—ঢ্যামনা সাপ, একজন বলল।

—তা তোরা কি করছিস ?

—গোবর চাপা দিচ্ছি।

—কেন ?

—হি হি, করে কয়েকজন হাসল।

মাধবের মা চোখ নামাল। বেশ বোঝা যায় একরাশ গোবরের তালের নিচে, একটা মস্ত মোটা সাপ নিজেকে গোল করে গোটানো অবস্থায় নিজেকে গোবর চাপা অবস্থা থেকে বার করার চেষ্টা করছে।

আরও তিনজন তিন তাল গোবর, গোবর চাপা সাপটার ওপর ফেলল। ফেলে, হি হি করে হাসতে লাগল। অথচ ছেলেগুলোর বয়স বড় জোর দশ থেকে বারো।

এই হাসি কেন, তা জানে মাধবের মা। গর্ভিনী ঢোড়া সাপকে গোবর চাপা দিয়ে খানিকক্ষণ রাখলে তার পেট থেকে বাচ্চাগুলো বার হয়ে আসে।

কি নিষ্ঠুর। আর কি ঘেন্নার। তোদের কি ভাগ্য রে! দুনিয়ার ছেলেরা এখন ইস্কুল যাচ্ছে, পড়াশোনা করছে, বল খেলছে। আর তোরা ? এই তোদের খেলা ? তোদের জন্মের কপাল।

আর একজন আরও এক তাল গোবর ফেলতে, সেখান থেকে সরে গেল মাধবমাস্টারের মা।

মুসলমান পাড়া, গয়লা পাড়া হয়ে গ্রামের অনেকটাই চক্রাকারে ঘোরা হয়ে গেল তার। পথের পাশে পুকুরঘাট থেকে কোন কোন মহিলা জানতে চাইল, কোথায় যাচ্ছ গো বামুন বৌ ?

—কোথাও না!

—যাচ্ছ তো!

—এমনি

—এমনি কোথায় যাচ্ছ বামুন মা!

—দেখছি রে

—কি দেখছো

—আমাদের গাঁ

—সে আবার কি কথা গো। গাঁয়ের আবার কি দেখছো

—অনেক

—কি যে হেঁয়ালি কর বাপু

—না গো, চোখ ফুটলে তবে তো দেখা।

—কি বলছো বলোত

—ওই যে বললাম, চোখ ফুটলে তবে তো দেখা।

দূরে একজন বুড়ি যাচ্ছে। দেখে বোঝা যায় খুব বুড়ি। বুড়ির মাথায় একটা বোঝা। বাঁ হাতে একটা লাঠি। হাতের লাঠি মাটিতে ভর দিয়ে, মাথার বোঝা নিয়ে নুব্জা বৃদ্ধা বড় ক্লেশে পথ ভাঙছে। মাধবেরমা পিছন থেকে এগিয়ে সেই বৃদ্ধার অনেক কাছে এসে গেল। বৃদ্ধার শাড়ি বড়ই পুরানো। ময়লা। তার ভিতরের গা দেখা যায়। শাড়ির তলায় দ্বিতীয় আড়াল নেই। এখানে ওখানে ছেঁড়া। তার মাথায় ঝুরিতে কাঠকুটো। ভারি নয় এমন কিছু। কিন্তু ও যেন আর বইতে পারে না।

সেই বৃদ্ধার হাতের নাগালের মধ্যে আসার আগেই মাধবমাস্টারের মা চমকে উঠল। এ যে শম্ভুর মা। শম্ভুর মা আর সে সমান বয়সী। ক'মাস আগে পরে দুজন বৌ হয়ে শুধারে এসেছে। শম্ভুর মা এসেছে আগে। তার ছ' সাত মাস পরে সে। শম্ভুর বাবা ছিল হৃদয় পুরুতের কিরষেন, জমি চাষ করতো। শম্ভুর মা তাই হৃদয় পুরুতের বাড়িতে ধান ভেনে দিত। ফাইফরমাস সামলাত। মুড়ি ভেজে নিয়ে আসত বাড়িতে। দুজনের ভাব ছিল, খুব ভাব ছিল এক সময়। দুজনের মধ্যে অনেক গল্প আর মাঝে মাঝে হাসি তামাসাও ছিল এক সময়।

হ্যাঁ, তা বয়স বোধহয় প্রায় ৭০ হল। তারও হল। তাই বলে শম্ভুর মা এত ভাঙা চোরা! সে তো নয়।

শম্ভুর মার চোখে পায়রার ডিমের মত নিকেলের চশমা। একটা কাচ ফাটা। পুরু ধুলো দু'কাচেই। চশমার একটা ডাণ্ডি নেই। সুতো।

মাধবের মা, শম্ভুর মার মাথার ঝুরিতে হাত দিয়ে বলল, আমায় দাও।

—কে গা!

—আমি মাধবের মা।

—এ্যাঁ। কে গা!

সরু গলা। অতি দুর্বল স্বর। এইটুকু কথা বলতে থেমেছে। ধুকছে। কাঁপছে। বোধহয় কানেও ঠিক ঠিক শুনতে পায় না। মাধবমাস্টারের মা

তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গলা তুলে বলল, আমি। মাধবের মা।
—বামুন বৌ ? শম্ভুর মা হাসল। কি শীর্ণ মাড়ি।
—কোথায় যাচ্চো গা
—এটা দিলে, শম্ভুর মা মাথার ঝুরি দেখাল।
—দিলে কেন ?
—মুড়ি দেবে।
এই কটা কাঠকুটো রোজ কুড়িয়ে একটা বাড়িতে পৌঁছে দেয় শম্ভুর মা। এই শ্রমের বিনিময়ে বৃদ্ধাকে তারা মুড়ি দেয় খেতে।
হৃদয় পুরুতের বিধবা, শম্ভুর মার মাথা থেকে ঝুড়ি নিয়ে নিজের মাথায় নিল। তারপর মাথা থেকে ঝুড়ি নামিয়ে দুহাতে নিজের বুকের কাছে ধরে বলল, চলোগো শম্ভুর মা—
—তুমি যে বামুনবৌ গো
—চলো
—তুমি যে ভদ্দর লোকের মেয়ে গো
—চলো তুমি
—তুমি বইলে আমার পাপ হবে গো, তুমি যে বামুন বৌ—, কাতর, নুব্জা বৃদ্ধা সব কথা গলা তুলে বলতে পারল না! তার পরনে কোথাও কোন অন্তর্বাস নেই। পায়ে পায়ে রোদ লেগে গা দেখা যায়। সারা শরীর পুরনো বাতিল পচা কিসমিসের মত করুণ।
—চলো, তোমায় একটু এগিয়ে দি
মাধবমাস্টারের মা আর শম্ভুর মা পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

ইতিমধ্যে চড়কের দিন সকালে, মন্দিরে বাবা বাগেশ্বরের পূজা শেষ। দেবতার মাথায় প্রতিবারের মত একরাশ ফুল চাপিয়ে মাটির ওপর প্রসারিত ভিক্ষাপাত্রের মত দুই হাতের পাতা মেলে বসেছিল পুরোহিত মাধব। মন্দিরের বাইরে অজস্র নারী পুরুষ প্রতিবারের মত জোড় হাতে দাঁড়িয়েছিল। পট্টবস্ত্র পরিহিত ফোটো বাবু বসেছিল পা ঢেকে। গাজনের সন্ন্যাসীরা থেকে থেকে মন্দির প্রদক্ষিণ করে ধুয়ো দিচ্ছিল—বা-বা-আ-আ-বাগে-শ্ব-অ-রে-এ-এ-র—। মাধবের বাঁ পাশে বসে ছিল পরাণ। পিছনে স্মৃতি। একসময় দেবতার

মাথা থেকে আপনি ফুল পড়ল মেঝের উপর পাতা মাধব পুরোহিতের হাতের তালুতে। শতগুণ হয়ে ঢাক আর কাঁসি বাজতে লাগল।
শুধু পাশে মাধবমাস্টারের মা থাকল না। এযে অসম্ভব। তথাপি সত্য। স্মৃতিও জানত না মা কোথায়। তার দাদা তার কাছে একবার জানতে চেয়েছিল। সে বলেছিল, জানিনা। স্মৃতি বুঝেছিল দাদা তার কথা বিশ্বাস করেনি। মা কোথায়, কারও কাছে এই কথা জানতে চাইবে, এমন কেউ কাছাকাছি ছিল না স্মৃতির। তার বৌদিরা কোনদিনই এই সময় মন্দিরে আসে না। এবারও আসেনি।
'ফুল পড়া' হয়ে গেলে স্মৃতি দ্রুত বাড়ি ফিরে এল। দেখল, ঠাকুর ঘরে—
—যেটা তাদের মা ও মেয়ের শোবার ঘর—মা ঠাকুরের সামনে বসে আছে।
—মা তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?
মা উত্তর দিল না।
—মা, স্মৃতি আবার ডাকল।
—আমায় একটু একলা থাকতে দে।
চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল স্মৃতি। কিছুক্ষণ। সে ঘর থেকে বাইরে আসার জন্য ফিরল।
—শোন, মা ডাকল পিছন থেকে।
—বলো
—আমি আজ একজন ভকতের সেবা করেছি
—কোথায় ? তুমি তো মন্দিরেই যাওনি
—আমার প্রাণে বড় আরাম হচ্ছে।
স্মৃতির মার দু'চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। স্মৃতি দেখল তার মার সারা মুখে প্রশান্তি। স্নিগ্ধ। শান্ত, ছড়ানো হাসি এক মুখ তৃপ্তির মত মার মুখে ভাসছে। মার এমন মুখ সে কোনদিন দেখিনি।
মার পাশে বসে স্মৃতি নিজের আঁচলে মার চোখ ও মুখ মুছে বলল, কি হয়েছে মা ?
—কিছু ভাবিস না। আমায় একটু একলা থাকতে দে।
স্মৃতি ঘর থেকে বার হয়ে এলো।

২৮

॥ ব্রাহ্মণী ॥

বাগেশ্বরের মন্দির আসলে বেদীর ওপর বেদী। দ্বিতীয় বেদীর ওপর মন্দির। ইঁটের মন্দির। গারার গাঁথনি। ওপরে সিমেন্ট পলেস্তারা। মাটি থেকে উঠে গেছে প্রায় ৭ হাত চওড়া সিঁড়ি। আটদশ ধাপ সিঁড়ি উঠলে প্রথম বেদী। অর্থাৎ চাতাল। ক'পা গিয়ে সেই চাতালের ওপর আবার সিঁড়ি। এবার সিঁড়ি চওড়া ৩ হাত মত। তারপর চার ধাপ উঠে আবার বেদী বা চাতাল। এই চাতালের ওপর, মন্দিরের কপাটের সামনে, চাতালের ওপর কিছু জায়গা। মন্দিরের মাথায় ত্রিশূল।

মন্দিরের সামনে বটগাছ ঘিরে চারদিকে বেখাপ্পা ভাবে ছড়ানো গাজন তলা। তেলেভাজা, মণ্ডা, লাড্ডু-ও কিছু কিছু ছানার মিষ্টি এই নিয়ে তিন চারটি খাবারের দোকান। চুড়ি, আলতা, ছুরি, মুখোস, ফিতে, চেন, আয়না, রবারের বল এই সবের দোকান পাঁচটি। শুধু পাঁপড় ভাজার দোকান সাত আটটা। চিনেবাদান, ছোলা, আলুকাবলি এ' সবের আরও ছোট ছোট দোকান। বাক্সে ভরা লাল, রোগা আইসক্রীম, দাম ৩০ পয়সা। চোঙার ভেতর বায়োস্কোপ, ওপরে কলের গান। একটা চারদোলার নাগর দোলা। মনুষ্য চালিত। আজকাল মেলাতলায় তালপাতার বাঁশি বড় একটা শোনা যায় না।

মেলাতলায় যারাই দোকান দেয়, তাদেরই প্রণামী দিতে হয়। বাজারের মত একেও 'তোলা' বলা যেতে পারে। প্রাপক বাবা বাগেশ্বরের দেবত্র অংশ। টাকা যা ওঠে তা এইসব আয়োজনেই খরচা হয়। তার হিসেব থাকে আলাদা। বাগেশ্বরের দেবত্র অংশের ব্যাপার হলেও এইসব টাকা তোলা ও বিলিব্যবস্থার জন্য 'গাজন কমিটি' আছে। গাজন কমিটির সদস্যরা নির্বাচিত নয়, মনোনীত। ভারতবর্ষে এক বিশেষ রাজনৈতিক দলে গত প্রায়

১২ বছর দলের পদাধিকারী নেতারা যেমন নির্বাচিত নন, মনোনীত—অনেকটা তেমনি। তবে গাজন কমিটির পরমায়ু পাঁচ কি ছয় সপ্তাহ। এরই মধ্যে পদত্যাগ বা কয়েকজন মিলে কমিটির বাইরে চলে যাবার হুমকি, এমনকি পাল্টা কোন উৎসবের প্রস্তাব, প্রতিবারই আছে। টাকা নয়ছয়, আত্মসাৎ, বিশ্বাস ভঙ্গ, অসাধুততা ইত্যাদির অভিযোগ, ও তা নিয়ে গাজন কমিটিতে নানা কোন্দল, প্রায় গাজনেরই অঙ্গ।

গাজন তলায় পসরা নিয়ে বসার জন্য সব থেকে বেশী তোলা, অর্থাৎ টাকা নেওয়া হয় তার কাছ থেকে, যে জুয়ার ছক পাতে। জুয়ার ছক কে পাতবে, পাতার একমাত্র হক হবে কার, এই নিয়ে জুয়াড়ীরা নির্দিষ্ট দিনে 'ডাক' দেয়। ডাক এ সবচেয়ে বেশী অর্থ কবুল করে যে, একমাত্র সে-ই জুয়ার ছক পাতবার অধিকার পায়। দু' রকম জুয়া বসে। একটা হল--

এবারও সব দৃশ্য পূর্ববৎ। গাজনের প্রস্তুতিপর্ব থেকে আজ চড়কের দিন পর্যন্ত নেপথ্য ও প্রকাশ্য সব ঘটনা সহ মেলার গোটা আবহ প্রতি বছরের মতোই। এবারও বিকেল হবার আগে থেকেই ছোট ছোট সব মাটির ঘোড়া প্রায় ২৪/২৫টা রাখা হয়ে গেছে মন্দিরের এখানে ওখানে। এ গুলি মানতের, অর্থাৎ মানসিকের ঘোড়া। মানতকারী ভক্ত মনে মনে বাবা বাগেশ্বরের কাছে তার মনের বিশেষ বাসনা, ইচ্ছা, ও মিনতি জানিয়ে ঘোড়া রেখে যায় এমনি করে। মাত্র একদিন ঘোড়া গুলি থাকে। তারপর দেখা যায় পড়ে আছে মন্দিরের চাতালে, এখানে ওখানে। ভাঙা, আধভাঙা অনেক ঘোড়া পড়ে থাকতে থাকতে বৃষ্টিতে ভেজে। ভিজুক। যে রেখে গেছে, রেখে যাওয়ার পর সে পাশদিয়ে হেঁটে গেলেও এদিকে তাকায় না। রেখে যাওয়া, মানে, রেখে যাওয়া। মনস্কামনা পূর্ণ হলে, মানতকারী নতুন ঘোড়া এনে রাখে মন্দিরের ভেতর। সে ঘোড়া থাকে মন্দিরের ভেতর টানা এক-বছর। একবছর পর মানতকারী পুজো দিয়ে মন্দির থেকে সে ঘোড়া নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। গৃহদেবতার কাছে রাখে। মনস্কামনা সিদ্ধ হওয়া কি কম কথা। তার জন্য কর্মফল, জপতপ, দান ধ্যান, প্রারব্ধ,—অর্থাৎ পূর্বজন্মের হিসেব নিকেস ইত্যাদি কত কিছু চাই। তবু দুই বা তিন বছর অন্তর মনস্কামনা সিদ্ধির হেতু দেখা যায়, বাবার নিজস্ব কালো ঘোড়া ছাড়াও একটি বা হয়তো দুটি ঘোড়া মন্দিরে টানা বারোমাস আছে।

আজ রাত্রে মন্দিরের সামনে, গাজন তলায় পালা গাইবে, যাত্রা করবে গ্রামের

ছেলেরা, অর্থাৎ শুধারে মিলন সমিতি। প্রতিবারের মত এবারও মহড়া চলাকালীন যাত্রা-না-হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে ও পালার অনুল্লেখ্য কিছু ছোট ছোট ভূমিকায় কুশীলব বদলের পর এবারও যাত্রা হবে আজ। আরম্ভ হতে হতে রাত দশটা। তবে আসর ভরতে শুরু হবে সন্ধ্যা আটটা থেকে। রাত যত এগোবে, তত জমবে যাত্রা আর জুয়া। রাত বাড়লে জুয়ার ছক সরে যাবে অনেক তফাতে। সেখানে পেট্রোমাাক্সের আলোয় কিছু মাতাল আর কপালঠুকে কপাল চাপড়াবার কিছু কপাল, জুয়ার ছকে ভোর হওয়া পর্যন্ত অন্ধের মত, বাঁধা থাকবে।

প্রতিবার যেমন হয়ে থাকে, এবারও বাগেশ্বর মন্দিরে 'ফুল পড়া' হয়ে গেলে, মন্দিরের চাতালের দু' থাকেই সতরঞ্চি, চট, থলি, এইসব পাতা হতে থাকল। জায়গা তথা আসন সংরক্ষণ। এখানে বসে পালা দেখাও সুবিধে। বেশ খানিকটা উঁচু থেকে আসরে নির্বাধ দৃষ্টিক্ষেপ করা যায়। অনেকটা বকস্'এ বসে থিয়েটার দেখার মত।

দুভাগে মন্দিরের পুরো চাতালের সবটাই শুধু মহিলাদের জন্য। নারী ও শিশু ছাড়া আর কেউ এখানে বসতে পারে না। তাও গ্রামের তথাকথিত ভদ্র—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ইত্যাদি পরিবারের মহিলারাই সবটা দখল করে নেন। কিন্তু এখন আর ঠিক আগের সেইসব দিন নেই। হাওয়া বদলাচ্ছে। এখন গোয়ালাপাড়ার অনেকে ও শুঁড়ি বাড়ির পুরবাসিকারা এখানে বসছেন। ওদের কাঁচা পয়সা বেশ। তা বোঝা যায়। আর যেখানে পয়সা, সেখানে দাপট। শুধু দাপটই বা কেন, এসো দিদি, বসো ভাই, সব ভাল তো ? হেঁ হেঁ—

গাজন উপলক্ষ্যে গ্রামের অনেক বাড়িতেই কুটুম আত্মীয়ের সমাগম। কোন কোন ঘর থেকে শুধু মহিলা আর কুচোকাচা নিয়ে দশ বারো জন আসবে। তাই চাতালে আগে থেকে জায়গা দখলের একটা ব্যাপার আছে।

একসময় মাধবমাস্টারের মা এলো সেখানে। তাঁর হাতেও গোল করে গোটানো কটা চট। আরও উপস্থিত কজনের সামনে মাধবমাস্টারের মা, একেবারে মন্দিরের দরজার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে, হাতের গোটানো চট, চাতালের ওপর রাখল।

কে একজন বলল, তুমি আবার কেন গো বামুনদিদি, এ জায়গাতো তোমাদের বাঁধা।

কথাটা মিথ্যা নয়। পুরোহিত পরিবারের অন্তঃপুরিকা ও শিশুদের জন্য এ জায়গা ছাড়াই থাকে। সমীহ। তবু গত কয়েক বছর মাধবের মাও যা হোক কিছু, আগে এসে বিছিয়ে রাখে। জায়গার গায়ে তো তালা দেওয়া যায় না।

—বাঁধা বলে কিছু কি আর আছে রে ভাই, না থাকতে পারে? এই বলে মাধবমাস্টারের মা উবু হয়ে বসে গোটান চটে হাত দিল। বলল, জগৎ সংসারের নিয়মই আলাদা। কেউ বাঁধা নয়। আমি নয় তুমি নয়, কোন নিয়মও নয়। সবই বদলায় গো।

—তা যা বলেছো বামুন মা, গয়লা তো গয়লা। শুঁড়িরাও এখান বসে যাত্রা শুনছে। সাহস দ্যাখো।

—সাহসের কি আছে বাপু, মানুষ তো! মাধবের মা বলল।

—তাহলে তো চামার, ডোম, সাঁওতাল সবাইকে বসতে দিতে হয়।

মাধবের মা কোন উত্তর না দিয়ে আস্তে আস্তে গোটান চট খুলতে লাগল।

—ওরাও বসল বলে, আর একজন বলল।

—ভদ্দর লোক বলে আর আলাদা কিছু থাকবে না মা,

—কি করে থাকবে? ভোটের সময় জাতপাত নেই, অন্য সময় থাকবে কি করে?

মাধবমাস্টারের মার চট খোলা হয়ে গেল। ভিতরে বাকুর কাঠের ঘোড়া।

—তোমার এই এক হয়েছে বামুনদি। নাতির ঘোড়া বয়ে বেড়াচ্ছো—

—আর বলিস না। আসবে বলে বায়না করছিল। তাই ঘোড়াটা নিলুম। সঙ্গে না নিলেতো এক পা নড়বে না।

—নাতি তোমার ঘোড়া চেপে কোথায় যাবে গো বামুন মাসী?

—কে জানে বাপু।

মাধবমাস্টারের মার চট বিছানো হয়ে গেল।

আর একটু পরেই যাত্রা আরম্ভ হবে। হারমোনিয়াম মাস্টারের সঙ্গে পোঁ পোঁ করে বাজছে নানা বাদ্যযন্ত্র। দুই পুত্রবধূ, দুই নাতনী, বাকু, স্মৃতি আর মাধবমাস্টারের মা বসেছে, মন্দিরের দোর গোড়ায়। মাধবমাস্টারের মার কোলের ওপর নাতির কাঠের কালো ঘোড়া। পাশেই পাটকরে রাখা

ছোট সতরঞ্চি। বাকু ঘুমিয়ে পড়লে এতে শোবে। না হলে ঠাণ্ডা লাগতে পারে। মেয়েরা পান খাচ্ছে অনেকে। গল্প করছে। ড্রাম শুরু হয়ে গেল। সব চোখ আসরের দিকে।

—মন্দিরের ভেতরে কি শব্দ হল না?

কেউ কোন সাড়া-শব্দ দিল না। স্মৃতিও না।

—বড় বৌমা, চাবি তো তোমার কাছে। তালা খুলে ভেতরটা দ্যাখো।

—ছোটও চলুক তাহলে।

—জানোনা, ওর শরীর খারাপ। মন্দিরের ভেতরে যাবে?

—একা গা ছম্ ছম্ করে।

—চারদিকে গিজ-গিজ করছে লোক।

—তাহলে ঠাকুরঝি চলুক।

কোথাও কিছু নেই। ওরা শিকল তুলে আবার মন্দিরে তালা দিয়ে বসে পড়ল। যাত্রাপালায় মন দিল সবাই।

—ওই আবার, মা বলল।

—কই মা, স্মৃতি বলল।

—শুনতে পেলি না?

—না তো।

—চাবিটা দাওতো বড় বৌমা।

চাবি নিয়ে নিজেই তালা খুলল মাধবমাস্টারের মা। ঝনাৎ করে শিকল পড়ার শব্দ হল আবার।

মন্দির থেকে বার হয়ে এলো একটু পরেই। আবার শিকল তোলা। চাবি।

—আমার টর্চের ব্যাটারিতে জোর নেই। কিছু দেখতে পেলাম না, এই বলে বসে পড়ল।

সামনে পালা সমানে এগিয়ে যাচ্ছে। ভাঁড় এসেছে আসরে। লোক হাসাচ্ছে।

—শব্দ হল না? স্মৃতি বলল।

—শুনতে পেলি তুইও? মা বলল।

—এবার পেলাম। বড় বৌদি, তুমি শুনতে পেলে?

বড় বৌ তখন খুব হাসছে। —ও বৌদি!

—দাঁড়া, মাধুকে ডেকে আনি।

মা উঠে পড়ল। চাতাল থেকে নেমে আসরকে পাশ কাটিয়ে, মাধবমাস্টারের মা গেল সাজঘরের কাছে, ছেলের কানেকানে কথা বলল মা। দু'টো জোরালো টর্চ নিয়ে মা'র সঙ্গে মাধব আর ফোটো মিত্তির উঠে এলো চাতালে। চাবি নিয়ে তালা খুলল মাধব।
দু'টো টর্চের জোরালো আলো ঠিক্‌রে উঠল মন্দিরের ভেতর। দেবতার মাথায় একরাশ ফুল। বেলপাতা। পূজোপকরণ। পঞ্চমুণ্ডী শাঁখ। মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার জন্য, একজন ভক্তের আজ সন্ধ্যায় রেখে যাওয়া নতুন ঘোড়া এক পাশে। স্বস্থানে নিজস্ব কালো ঘোড়া বাবা বাগেশ্বরের। অনড়।
—দরজা ভেজানো থাকুক। তালা দিও না। শব্দ হওয়া মাত্র ভেতরে যাবে। চুরি হওয়ার তো কিছু নেই—, মাধব নির্দেশ দিল।
—কিন্তু শব্দটা হচ্ছে কেন? ফোটোকে চিন্তিত দেখাল।
—সেটাই প্রশ্ন, অনেকটা আপন মনে বলল মাধব।
—কি ধরনের শব্দ হচ্ছে? ফোটো মাধবমাস্টারের মার কাছে জানতে চাইল।
—মনে হচ্ছে কিছু একটা যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে।
—কিছু একটা মানে? কি কিছু?
—কি করে বলবো বাবা।
—আপনিও শুনেছেন? ফোটোর এই প্রশ্ন মাধবমাষ্টারের প্রথমা স্ত্রীর উদ্দেশ্যে! সে অকারণে খানিকটা ঘোমটা টেনে বলল, হ্যাঁ ঠাকুরপো।
—আপনারা এতজন রয়েছেন, সবাই সঙ্গেসঙ্গে ভেতরে গিয়ে দেখতে পাচ্ছেন না?
—তালা খুলতে সময় যাচ্ছে যে, মাধবমাস্টারের মা বলল।
—তাইতো বলছি, এখন তালা দিও না। শব্দ হলেই ভেতরে যাবে।
স্মৃতি কোন কথা বলল না।

মাঝে মাঝেই উঠে মন্দিরের ভেতরে যাচ্ছে মাধবমাস্টারের মা। আবার এসে বসছে। এতবার হল, যে তার এই ওঠা বসা আর কেউ খেয়াল করছে না। পালা শুরু হয়েছে রাত পৌনে এগারোটায়। এখন রাত প্রায় ১টা। মা আর দিদিমার দুই কোলের মাঝা-মাঝি বাকু ঘুমিয়ে গেছে অনেকক্ষণ।
—ওর হিম লাগছে।

—ওকে নিয়ে আমি বাড়ি যাবো মা।

—চল। আমিও যাব। ঘুম পাচ্ছে।

এই বলে ঘুমন্ত বাকুকে মেঝের থেকে তুলে স্মৃতির কোলে দিল মাধবমাস্টারের মা। বাকুর কাঠের ঘোড়া দিল ছোট বৌ'র হাতে। বলল, এটা একটু ধরতো বাপু। শ্বাশুড়ির হাত থেকে সেটা নিয়ে বিরক্ত ছোটবৌ সেটা পাশে রেখে আবার যাত্রাপালায় মগ্ন হল।

ইতিমধ্যে মা মেঝেয় পাতা সতরঞ্চি, যাতে সে, স্মৃতি ও বাকু বসেছিল, সেটি গোল করে গুটিয়ে নিয়েছে।

মা বলল, দাঁড়া। যাবার আগে আর একবার দেখে যাই। সতরঞ্চি হাতে মন্দিরের ভেতরে চলে গেল ব্রাহ্মণী। ভেতর কাঁপছে তার। এই মন্দিরে, এখন তার মৃত স্বামীকে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। মনে হচ্ছে তার শ্বশুর বংশের সব পূর্ব-পুরুষ, যাদের সে কোনদিন দেখেনি, তারা সবাই মন্দিরের ভেতর সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। তার বুক কাঁপছে। হাত কাঁপছে। মনে হচ্ছে, মাধব মন্দিরের এক পাশে দাঁড়িয়ে অপলক তার দিকে চেয়ে আছে। মাধবের করুণ দু'চোখ দেখে যেন বুক ফেটে যাবে তার মার। এই সময় চারদিক থেকে কারা যেন সমস্বরে উলু দিল। তার বিয়ের দিনের উলুধ্বনি কত বর্ষ পার হয়ে যেন এই মুহূর্তে আবার তাকে ঘিরে মঙ্গলাচরণ করছে।

আর সময় নেই। অপেক্ষা অসম্ভব। ব্রাহ্মণী তার দুহাত বাড়িয়ে দিল।

—ঠাকুর, হে বাবা বাগেশ্বর, আমি তোমার ঘোড়া নিতে এসেছি। ঠাকুর, এই তোমার ঘোড়া নিলাম। তুমি জানো, কেন নিচ্ছি!

সতরঞ্চির ভাঁজে বাগেশ্বরের ঘোড়াকে গুটিয়ে নিল ব্রাহ্মণী। চারদিকে কোটি কোটি শাঁখ বাজছে।

মন্দিরের ভিতর থেকে বার হয়ে এলো মাধব মাস্টারের মা!

—যাবার সময় মন্দিরের দরজায় তালা দিও বড় বৌদি।

সবাইকার চোখের সামনে দিয়ে ঘুমন্ত বাকুকে কোলে নিয়ে স্মৃতি যাচ্ছে আগে আগে। পিছনে গোটানো সতরঞ্চি হাতে মাধব মাস্টারের মা।

ছোটবৌ বলল, আক্কেলটা দেখলে। নাতির সাধের ঘোড়া উনি ফেলে গেলেন।

—তুই নিয়ে যাবি বয়ে, বড় বৌ বলল।

—বয়ে গেছে আমার।

মেলার থেকে ততক্ষণে ওরা তফাতে চলে গেছে। এখানে জুয়া খেলা হচ্ছে। ওরা জুয়ার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল।

বাকুকে ঘুম থেকে তুলে দিয়েছে তার মা। সামনে পথের ওপর পরাণ দাঁড়িয়ে। ওরা যাবে নেপ পুকুর। সেখানে বাদল অপেক্ষা করছে।

—এ আমি কি করলাম ভগবান?

—মা!

—আমার বুক ফেটে যাচ্ছে রে। এ আমি কি সব্বোনেশে কাজ করলাম তোর কথায়—

ব্রাহ্মণী হয়তো চিৎকার করে কেঁদে উঠত। তার আগেই মা'র মুখে হাত চাপা দিল স্মৃতি। আর পরাণকে বলল, এটা নাও। সামলে।

মাধবমাস্টারের মা'র হাত থেকে সতরঞ্চি মোড়া ঘোড়া চলে এলো পরাণের হাতে।

—আমরা কোথায় যাচ্ছি পরাণ মামা?

—ভগবানের ঘোড়া আমাদের নিয়ে যাচ্ছে।

—কোথায়?

বালকের এই প্রশ্নের উত্তর পরাণের জানা নেই। নেপ পুকুর কোন গন্তব্য নয়, সেটা সে বোঝে। আসলে এ যাত্রা, বহুদূরের যাত্রা, তাও পরাণ আবছা বুঝতে পারছে। কিন্তু কতদূর যাবে তারা, এবং কোথায়, তা পরাণ জানে না। পরাণ স্মৃতির মুখের দিকে তাকাল।

স্মৃতি বলল, আমরা সবাই দাঁড়িয়ে গেছি কেন? চলো তাড়াতাড়ি।

২৯

॥ "এতদিনের পর
এলো নিজের ঘর
বাবা বাগেশ্বর" ॥

পরদিন ১লা বৈশাখ। নতুন বছরের প্রথমদিনের প্রথম সকাল। ভোরের আলো পুরো ফুটেওঠার আগেই নেপপুকুর পাড়ে, পাকুড় গাছের গোড়া ঘিরে চালার তলায় আবির্ভূত হলো বাবা বাগেশ্বরের নিজের কালো ঘোড়া। আর চালার মাটির দাওয়ায় আলতা মাখা পায়ের ছাপ। দেখে মনে হয় আলতা মাখা টুকটুকে পা ফেলে ফেলে কেউ যেন পাকুড় গাছের দিকে হেঁটে গেছে।

প্রথম প্রথম একটি দুটি, তারপর তেঁতুলে পাড়া, নোয়ার পাড়া, বাগদি পাড়া, দাস পাড়া, নামো পাড়া থেকে দলে দলে স্ত্রী পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা সবাই আসতে লাগল সেখানে।

—এখানে, এইখানে দেবতার অবির্ভাব হয়েছে।

বাতাসের ঠোঁটে বার্তা ছুটল দশদিকে। আলকাফ, হিজলগোড়া, ঝিমুটি, আশুতোষপুর জামবোনা থেকে কাতারে কাতারে লোক চলতে লাগল সেই দিকে। এই সারা অঞ্চলে যে প্রাচীনতম মানুষ, যাকে সবাই বলে 'তেমাথা,' সে-ও তার জন্মে, এমনকি তার পিতামহের মুখেও এমন কথা শোনেনি। শুনলেও গায়ে কাঁটা দেয়। বাতাসও যেন কাঁপছে। দেবতা এসেছেন? হ্যাঁ, তিনিই এসেছেন। তিনি।

গতরাতে বাগেশ্বরের গাজন তলায় যাত্রা শেষ হয়েছে মাঝরাতের পর। মাধব মাষ্টারের প্রথমাস্ত্রী যাত্রা গানের শেষে নিজে মন্দির দেখে, নিজের হাতে শেকল তুলে, নিজে মন্দিরে তালা দিয়েছে। আসলে সে মন্দিরের ভেতরে যায়নি। অর্থাৎ বাইরে তালা দেবার আগে নিজে মন্দির দেখেছে কথাটা

ভুল। কিন্তু তালা দেবার আগে মন্দিরের ভিতর দেখেনি বললে পাছে দোষ তার ওপর বর্তায়, তাই সে কেবলই জানাল, সে ঠিকই দেখেছে। তখন সবই ঠিক ঠাক ছিল। দেবতার ঘোড়াও।

তাহলে ?

এ কি সম্ভব ?

মাধবমাস্টার তার বুক চাপড়ে দেখল, বুকে লাগছে। মাধব মাটিতে কপালঠুকে দেখল, কপালে লাগছে। মানুষের শরীরে বড় বেশী যন্ত্রণার স্থান। বড় লাগে।

—চলো, আমরা ওখান থেকে জোর করে বাবার ঘোড়া নিয়ে আসবো, মাধব বলল।

কিন্তু তাকে ঘিরে বড় জোর পঁচিশ, ত্রিশজনের জটলা। তার মধ্যে আবার ফটিকবাবুকেই যা উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে। আর সকলে তো মোটামুটি দর্শক। মাধবের পক্ষে, মাধবের সাথে লোকজন বলতে যা বোঝায়—তা কই ? গ্রামের সিডিউল পাড়ার সবাইতো ওখানে। গোটা বাবুপাড়া নিতান্তই সংখ্যালঘু। একে 'জনবল' বলে না। লড়াকুতো নেইই। গোয়ালারা লড়তে পারে। শরীর ও সামর্থ দুই-ই গোয়ালাদের আছে। কিন্তু তারা নিরপেক্ষ থাকল।

বর্দ্ধমান চলল মাধব, ফটো ও আরও কয়েকজন। কেস ডায়েরি হল।

পুলিশের তিনটি জীপ ছুটল বর্দ্ধমানের বড় থানা থেকে শুধারের দিকে। তিনটি জীপ—যাতে ১৫।১৬ জন সেপাইও আছে।

ইতিমধ্যে বাগেশ্বরের গাজনের মেলাতলা থেকে একটি দুটি করে অনেক ছোট ছোট দোকান সরে এসেছে নেপপুকুর পাড়ে।

পুলিশের জীপ, পর পর তিনখানা যখন সেখানে এল, তখন পুজো হচ্ছে দেবতার। অজস্র পুজোপচার সাজানো রয়েছে পাকুরগাছের গুঁড়ি ও বাবাবাগেশ্বরের ঘোড়া ঘিরে। পুজো করছে পরাণ। স্মৃতি আছে। বাকু আছে। মাধবমাস্টারের মা আছে। আর আছে সেই সন্ন্যাসী।

পুলিশের জীপ পাকুরগাছের কাছাকাছি আসার আগেই শোনা গেল, পুলিশ আসছে। পুলিশ।

সন্ন্যাসীকে সামনে রেখে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে গেল পাকুড়গাছ ঘিরে খড়ের চালার চারদিকে। অনেকেরই চোখ মুখ চকচক করছে।

—এ ঘোড়া মন্দিরের তাতো সত্যি, এই কথা বলে দারোগা, জীপের গায়ে

হাতের রুলের মৃদু আঘাত করলেন।

—সত্যি।

—এখানে এলো কি করে ?

সন্ন্যাসী এ কথার উত্তর দিল না।

—আমি জানি কি করে এসেছে, দারোগা বললেন।

—বলুন

—চুরি করে চোর নিয়ে এসেছে।

—কে চুরি করেছে ?

—সেটা থানায় গেলেই টের পাবেন।

—চুরি প্রমাণ করতে পারবেন ? সাক্ষী আছে ? সন্ন্যাসী দৃঢ় ও উচ্চকণ্ঠ।

—তাহলে মাটির ঘোড়া ওখান থেকে এখানে আসে কি করে মশায় ?

—দেবতার ইচ্ছায়।

—দেবতা মানে

—ভগবান

—ভগবানের ইচ্ছেতে মাটির ঘোড়া চলে নাকি ?

—চলে।

—চলে ?

—নিশ্চয়ই চলে। অন্ধ চোখ পায়, আর মাটির ঘোড়া চলতে পারে না ?

মাধব বলল, আমায় মাকে একবার ডাকুন।

সন্ন্যাসী বলল, তিনি এখন আসতে পারবেন না।

—আমি আমার মাকে ডাকতে বলছি, তুমি চুপ করো।

—এখন পুজো হচ্ছে। তিনি আসতে পারবেন না।

দারোগাবাবু ইতিমধ্যে চারদিকে কিছু খুঁটিয়ে ও নজর করে দেখলেন। চারদিকে শুধু খেটে খাওয়া মানুষ জনের মাথা। অজস্র। জন গণেশ ?

—আমার মাকে ডেকে পাঠান আপনি।

কপালের ওপর ঘোমটা সামান্য টেনে এসে দাঁড়াল ব্রাহ্মণী।

চারপাশ হঠাৎ আরও নীরব হয়ে গেল।

—মা, মাধব ডাকল।

—আমায় বলতে দিন, এই বলে দারোগা বললেন, দেবতার ঘোড়া আপনি ফিরে দিন মা।
—আমি দেবার কে ?
—আপনি দিন।
—এ তো আমার একার নয়।
—আপনি যখন নিজে এখানে রয়েছেন, তখন এ আপনার।
—ভুল বাবা। আমি কে ? এ সকলের—
চারদিকে ধুয়ো উঠলে: বাবা বাগেশ্বরের—দোয়া—আ—লাগে—এ-এ—ওং শিবো—ও—ও মহেশ্বর:—
এবং দারোগা মুহূর্তে মন ও কর্তব্য স্থির করে নিলেন। বলপ্রয়োগের কোন প্রশ্নই ওঠে না। তা ছাড়া কয়েকমাস পরেই নির্বাচন। এই সময় এই বিস্তৃত গ্রামীণ জনপদে কোন নতুন বিক্ষোভ বা বিতর্কের হেতু হওয়া, নিতান্তই অর্থহীন।
—আপনারা আরও ওপরে যান। নিজেরা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যান। তিনি আমায় ডাকলে আমায় যা বলার বলবো।
—আপনি কিছুই করবেন না ? মাধব কাতরোক্তি করল।
—দেখুন এখানে কোন দাঙ্গা হয়নি যে আমায় কিছু করতে হবে, বলতে বলতে দারোগা জীপে আসীন হলেন।
ফটো বলল, আপনি অন্ততঃ একবার বাবা বাগেশ্বরের মন্দিরে চলুন।
—তা না হয় যাচ্ছি। কিন্তু ওপর থেকে হুকুম না হলে কিসসু হবে না।
ঢাক বাজাতে আরম্ভ করল ফিকু মুচি। আরও অনেকে। পাশাপাশি পাঁচ সাতটা গ্রামের ঢাক এসেছে এখানে। ড্যা-ডা-ড্যাং-ড্যাংডা-ড্যাডাং—
আর বহু নারীকণ্ঠ বহু দিন পর সমবেত গাইছে—

এতদিনের পর
এল নিজের ঘর
বাবা বাগেশ্বর।
এসো বাবা বসো বাবা
তোমায় রোজ করবো গড়—
আমাদের বাবা বাগেশ্বর ।।

৩০

।। জলদেবতা, আমার কুঠার আমায় ফিরিয়ে দাও ।।

নেপপুকুরের অন্য পারে মাঝামাঝি জায়গায় ডাঙার ওপর বাঁশগাছের জটলা। সেই বাঁশঝোপের ছায়া যখন দীর্ঘ হয়ে নেমে আসছিল মাটিতে, তখন এপারের মেলার মানুষজন থেকে আড়াল ও আলাদা হয়ে সন্ন্যাসী পায়ে পায়ে পুকুরের ওই পারে পৌঁছে গেল।

তখন থেকে বাদল একা। অপরাহ্ণের আলো নিভে গিয়ে ক্রমশঃ চরাচর জুড়ে সন্ধ্যা নেমে এল। আঁধার হয়ে গেল চারদিক। চারপাশের সুবিস্তৃত নির্জনতাকে নির্জনতর করে জোনাকির ঝাঁক জেগে উঠল যথারীতি। বাঁশপাতার দীঘল গায়ে মাঝে মাঝে হাওয়া লেগে এক ধরণের চারু ও কর্কশ শব্দ উঠতে থাকল থেকে থেকে। সেই নিজনে একাকী বাদল বসে থাকল বহুক্ষণ।

ইতিমধ্যে নেপপুকুরের অন্য পারে পাকুড়গাছ তলায় বাবা বাগেশ্বরের থোড়াকে ঘিরে আগোছাল গ্রামীন মেলার নানা দোকানে জ্বলে উঠেছে কারবাইডের আলো। স্বল্প আয়োজন, হ্রস্বপরমায়ুর স্বতঃস্ফূর্ত সেই মেলার কয়েকটি আলো ইতিমধ্যে হয়তো নিভেও গেছে। তবু কার্বাইডের আলোয় পশরা নিয়ে এখনো মেলা বেশ ভরাট। অন্যপারে ঘাটের সীমানায় যে সব দোকান, সেখানের আলোর শিখাগুলি জলের মধ্যে কাঁপছে। মাঝে মাঝে অনির্দিষ্ট চাহনিতে ওপারের মেলা আর সব কিছুর দিকে চেয়ে থাকছে বাদল।

একরাশ তারা উঠেছে আকাশে। বহুদিন পর এক আকাশ তারা নিজের বুকে নিয়েছে নেপপুকুরের জল। জলের বুকে নক্ষত্র, কার্বাইডের আলো—কোথা থেকে এলো? বাদল দেখেছে। মানুষের হাত অনেক কিছু করতে পারে। পরতে পরতে পানা, কলমীর দলা আর নানা জলজ উদ্ভিদে ঢাকা ছিল নেপপুকুরের জল। কাল রাতেও ছিল। ছিল আজ সকালেও। মানুষের হাতে হাতে, অনেক মানুষের হাতে হাতে তার সবটা না হলেও, অনেকটাই

উচ্ছেদ হয়েছে সারা দিনে। মানুষ যেখানে ও যে কাজে নিজেকে স্বেচ্ছায় নিযুক্ত করে, সেখানে যাদুমন্ত্রে কাজ হয়ে যায়। এখন এখানে দেবতার থান। দেবতার পুকুর। সেই পুকুরের পানা আর গিজগিজ করা অজস্র উদ্ভিদ সাফাই'এ দলবদ্ধ অজস্র হাতে হাতে, যেন আলাদিনের দানো ঘাড়ে করে আবর্জনার স্তূপ পরিষ্কার করে দিয়েছে। চাঁদ লেগে টলটল করছে পুকুরের জল। স্বচ্ছ সরোবর। বড় শোভা। চেয়ে থাকলে শরীর শীতল হয়ে যায়। চমৎকার। হয়তো কিছুদিন পর, এই দেবপুকুরে স্নান ও জলের অন্যান্য ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। দেবতার—

এখানে এখন শুধু দেবতা। বাতাসে হোম আর ধূপ ধুনোর গন্ধ। শুধু প্রণামী। চারদিকে শুধু ঈশ্বরের বাজনা।

বাদল উঠে দাঁড়াল। সে তার গা থেকে খুলে ফেলল গেরুয়া আলখাল্লা। তারপর কোমরের কষি আলগা করতেই গেরুয়া লুঙি পায়ের কাছে খসে পড়ল। সেই গৈরিক বস্ত্র সে তার দুইহাতে দলা পাকিয়ে ধরল। এখন ইচ্ছে করলে এটাকে দূরে নিক্ষেপ করা যায়। বাদল তা ছুঁড়ে ফেলে দিল না। তার ঝোলার পাশে সেটিকে নামিয়ে রাখল।

এই গেরুয়া বসন, সন্ন্যাসের এই ভেক, তার অসহ্য লাগছে। গায়ে দিলে বাদল বড় বিষণ্ণ, অসহায় আর ক্লান্ত বোধ করছে। কতকগুলি মিথ্যা আছে, যা মানুষের মন প্রত্যাখান করে। এই বসন, এই সন্ন্যাসীর পোষাক, বাদলের জীবনে তেমনি এক মিথ্যা। গত দু'বছর ছিল না। এখন হয়েছে। আজ সকাল থেকেই এই পাকুড়-গাছ-তলায় বাদল আর সকলের সঙ্গে থাকতে চেয়েছিল তার নীল পাতলুন আর কামিজে। সে যা, ঠিক তাই হয়ে সে থাকতে চেয়েছিল। এমনকি তার মাথার চুল, আর সারা মুখের জঙ্গল, ক্ষৌরি করে আসতে চেয়েছিল সে। কিন্তু উপায় নেই। মন চাইলেই, তোমার মন যা চাইছে, তুমি সব সময় তা-ই করতে পার না। স্মৃতি বলেছিল, কখনো না। কিছুতে না।

—কেন? কি হবে?

—অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে।

—কি ক্ষতি হবে?

—এখনো অনেক কাজ বাকী।

—তোমার কাজ তো হয়েছে।

—হয়নি।

—হয়নি ?

—না। সবে শুরু হয়েছে—

বাদল পুকুরের ঢাল বেয়ে অনেকটা নীচে নেমে এল। তার সারা শরীরে বস্ত্র বলতে, একখণ্ড কালো কৌপিন। বাদল তার দুইহাত দিয়ে নিজের মাথার জটার মত চুল টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চাইল। মাথার আর সারা মুখের এই ভার সে আর বইতে পারে না। শুধু তো সন্ন্যাসীর পোষাক নয়, এই সব জঙ্গল নিয়েও তার নিজেকে হঠাৎ দুর্বল ও দিশেহারা লাগছে।

পায়ে খোলামকুচি বিঁধল বাদলের। একটা মাটির মালসার অনেকগুলো টুকরো পরে আছে। একটা টুকুরো নিয়ে, বাদল, বালক বয়েসের মত, জল কেটে সেই খোলামকুচি এক বিশেষ কায়দায় ছুঁড়ল। হল না। দ্রুত আর একটা তুলে নিয়ে আবার ছুঁড়ল বাদল। জল কেটে মাত্র একটা লাফ দিয়েই খোলামকুচি জল মগ্ন হল।

ব্যাঙ-চুড়-চুড়ি-খেলা। অদ্ভুত খেলা। খোলামকুচি জল কেটে অন্ততঃ তিনলাফ দেয়। কখনো চারবারও লাফায়। আসলে—

বালক বয়সের এই খেলা, হঠাৎ ফিরে পেয়ে বাদলের বড় আনন্দ হল। সে এই খেলা নিয়ে আসলে নিজেই নিজেকে নিয়ে মাতামাতি করতে লাগল। একসময়ে সে আনন্দে হাততালি দিতে লাগল। তার হয়েছে। আবার পেরেছে সে। সে পারল। আরও খোলামকুচি খোঁজার জন্য নীচু হল বাদল।

এই সময় নেপপুকুরের অন্যপারে কাঠ কাটার শব্দ হল। মেলায় কেউ কুড়ুল চালিয়ে কাঠ চেলাই করছে। হয়তো তার উনুনের জ্বাল, আরও কিছুক্ষণ জিইয়ে রাখা দরকার, কিমবা হয়তো রাতের রান্নার জন্য উনুন ধরাবে। জলে ভেসে আসছে কাঠ কাটার শব্দ।

যে বাদল কোনদিন পড়াশোনার ধার দিয়ে যায়নি, অজস্র শাসন যাকে বাধ্য করতে পারেনি এমনকি স্কুলের শেষ ধাপ পর্যন্ত যেতে, বই যার কোনদিন বন্ধু নয়, এই মুহূর্ত্তে ওই কাঠকাটার শব্দে তার ছেলেবেলায় পড়া এক গল্প মনে পড়ে গেল।

একবার এক সরোবরের তীরে গাছ কাটার সময়, এক কাঠুরিয়ার কুঠার জলে পড়ে গেল। সেই কুড়ুল ছাড়া তো সে বাঁচবে না। কুড়ুল দিয়ে গাছ কেটে,

সেই কাঠ বেচে, সে বাঁচে। তার পরিবার ও শিশুদের বাঁচায়। সে খাবে কি? বাঁচবে কি করে? অসহায়, গরিব কাঠুরিয়া শিশুর মত ক্রন্দন করতে লাগল। জল থেকে উঠে এলেন জল দেবতা। তাঁর হাতে এক সোনার কুঠার। কুড়ুলের এত রূপ জীবনে দেখে নি কাঠুরিয়া। সে বলল, না প্রভু, এ কুড়ুল আমার নয়।

জলদেবতা আবার জলে অন্তর্হিত হয়ে, চোখের নিমেষে জল থেকে উঠে এলেন আবার। এবার তাঁর হাতে রূপার কুঠার।

—না ভগবান, এ কুড়ুলও আমার নয়।

জলের অতলে আবার হারিয়ে গেলেন জল দেবতা। এবার এলেন হাতে লোহার কুঠার নিয়ে। দেবতার পায়ে হাত রেখে কাঠুরিয়া বলল, এটি আমার। আমায় দয়া করে আমার জিনিস দিন।

প্রসন্ন জল দেবতা বললেন, এই সোনার, রূপোর, আর এই তোমার নিজের, তিনিটিই তোমায় দিলাম। নাও।

ভগবান কি ভালো! ভালো বলেই দিলেন বুঝি? না, তা নয়। বাদলকে বুঝিয়ে বলা হয়েছিল, ওই গরিব মানুষটি লোভ করেনি, সে সত্য বলেছে। সে শুধু তার নিজেরটি চেয়েছে। যে সত্যকে আশ্রয় করে থাকে, তাকে দেবতাও আদর করেন।

এই গেরুয়া মিথ্যা। এই গৈরিক, সে আর একদণ্ডও ধারণ করতে চায় না। সে যা, সে তাই, সে বাদল হতে চায় আবার। কিন্তু তা যে হবার নয়। কেন নয়? অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে তাহলে।

—কিসের ক্ষতি?

সন্ন্যাস, সন্ন্যাসীর উপস্থিতি মানে বিশ্বাস। আস্থা। যদি সন্ন্যাসীর বেশ ত্যাগ করে বাদল, তাহলে এই বিশাল জনপদের সরল বিশ্বাস আর আস্থায় আঘাত লাগবে। চারদিকে শত্রু। এখানে সে হচ্ছে সন্ন্যাসী। এখানে অনেক কিছুর হোতা সে-ই। এখন সন্ন্যাস ফেলে বাদল নামে কোন মানুষের উপস্থিতির ঝুঁকি নেওয়া যায় না। এখনো তার সময় হয়নি।

—কবে হবে সময়?

—অপেক্ষা করো।

—কতদিন?

—যতদিন না এখানে দেবতা প্রতিষ্ঠিত হন। এখানে শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা

করতে হবে। পাকা মন্দির করতে হবে।
এখানে—
—কে করবে এসব ?
—আমরা করবো। তুমি করবে
—আমি কি করবো ?
—তুমি কতো কিছু করতে পারো
—কি সে সব ?
—তুমি তীর্থে তীর্থে যাও। অনেক সাধুকে নিয়ে এসো। খুঁজে আনো শিবলিঙ্গ। এখানে খুব বড় হোম আর যজ্ঞ করে দেবতার প্রতিষ্ঠা হোক। গোটা পৃথিবী জানুক। যেন কোনদিন কেউ এই দেবতার গায়ে হাত দেবার সাহস না পায় !
—আগে তো এসব কথা বলো নি।
—আগে আমি বুঝতে পারি নি। দাদা পুলিশ নিয়ে এসেছিল। আরও কত কিছু হতে পারে। আমি এর শেষ দেখব। আমি হারব না—
—বাঃ। তুমি বৌ দারুণ। আমি এ সব পারবো না—
—তুমি আমার নির্ভর !
—কিসের নির্ভর ?
—সব কিছুর
—হাসালে
—কেন ?
—আমি থাকবো শুধামডি। তুমি থাকবে এখানে। আর আমি তোমার সব কিছুর নির্ভর ?
—চিরকাল এখানে থাকবো না।
—চিরকালই থাকবে। কেন জান ?
—কেন !
—তোমার নেশা হয়েছে। লড়াই-এর নেশা। তার তো আর শেষ নেই—
—তুমিও থাকবে। আমরা থাকবো।
—একা আমি কিছুই নই। আসলে তোমার চাই অনেক লোক। অনেক অনেক লোক। তোমার পার্টিও চাই। না হলে তুমি কজনকে নিয়ে একা একা শেষ পর্যন্ত পারবে না। জিতবেও না।

—হ্যাঁ চাইই তো। দেখছো তো, কত লোক এসেছে। আরও আসবে!
—তাহলেই হলো। আমাকে কি দরকার? আমি চলে গেলেই দেখবে, আমাকে কোন দরকার নেই—
—চাকরি ছেড়ে দাও তুমি
—কি করবো?
—এখানে এসে থাকো।
—সন্ন্যাসী সেজে?
—সেটাই কাজ।
—এই ভেক ধরে চিরদিন কি থাকা যায়?
—সেটাই উপায়!
—আমি তোমার মত জগোধাত্রী নই বৌ—আমি যন্তরও নই, আমি—
বাদল কথা শেষ না করে স্মৃতির দিকে চেয়ে থাকল। তার চোয়াল শক্ত হচ্ছিল। ভিতরে ভিতরে রূঢ় ও কিছুটা নিষ্ঠুর হয়ে উঠছিল সে। ক্রমশঃ সে শিথিল আর নিরুত্তেজ হল। করুণ চোখে স্মৃতির দিকে চেয়ে সে বলল, আমি এখানে আর থাকবো না, বৌ।
—কেন?
—আমি তোমাকে চাইবো। রোজ চাইবো। আমার অনেক কামনা বাসনা। আর তুমি হলে এখানকার দেবী—।
পুকুরের জলে ঝাঁপ দিল বাদল। সরোবরের শীতল জলে তারা শরীর অনুত্তেজিত আনন্দে জল নিয়ে খেলা করতে লাগল। ডুব সাঁতারে জলের তলায় নেমে যাচ্ছে বাদল। স্মৃতি যেমন চাইছে, বৌ যেমন বলল, সে যদি নানা তীর্থে তীর্থে সাধুর খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় নিজে সত্যি সন্ন্যাসী হয়ে যায়! হতেই তো পারে! একটা জিনিস করতে করতে মন বসে যায় যে তার ওপর। বিড়ি ছেড়ে দেখেছে, মেলায় যাওয়া ছেড়ে দিয়ে দেখেছে, মনটা আস্তে আস্তে সরে আসে। তেমনি নীল পাতলুন আর কামিজ যদি একেবারে ছাড়ে, তাহলে তার থেকেও একদিন মন উঠে যাবে না?
জলের ওপর ভেসে উঠল বাদল। তার মজা লাগছে। চিৎ সাঁতারে সে শুধু নিজেকে ভাসিয়ে রাখল। তার গায়ে নক্ষত্রের আলো এসে পড়ছে। জলের ওপর ভাসতে ভাসতে আর এক কাঠুরিয়ার গল্প মনে পড়ল বাদলের।

একজন জলদেবতার কাছে সোনার আর রূপোর কুড়ুল পেয়েছে শুনে, আর একজন কাঠুরে সেই একই জায়গায় এসে কাঠ কাটতে কাটতে ইচ্ছে করে তার কুড়ুল জলে ফেলে দিল। এবং সে কাঁদতে লাগল।

যথারীতি জল দেবতা এলেন।

—কি হয়েছে তোমার? কাঁদছো কেন?

—প্রভু আমার কুঠার জলে পড়ে গেছে।

জলদেবতা জলে অদৃশ্য হয়ে আবার নিমেষে আবির্ভূত হয়ে সোনার কুঠার বাড়িয়ে বললেন, এটি কি তোমার?

—হ্যাঁ দেব, এটিই আমার, হাত বাড়াল কাঠুরিয়া। কোথায় কি? চারপাশে কেউ কোথাও নেই।

বাদল গল্পটার আর দিশে পেল না। হঠাৎ তার মামার মুখ মনে পড়ে গেল। এবং রাখোহরির মুখ মনে আসা মাত্রই বাদলের চারপাশে গভীর ঘন জল, জলের জটিলতা, তাকে দ্রুত ঘিরে ফেলতে লাগল। বাদল হাঁপিয়ে উঠল: সে পাড়ে আসার জন্য আপ্রাণ সাঁতার দিতে লাগল। হে ভগবান, আমাকে শুধু আমার নিজের কুঠার ফিরিয়ে দাও ভগবান।

জল থেকে উঠে পড়ল বাদল। পায়ে পায়ে সে এগিয়ে গেল তার ঝোলার দিকে। নিজের নীল পাতলুন পরল সে। গায়ে দিল নীল কামিজ। একমাথা আর একমুখ কেশভার থেকে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। একবার ভাবল গেরুয়া আলখাল্লা আর লুঙি জলে ভাসিয়ে দেয়। থাক। একবার ভাবল বাঁশগাছের জটলায় ফেলে রেখে যাবে। কুড়িয়ে পাবে কেউ। তাও থাক। কোন দরকার নেই এই গেরুয়া বসন এখানে ফেলে যাওয়ার। দূরে কোথাও কাউকে দিয়ে দেবে। মাটিতে উবু হয়ে বসে ঝোলায় গেরুয়া বসন ভরে ও আবার উঠে দাঁড়ানোর আগে বাদল উৎকর্ণ হল। সে শব্দ পেয়েছে। বাঁশ পাতার ওপর দিয়ে সরে যাওয়ার শব্দ হয়েছে। এ শব্দ তার চেনা। বুকে হাঁটলেও সে ঠিক শুনতে পায়। এই তো তাদের সায়ং ভ্রমণের সময়। বৈশাখের প্রথম দিন। হিমঘুম ভেঙেছে একমাসেরও আগে। এখন ওরা খুব চনমনে। শব্দ অনুসরণ করে দ্রুত এগোতে লাগল বাদল। ঝাপসা ইসারার মত যেন দেখতেও পেল তাকে। তারপর আর ঠাহর করতে পারল না। তিনি আড়ালে অন্তর্হিত হয়েছেন। সম্ভবতঃ চন্দ্রবোড়া। সারা বর্দ্ধমান জেলায় যার নাম ডাক। দুই

মুখো বিষধর। এই সাপ নিয়ে খেলার উত্তেজনা আর মজাই আলাদা।
ঝোলা তুলে কাঁধে ঝোলাল বাদল। একবার ভাবল এখান থেকেই সে পায়ে পায়ে রেল স্টেসনে চলে যায়। কারো সঙ্গে দেখা করার দরকার নেই। কিন্তু না, তা হয় না। 'বলে যাওয়া' দরকার।
সে বলে যাবে।
—তাহলে আসি বৌ।
—কাল যেও তুমি।
—আমার দেরী হয়ে যাবে।
—কিসের দেরী ?
—কাল ২রা বোশেখ, কাল থেকে পারবেলিয়ায় মেলা।
—মেলায় যাবে তুমি ?
—যাব।
—তুমি আবার সাপ নিয়ে খেলবে ? না। কখনো না।
বাদল ম্লান হাসল। বলল, আর একটা কথা তোমায় বলতে মন চায়।
—বলো।
—তুমি আমায় বহুবার বলেছো, তোমার পরাণদা, আর তোমার স্বামীর কাছ থেকে তুমি শুধু নিয়েছো। তাদের ব্যবহার করেছো। অথচ কোনদিন তাদের তুমি কিছু দাওনি। এটাই তোমার পাপ। বলেছো তো ?
—বলেছি।
—আমি তোমায় আর একটা পাপ করার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলাম।
—আর একটা পাপ কেন ?
—আমি যদি এখানে থাকি, তাহলে এখন থেকে আমাকেও তুমি……। চলি বৌ। ভালো থেকো।
—রাস্তায় নামলে মাঝপথ থেকে ফেরা যায় না। সবটুকু পথ যেতেই হয়। তুমি আমার স্বামী ! তুমি আমার কথা বোঝ—
আবার ম্লান হাসল বাদল। একটি কথাও বলল না আর। সে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকল স্মৃতির দিকে। ভিতর থেকে বার হয়ে আসা একটা ভারী শ্বাস গোপন করল বাদল। সে শেষবারের মত বলতে চাইল, চলি বৌ। কিন্তু তা-ও বলল না আর। সে শুধু চলে গেল।

৩১

।। জাগতে রহো ।।

মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙে গেল মাধবমাস্টারের মার। তার ঘুম ভেঙে গেল বললে ঠিক বলা হয় না। যেন কেউ তার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। অথচ কেউ তাকে ডাকে নি। এবং সে কোন স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন কিছুই দেখেনি। বাঁশের বাতায় ঝোলান হ্যারিকেন জ্বলছে। সেই আলোয় বাবা বাগেশ্বরের ঘোড়া, ঘোড়ার পাশে রাখা পরপর সাতখানা গ্রামের ঢাক, পিলসুজ, প্রদীপ, গত কালের পুজোর অজস্র ফুলবেলপাতার পড়ে থাকা কিছু অবশেষ—এই সব শুয়ে শুয়ে দেখল ব্রাহ্মণী। তারপর ভূমিশয্যায় বিছানো খড়ের ওপর কম্বল ও তার ওপর সতরঞ্চের বিছানায় উঠে বসল সে। হাত সাত দূরে স্মৃতি শুয়ে আছে আলাদা বিছানায় তার ছেলে বাকুকে নিয়ে। বহুদিন পর ছেলেটা তার মাকে আঁকড়ে শুয়ে আছে। না কি তার মা-ই আঁকড়ে আছে তাকে! ওদিকে, অনেক তফাতে পরাণ। ব্রাহ্মণীর পায়ের দিকে ১০।১৫ হাত দূরে হারা আর ফিরু। মেলায় যারা দোকান দিয়েছে, তারাও মেলাতলায় নিজের নিজের মত ঘুমোচ্ছে।

চারদিকে শুধু ঘুম।

আবার নিজের মত নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল মাধবমাস্টারের মা। কিন্তু সে ঘুমোতে পারল না। শুয়েও থাকতে পারল না। তার অস্বস্তি হচ্ছে। তার মন একটা কিছু গাইছে। অথচ কি যে তার মনে হচ্ছে তা সে নিজেও ঠিক বুঝতে পারছে না। ব্রাহ্মণী আবার তার বিছানায় উঠে বসল। তার পর সে উঠে দাঁড়াল। ভাবল, জল খাই দু'ঢোক।

বিছানা থেকে নীচে পা রাখতেই তার পায়ে কিছু কামড়াল। নিশ্চয়ই পিঁপড়ে। পায়ে হাত দেবার আগেই দুপায়ের পাতা আর গোড়ালির ওপর যেন ছেঁাকে ধরেছে! দুইপায়ের পিঁপড়ে মারতে মারতে মাটিতে উবু হয়ে বসল মাধব মাস্টারের মা। দেখল তার ও স্মৃতির বিছানার মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গা, সেইখান দিয়ে লাল পিঁপড়ের সার চলে গেছে সোজা পাকুড় তলার দিকে,

যেখানে দেবতার ঘোড়া রাখা হয়েছে। ওইখানেই বাবা বাগেশ্বরের ঘোড়ার প্রতিষ্ঠা হয়েছে কাল। মাঝরাত্তিরে ঘন পিঁপড়ের সার চলেছে গাছতলায়। মানুষের রেখে যাওয়া প্রসাদী মণ্ডা মেঠাই ওদের অন্ন।

আর মাঝরাত্তিরে কাণ্ড দেখো। কাউকে না জাগিয়ে, মাঝরাত্তিরে পিঁপড়েরা নিজের মনে ঘন সার বেঁধে মণ্ডা মেঠাই'র দিকে যেয়ে নিজেদের কাজ সারছে। আর এখন দিলে আমাকে কামড়ে—

ব্রাহ্মণী ভাবল, নেপপুকুরের জলে পা না ডোবালে এই পিঁপড়ের কামড়ের জ্বালা তার অঙ্গ থেকে যাবে না।

বাইরে এলো ব্রাহ্মণী। দূরে গ্রামের দিকে তাকাল। মন আর চোখ টানল, তাই। সব আবছা। ভাল করে দেখতে চাইল ব্রাহ্মণী। তার হঠাৎ মনে হল, গ্রামের দিক থেকে অনেকগুলো আলোর বিন্দু এগিয়ে আসছে। মনে হল তার চোখের ভ্রম, মনের ভুল। কাপড়ের খুঁটে দুই চোখ ভাল করে রগড়ে মুছল ব্রাহ্মণী। ওগুলো আলো নয়। ওগুলো মশালের আগুন। মশাল হাতে লোক আসছে এইদিকে। অনেক মশাল। এখান থেকে গোণা যায় না। কতজন ওরা? কেন আসছে?

কি করবে, কি করা উচিৎ, ব্রাহ্মণী প্রথমে বুঝতে পারল না। তার কিছুক্ষণ বাক্‌রোধ হয়ে গেল।

—তবে কি ফৌজদারি করতে আসছে মাধব? দারোগা যেন সেইরকম কিছু বলেছিল। এখানে কি তবে যুদ্ধ হবে? আগুন জ্বলবে এখানে?

ব্রাহ্মণী চিৎকার করে কাউকে ডাকার আগেই বাবা বাগেশ্বরের ঘোড়ার কাছে রাখা ঢাকের শব্দ হল। ব্রাহ্মণী দেখল, পরাণ ঢাক বাজাচ্ছে।

পরাণও জেগে ছিল? এখন সে সব কথা জিজ্ঞাসা করার সময় নয়।

—জোরে বাজা পরাণ। আরও জোরে বাজা।

আরও জোরে বাজাতে লাগল পরাণ। আপ্রাণ। মেলা ঘিরে থাকা, চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে থাকা মানুষেরা জাগতে লাগল।

এবার দ্বিতীয় ঢাকে কাঠি দিল হারা বাগ্দী। তারপর তৃতীয় ঢাকে বাদ্যি তুলল ফিরু মুচি।

মধ্যরাত্রে, নক্ষত্রখচিত নীল সাটিনের মত আকাশের তলায়, নিস্তরঙ্গ শব্দহীনতায়, তিনটি ঢাকের বিপুল শব্দতরঙ্গ, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে যেতে লাগল।